শিশু-কিশোর

সাহিত্য সমগ্র

(২য় খন্ড)

হেলেনা খান

শিশু-কিশোর সাহিত্য সমগ্র

(২য় খণ্ড)

হেলেনা খান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

শিশু-কিশোর সাহিত্য সমগ্র (২য় খণ্ড)

হেলেনা খান

প্রকাশক

এস এম রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস-নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম মোবাইল ঃ ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল অফিস-১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর ২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

গ্রন্থস্বত্ব

ডাঃ নিরমীন রিফাত খান

এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর, কমিউনিটি মেডিসিন

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ।

প্রচ্ছদ

ডিজাইন ওয়ান

মূল্য ঃ ৪৭০/-

প্রাপ্তিস্থান

১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা। ফোন ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ৭১৬৩৮৮৫

যোগাযোগ

১১২ মনিপুরী পাড়া (নিচতলা)

তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫

ফোন-৯১১৪২২৯

মোবাইল-০১৫৫২৪৭২২২৪

Shisu Kishor Sahitta Somagra (Children Stories), by Helena Khan

Published by: S.M. Raisuddin, Director-Publication

Bangladesh Co-operative Book Society Ltd.

125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price : Tk.470.00 US$: 12.00 ISBN. 984-70241-0049-0

www.pathagar.com

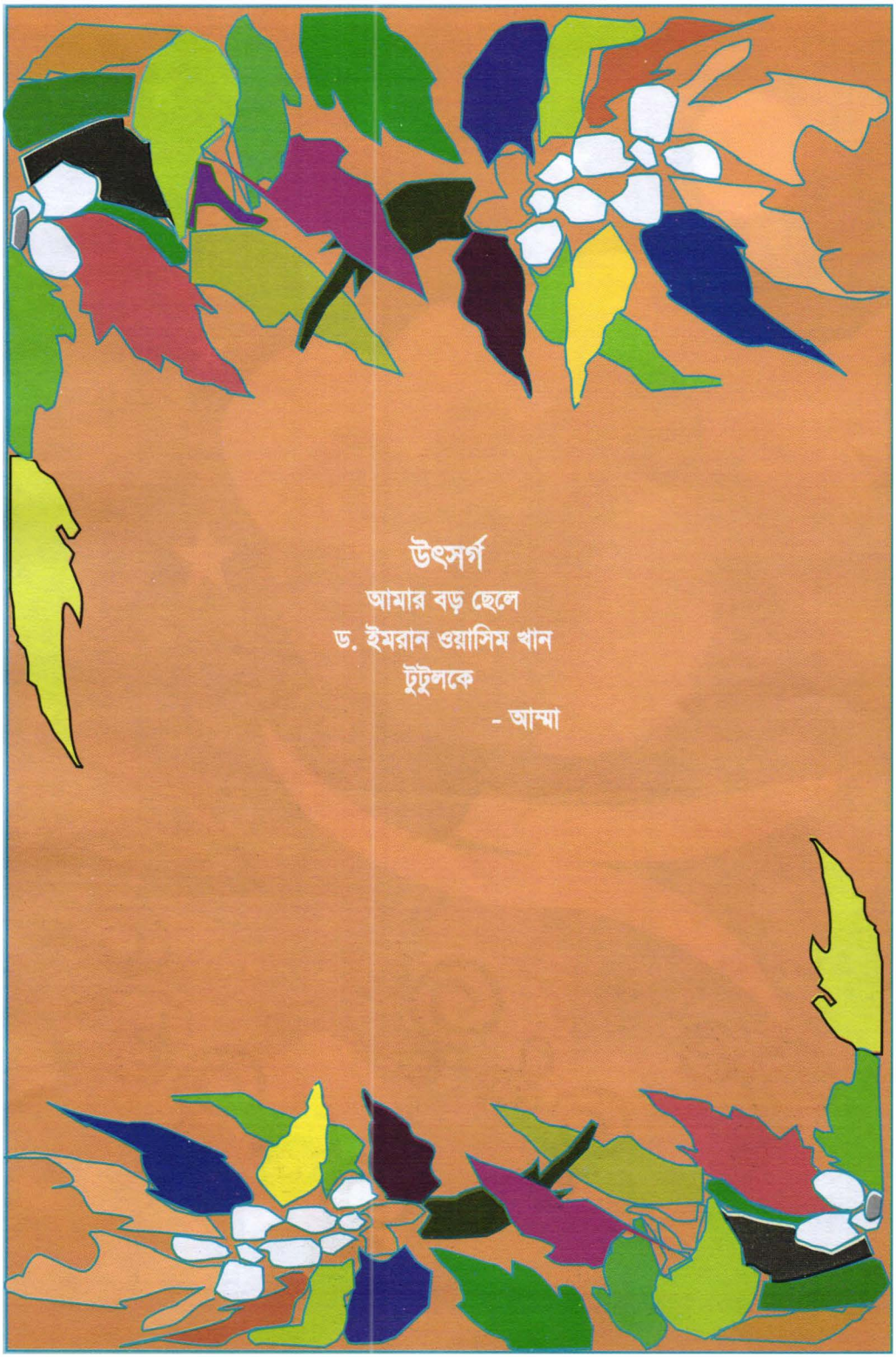

উৎসর্গ

আমার বড় ছেলে

ড. ইমরান ওয়াসিম খান

টুটুলকে

- আম্মা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও অনবদ্য শিশু-কিশোর সাহিত্য রচয়িতা বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, শিশু-কিশোর অনুবাদ সাহিত্যে বাংলা একাডেমী ও সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় একুশে পদক পুরস্কারে ভূষিত হেলেনা খানের সামগ্রিক শিশু-কিশোর সাহিত্যের অত্যুৎকৃষ্ট কতিপয় ছোটগল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, অনুবাদ, নাটিকা, ছড়া, কবিতা ও জীবনী গ্রন্থ নিয়ে বুক সোসাইটি হেলেনা খান-এর "শিশু-কিশোর সাহিত্য সমগ্র" (২য় খণ্ড) প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অবক্ষয়ময় এই সমাজ ব্যবস্থার কিছুটা হলেও শিশু-কিশোরদের পথ চলায় বইটি দিক নির্দেশনায় সহযোগিতা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শিশু-কিশোরদের অতি প্রিয় লেখিকা হেলেনা খানের এই গ্রন্থটি তাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি যথার্থই আনন্দিত!

(এস এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

হরেক রকম গল্প [ছোটগল্প]

০১

মুক্তিযুদ্ধের নিশান ---------- ১১
চাইনিজ খাওয়া ---------- ১৯
পয়সা অত সস্তা নয় ---------- ২৬
এমনটি সে চায় নি ---------- ৩১
রিনি ও রানির কাহিনী ---------- ৩৫
ব্রোকেডের জামা ---------- ৪২
ডেভিডের বাবা ---------- ৪৬
অহঙ্কারের পতন ---------- ৫০
পরীক্ষার হলে (রম্যগল্প) ---------- ৫৪
লাল টিয়ে ---------- ৫৯

ভূতের খপ্পরে [উপন্যাস]

০২

দুই-বিলের ধারে ভূতেরা ---------- ৭০
সাত-কালো বেড়ালের ছদ্মবেশে ভূত ---------- ৭৮
নয়-আজর‍্যা পুকুর ঘাটে ভূতের কবলে পপলু ---------- ৮৩
দশ-রাজকুমারীর কাটা মুন্ডু ---------- ৮৬
এগার-ওঝার খপ্পরে টুকু ---------- ৮৯
সে এক খুশির খবর ---------- ৯১
ষোল-ডাক্তার চাচা পপলুকে পরীক্ষা করছেন ---------- ৯৯

ঝিলিমিলি [ছড়া ও কবিতা]

০৩

হিংসুটে খোকা ---------- ১০৩
হাভাতের দেশে ---------- ১০৪
ধিকধিক ---------- ১০৫
বায়না ---------- ১০৬
ডাইনিবুড়ির মন্তর ---------- ১০৭
শাস্তি ---------- ১০৮
প্রতিশোধ ---------- ১০৯
বাংলা ভুলে গেছে ---------- ১১০
সাদা পেঁচা ---------- ১১১
মট্‌মট্‌ পাখি ---------- ১১১
চালাকির সাজা ---------- ১১২
চতুর শেয়ালের জবাব ---------- ১১৪
ডলার বনাম টাকা ---------- ১১৫

www.pathagar.com

০৪ গৌতমবুদ্ধের দেশে (ভ্রমণকাহিনী)

কাঠমন্ডু বিমান বন্দরে ---------- ১১৯
হিন্দুরাষ্ট্রের অধিবাসী আবহাওয়া, প্রাণী, প্রকৃতি ইত্যাদি ---------- ১২০
ইতিহাস কথা কয় ---------- ১২২
এগিয়ে চলার পথে ---------- ১২৩
হনুমান ধোকায় ---------- ১২৩
কুমারী জীবন্ত দেবী দর্শনে ---------- ১২৬
রাজধানীর এদিকে সেদিকে ---------- ১২৬
রোটারী সম্মেলনে ---------- ১২৭
বৌদ্ধনাথ স্তুপে ---------- ১২৮
পশুপতিনাথ মন্দিরে ---------- ১২৯
স্বয়ম্ভুনাথ স্তুপে ---------- ১৩০
কাঠমন্ডুর দোকানে ---------- ১৩১
নেপালে মুসলমান ---------- ১৩১
শিক্ষা প্রসঙ্গে ---------- ১৩৩
বালাজু ওয়াটার গার্ডেন ও বুদ্ধনীলকান্ততে ---------- ১৩৪
কথায় কথায় অনেক মিল ---------- ১৩৪
ভক্তদের নগর ভক্তপুর ---------- ১৩৫
সৌন্দর্যের শহর ললিতপুর ---------- ১৩৯
দেশে ফেরার আগে ---------- ১৪০
জনক রাজাদেশ জনকপুর ---------- ১৪১
পর্যটকদের বেহেশত পোখারায় ---------- ১৪২
গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনিতে ---------- ১৪৫

০৫ তুষার কুমারী ও সাত বামন (অনুবাদ) ১৪৯

০৬ বুদ্ধির বাহাদুরী (নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য ---------- ১৭১
দ্বিতীয় দৃশ্য ---------- ১৭৬
তৃতীয় দৃশ্য ---------- ১৮০

www.pathagar.com

নবী মূসা (আ) (জীবনী)

০৭

নবী মূসা (আ)-এর বংশ পরিচয় ---------- ১৯১
ফিরাউন দ্বিতীয় রামসিসের পরিচিতি---------- ১৯১
মূসা (আ)-এর জন্ম ও প্রতিপালন ---------- ১৯২
তরুণকাল মূসা (আ) ---------- ১৯৫
মাদইয়ানে মূসা (আ) ---------- ১৯৭
স্ত্রীসহ মূসা (আ)-এর মাদইয়ান থেকে মিসর অভিমুখে যাত্রা ---------- ১৯৯
আল্লাহ্‌র নিদর্শন নিয়ে ফিরাউনের নিকট নবী মূসা ও হারুন (আ) এর আগমন ২০০
ফিরাউনের ঔদ্ধত্য ---------- ২০৩
পুণ্যবতী আছিয়া (রা) ---------- ২০৪
অহংকারী কারুণের পরিণতি ---------- ২০৫
ফিরাউনের ঔদ্ধত্যের কারণে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আরও সাতটি নিদর্শন প্রেরণ -------- ২০৭
ফিরাউনের পতন ও মৃত্যু ---------- ২০৮
মুক্ত বনী ইসরাইলদের যাত্রা শুরু ---------- ২১১
মূসা (আ) এর তাওরাত প্রাপ্তি ---------- ২১৩
সামেরীর ঘটনা ---------- ২১৪
বনী ইসরাইলদের সত্তরজন প্রতিনিধির আল্লাহ্ তাআলার দর্শন অভিলাষের পরিণতি --- ২১৬
খিযির (আ) এর কাছে মূসা (আ) এর আগমন ---------- ২১৭
মূসা (আ) ও তাঁর লোকদের আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিশ্রুত স্থানের দিকে গমন ----- ২২০
মূসা (আ)-এর মৃত্যু ---------- ২২২
বনী ইসরাইলদের পরবর্তী প্রজন্ম ---------- ২২৩

www.pathagar.com

হরেক রকম গল্প (ছোটগল্প)

হেলেনা খান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের নিশান

আজ ১১ই ডিসেম্বর। একাত্তরের এই দিনে ময়মনসিংহ শহর শত্রুমুক্ত হয়েছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা পালিয়ে গিয়েছিল। রাফি সার্কিট হাউস ময়দানে এল। খোলামেলা বড় ছড়ানো মাঠ। জনসভা, প্যারেড, খেলা ও নাটকের উপযুক্ত স্থান। সেই একাত্তরে যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। উনিশ'শ একাত্তরে রাফির বয়স ছিল দশ বছর, আর এখন উনিশ শ বিরানব্বই। কতগুলো বছর চলে গেছে।

রাফিকে যে আজ এত বছর পর, নিজের শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে, তাই কি সে কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল?

একাত্তরের ১১ই ডিসেম্বরের কথা মনে পড়ে। ওহ! সে কী আনন্দ! সে কী স্ফূর্তি! সে কী গৌরবের দিন! পাঁচদিন পর ১৬ই ডিসেম্বরে দেশ পুরোপুরি স্বাধীন হয়েছিল। ময়মনসিংহ হয়েছি.ল পাঁচ দিন আগেই। সেদিন সবাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। 'জয়বাংলা' শব্দে ময়মনসিংহ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। সেদিনের স্মৃতিটা এখনো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে।

www.pathagar.com

বিকালে আগে থেকেই শহরবাসী ও গ্রামের লোকেরা সার্কিট হাউসের মাঠে এসে জমা হয়ে থাকে। রফিক ভুঁইয়া, প্রিন্সিপাল মতিউর রহমান, ডি-সি, এস-পি, পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভি, সি ও ডাঃ এ, আর, খান সহ শহরের বহু গণ্যমান্য লোক এসে গেছেন। মাঠের মধ্যে একটি সাজানো মঞ্চ। সেই ভোরের আলো ফুটবার আগে থেকেই নদীর ওপার হতে মুক্তিযোদ্ধারা শহরে আসতে শুরু করেছে। মঞ্চের খুব কাছে ওদের বসানো হয়েছে।

এখনো কাঁধ ছড়ানো লম্বা চুল ওদের, গোঁফ-দাড়িতে বোঝাই মুখ। প্রত্যেকের গলায় ঝুলছে ফুলের মালা। একপাশে একটা ঘেরা দেয়া জায়গায় গদি আঁটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে দশ বছরের রাফি। দুহাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। এখনো শরীর সম্পূর্ণ সেরে ওঠে নি। তার পাশে রয়েছে আরো কয়েকজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা।

সার্কিট হাউসের মাঠটা সেদিন মানুষে গিজগিজ করছিল। দীর্ঘ ন টি মাস ধরে যে মানুষেরা নিজেদের ঘরে নিজেরাই বন্দি ছিল, তারা আজ বের হয়েছে। ওহ, মুক্তির কী আনন্দ! কী সুখ! ছেলে মেয়ে, জোয়ান বুড়ো সবাই এসে জড়ো হয়েছে মাঠে। কেউ বাদ নেই। সবাই গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধু ও সাহায্যকারী দেশ ভারত থেকে মেজর জেনারেল অরোরা এসে যাবেন। ময়মনসিংহবাসীদের অভিনন্দন জানাবেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হাতে হাত মেলাবেন তিনি।

বেশ আওয়াজ তুলে একটি হেলিকপ্টার এসে নামল মাঠে। নেতারা ও গণ্যমান্য লোকেরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মালা পরালেন অরোরার গলায়।

মালায় মালায় তাঁর বুক ভরে যায়। বক্তৃতা দেবার আগে আরোরা রাফি ও অন্যান্য পঙ্গুদের কাছে এলেন, পিঠে মাথায় হাত বুলালেন, নিজের গলা থেকে মালা খুলে তাদের সবার গলায় তা পরিয়ে দিলেন। রাফি সবচেয়ে ছোট বলে তাকে দিলেন দুটো মালা। একটি বকুল ফুলের, অন্যটি বেলী ফুলের। নেতাদের নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন অবশ্যই তাদের সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব নেন।

নেতারা সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাফি সেরে উঠেছিল। তার ডান হাতটা কনুই থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। আর বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল। লেখাপড়া বা কোনো রকম কাজ করার উপায় রইল না রাফির।

একজন উদার ও খুব ভাল লোক আশরাফ আলী তাকে সমাদরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী আয়েশা পাকিস্তান থেকে বহু কষ্টে পালিয়ে এসেছেন। সেখানে তাঁদের যাবতীয় সম্পদ ফেলে আসতে হয়েছে। কালীবাড়ি রোডে তাঁদের একটি ছোট একতলা বাড়ি ছিল, সেখানে এসে উঠেছেন। তাদের একটি মাত্র ছেলে আসমত তখন আমেরিকায়। তাদের আর্থিক অবস্থা এখন একটুও ভাল না। তবু রাফিকে তারা তাঁদের একজন করে নিলেন। তাঁদের তো অর্থ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি হয় নি। কিন্তু দেশকে মুক্ত করতে গিয়ে রাফির যে দুটো হাতই গেছে! প্রায় সময়ই রাফি দুঃখ করে কেঁদে ফেলে। তার চাইতে আমি মইর‍্যা গেলেই ভালা হইত।

আয়েশা রাফির চোখের পানি মুছে দিয়ে বলেন, কাঁদিস না রে রাফি! তোর এ দুনিয়াতে বেঁচে থাকার অবশ্যই দরকার আছে।

তোকে দেখে দেশের ছেলেমেয়েরা ভাল কাজ করার উৎসাহ পাবে।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে জিইয়ে রাখার জন্য পরপর কয়েক বছর ১৬ই ডিসেম্বরে, বিজয় দিবসে রাফিকে সার্কিট হাউস ময়দানে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়া হতো। এই হলো আমাদের বিজয়ের একটি উৎস, আমাদের গর্ব শাহ্ রাফি আহমদ!

বুকের ভেতর থেকে একটি যন্ত্রণাময় কান্না বেরিয়ে আসে। ..... কোথায় গেল সেসব দিন? কোথায় গেল তার সম্মান? কোথায় গেল তার নতুন আব্বা ও আম্মা? মাত্র সাত মাস আগে পরপর তাঁরা দু জনেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মরে গেলেন! দ্বিতীয়বারের জন্য সে এতিম হলো।

ময়মনসিংহ ছাড়বার আগে রাফি ব্রহ্মপুত্র নদীর দিকে তাকালো।

দূর থেকে জুট মিলটা নজরে পড়ে। এতিমখানার কাছে শম্ভুগঞ্জের চওড়া সুন্দর সেতুটা চীনারা তখনও তৈরি করে নি। ফেরি নৌকায় এপার ওপার করতে হতো।

স্মৃতির পথ ধরে পায়ে পায়ে রাফি মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিন গুলোতে চলে যায়। ১৯৭১ এর ১লা ডিসেম্বর । রাফি ওপারে গ্রামে গিয়েছিল। উচাখিলার কাছে। সেদিন সকালে একটি ডিঙি নৌকা ওপার থেকে অল্প লোক নিয়ে এপারে ভিড়ল। ফেরিঘাটে পাঞ্জাবী সৈন্যরা সবার ব্যাগ, বোঁচকা পরীক্ষা করে মুখে মুখে ছাড়পত্র দেয়, যাও গাদ্দার! উধার নিকাল যাও! দশ বছরের রাফি খুদে মুক্তিযোদ্ধা। সে দিন জসিম বলে এক ডিমওয়ালার সঙ্গী হয়েছিল।

দু জন সৈন্য জসিমের ডিমগুলো নিয়ে নেয়। নিয়ে হাসতে হাসতে বলে, তোমহারা মুরগীকো কিসমৎ বহুত আচ্ছা হ্যায়, জ্যায়সা হামলোক উয়ো মুরগীকো আন্ডা লিয়া।

সৈন্যরা যে বিনা পয়সায় লোকদের অনেক কিছু নিয়ে নেয় তা জানত জসিম। তার আজকের উদ্দেশ্য ছিল ডিমের বদলায় রাফিকে নিরাপদে শহরে পৌঁছে দেয়া। রাফি ওপারের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে একটা জরুরি খবর নিয়ে এসেছে।

শহরের কয়েকজন রাজাকার, আলবদর, আল শাম্‌স ও শান্তি কমিটির সদস্য ছাড়া আর সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে। রাফির বাবা শাহ্ রকিব আহমদ ছিলেন মুক্তিবাহিনীর একজন। তিনি ছিলেন কালীবাড়ি রোডের ছোট মসজিদটার মোয়াজ্জেম ও ইমাম। এই 'সূফি আদমী' যে 'ইবলীস্‌কা আঁখি' হতে পারে তা পাকসৈন্যরা একটুও ধারণা করে নি। একদিন সেই মসজিদেরই ছাত্র যামি কী করে তা টের পেয়ে গেল। যামি ছিল রাজাকার। সৈন্যদের পেয়ারা লাড়কা। ওদের খুশি করার জন্য যামি তার ওস্তাদজীর নামটা বলে দিল। সৈন্যরা ছুটে মসজিদে এসে তাঁকে পাকড়াও করে। খুব রেগে গিয়ে একজন মোটা স্বরে প্রশ্ন করে, তুম সাচ্ বাতাও, তোম্ মুক্তিকে লিয়ে লাড়তে হো, ইয়া হামারে লিয়ে লাড়তে হো?

জানের ভয় সবারই আছে। তাই সরাসরি জবাব না দিয়ে রাফির আব্বা বললেন, আমি খাঁটি মানুষের পক্ষে লড়াই করতাছি।

একজন সৈন্য যামিকে জিজ্ঞেস করে, উয়ো বাংলা জবানমে ক্যা বোল রাহা হ্যায়?

যামি তার নিজস্ব উর্দূতে বলল, ও বাংলা জবানমে বল্‌তা হায় যে সে সাচ্চা মানুষকা পক্ষে।

ক্যা কাঁহা? পাকহে! ও ক্যা হ্যায়?

পক্ষে, পক্ষে মানে লগে! যামি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে।

সৈন্যরা তা বোঝে না। ক্যা লাগ্ গিয়া? লড়াই? লড়াই লাগ্ গিয়া? কিধার? কাঁহা?

www.pathagar.com

যামি দুহাত নেড়ে বলে, না, না ছার, লড়াই-ফড়াই কিছুই না। হেইতা কিছুই এই হানে লাগতা নাহি।

বিরক্ত হয়ে ওদের একজন বন্দুকের বাঁট দিয়ে যামির ঘাড়ে একটা খোঁচা দেয়। ওহ! বাঙ্গালীকো জবান কিতনা খারাব হ্যায়!

যামি নিজের ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে দাঁত বের করে হাসতে চেষ্টা করে, জ্বে জ্বে হুজুর! বাংলা জবান খারাপ হায়। উর্দূ জবান খুবই আচ্ছা হায়। হাম জলদি উর্দূ জবান শিখ্যা লইঙ্গা হায়।

হা, হা বহুত আচ্ছা! জারাসা এ্যায়সা হোনা চাইয়ে!

হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে একজন সৈন্য মোয়াজ্জেম শাহ রকিবের বুক লক্ষ্য করে বন্দুকের ট্রিগার টিপে। সাথে সাথেই তাঁর রক্তাক্ত দেহটা মসজিদের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

যামির বুকের ভেতরটা ছলকে ওঠে। কিন্তু তবু পোষা কুকুরের মতো ওদের পেছন পেছন সে চলে যায়। ওরা চলে গেলে বাবার প্রাণহীন বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল রাফি। জোরে কাঁদবার উপায় নেই।

রাফির মা চার বছর আগেই এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তার সবচেয়ে বড় ভাইটি ভারতের মেঘালয়ে পৌঁছে, যুদ্ধে ট্রেনিং নেবার সময় অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। মেজো ভাই মরেছে সরাসরি উঁচাখিলার যুদ্ধে।

আমিও মরলে তুমরার মত মরবাম! বিড়বিড় করে প্রতিজ্ঞা করেছিল রাফি।

সেদিনই সে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে একটা কাজ করবার নির্দেশ পেল। নির্দেশ মতো অনেকগুলো কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে ছোট করে লিখল, শেয়ালরা ১০ তারিখ রাত্রে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে। সে রাতের জন্য সবাই খুব সাবধানে থাকবে!

একটা, দুটো, তিনটা করে প্রায় পঞ্চাশটা কাগজে তা লিখল রাফি। দুপুর গড়িয়ে যায়। বিকেলের দিকে সেগুলো একটা আলু ও টমেটো বোঝাই ঝুড়ির দিকে রেখে বিলি করবার জন্য বের হবে, অমনি হঠাৎ কোত্থেকে সামনে এসে দাঁড়ালো হান্নান। আল্‌বদর হান্নান। কিরে রাইফ্যা, আলু টমেটো নিয়ে এই অবেলায় কোথায় যাচ্ছিস? রাফি কথার মোড় ঘুরাতে চেষ্টা করে। আমার নাম তো রাফি। মানেটাও খুব ভাল। রাফি মানে সম্মানিত। ধমকে ওঠে হান্নান, নে মেলা বাজে বকিসনে! আসল কথার জবাব দে! তালুকদার বাড়িতে আমি একদিন পরে পরে তরিতরকারি বাজার কইর‍্যা দিয়া আই। আইজও-

রাখ তোর ভণ্ডামো! দেখি তোর ঝুড়িতে কী আছে! বলেই হান্নান তার ঝুড়িটা কেড়ে নেয়। আলু ও টমাটোগুলো উপুড় করে মাটিতে ঢেলে ফেলে। বের হয়ে পড়ে তার হাতে লেখা সেই কাগজগুলো।

দাঁড়ারে রাইফ্যা! তোকে মজা দেখাচ্ছি! বলে হান্নান রাফিকে টেনে নিয়ে একটা রিকশায় উঠালো। ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে এল। একজন পাকিস্তানি অফিসারের হাতে তাকে তুলে দিয়ে বলে, স্যার, ইয়ে লাড়কা পাকিস্তানকা দুশমন হ্যায়। দেখিয়ে না! ইয়া কাগজমে ক্যা লিখ্‌খা!

সে কথাগুলো উর্দূ তরজমা করে বলে, ইসমে লিখ্‌খা হ্যায়,

টেন্‌থ্ ডিসেম্বর সাব শেয়াল রাতমে ডার্‌কে মারে ভাগ্ রাহে! তুমলোগ্ সাব হুঁশিয়ার হো!

আর যায় কোথা! অফিসারটি ভীষণ ক্ষেপে যায়! সাথে সাথেই একজন সৈন্যকে আদেশ করে, মার গোলী! বাংগাললোগ বহুত বেঈমান হ্যায়!

হান্নান সায় দেয়, জ্বি স্যার, আপ্ সাচ্ বোল্‌রাহী হো!

www.pathagar.com

অফিসারটি হান্নানের পিঠ চাপড়ে দেয়।

তব্ তোম বেঈমান নেই। তুম বহুত আচ্ছা হ্যায়!

ওদিকে সৈন্যটি রাফির হাত দুটি লক্ষ্য করে দুদুবার গুলি ছোড়ে।

জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রাফি। রক্তে ভেসে গেল মাটি।

সারা জীবনের জন্য লেখার হাত দু টি তার অকেজো হয়ে গেল। যখন জ্ঞান হলো, দেখল সে হাসপাতালের বেডে। তখনো নিজের অবস্থা বুঝবার মত হুঁশ হয় নি। একজন টুপি পরা, চাপদাড়িওয়ালা নার্স তার সেবা করছে। শরীরে অসহ্য ব্যথা ও যন্ত্রণা দু দিন পর বুঝল রাফি। তাকে কী ভীষণ শাস্তি দিয়েছে ওরা ! অপারেশন করে ডান হাতটা তার কনুই থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। বাঁ হাতের গেছে সব ক টি আঙুল।

নার্স রিয়াজ ভাই তার বেঁচে যাবার কাহিনী শোনালো। সেদিন সে গলগণ্ড থেকে ডিউটি দিতে হাসপাতালে যাচ্ছিল। ক্যান্টনমেন্টের গেটে দেখে রক্তাক্ত একটা লাশ। সিপাহীরা গাড়ি আনতে গেছে। আরো ক টা লাশের সাথে এটাও নদী তীরে বালুচরে ফেলে দিয়ে আসবে। এই অল্প একটা সুযোগেই রিয়াজ রাফির নাড়ি পরীক্ষা করে বোঝে ছেলেটা বেঁচে আছে। তাকে রিকশায় তুলে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসে।

রাফি কেঁদে ফেলে, এহন আমার বাঁইচ্যা থাইক্যা কী লাভ? রিয়াজ সান্ত্বনা দেয়, লাভ লোকশানের কথা পরে হবে ভাই! এখন আল্লাহর কাছে শোকর কর তিনি তোমাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছেন!

তোমার হাতের অপারেশনও ভালভাবে হয়েছে।

রিয়াজের যত্নে রাফি বেশ তাড়াতাড়িই সেরে উঠেছিল।

১০ ডিসেম্বরের রাত। প্রায় আড়াইটা হবে। প্রচণ্ড এক আওয়াজে হাসপাতাল কেঁপে ওঠে । রাফি ও অন্যান্য পঙ্গু ক জন রোগীর ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয় ভীষণ গোলাগুলি হচ্ছে, দু পক্ষে লড়াই চলছে। অনেকক্ষণ ধরে চলল লড়াই। রাফি ও অন্য রোগীরা বসে বা কুঁকড়ে শুয়ে কেবল আল্লাহর নাম করতে থাকে।

একসময় শব্দ থেমে যায়। নীরব হয়ে যায় শহর ও শহরতলি।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটি শব্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, জয়বাংলা! জয়বাংলা!

রিয়াজ ভাই ও অন্যান্যরা খুশিতে কী যে করবে ঠিক করতে পারছে না। গতরাত্রে শহরে কারফিউ দিয়ে পাক-সৈন্যরা ময়মনসিংহ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ওরা যে পালাবে জানতো রাফি, কিন্তু যাবার আগে যে ডিনামাইট দিয়ে শম্ভুগঞ্জ রেল ব্রীজটা ভেঙে যাবে, তা জানত না। ব্রীজ ভাঙার কারণেই অত শব্দ হচ্ছিল।

এই মুহূর্তে রাফির মনে হচ্ছে তার শরীরে যেন কোনো রকম ব্যথা নেই, যন্ত্রণা নেই! মনে নেই কোনো দুঃখ! শত্রুরা পালিয়েছিল। গ্রাম থেকে ময়মনসিংহের মুক্তিযোদ্ধারা গর্বের সাথে শহরে এসেছিল! অরোরা ওদের সাথে তার গলাতেও মালা পরিয়ে দিয়েছিল।

সেই মালা সে খুব যত্নের সাথে ব্যাগে তুলে রেখেছিল। দুটো মালাই শুকিয়ে গেছে। গন্ধও নেই, সৌন্দর্যও নেই। তবুও দু টি মালা রাফির কাছে মুক্তোর মালার চেয়েও দামি। ও দু টি যে তার পুরস্কার, মুক্তিযুদ্ধের উপহার!

www.pathagar.com

আশরাফ আলী ও আয়েশা মারা গেলে তাদের একমাত্র ছেলে আসমত যে আমেরিকা থেকে ফিরে ঢাকায় চাকরি করছিল, ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে চলে আসে। কোনো একটা অন্যায়ের কারণে তার চাকরি চলে গেছে। সে এবং তার স্ত্রী শাহিদা এসেই রাফিকে সরিয়ে দেবার ফিকির খুঁজছিল।

রাফি তার আসমত ভাইজানের অবস্থা বুঝতে পেরে নিজেই অন্য কোথাও যেতে পারে কিনা খোঁজ করছিল। কিন্তু তাকে যে এমনভাবে অপমানিত হয়ে ঘর ছাড়তে হবে, তা কোনোদিনও ভাবে নি।

গতরাত্রে আসমতের মানিব্যাগ থেকে একটা বিশ টাকার নোট পাওয়া যাচ্ছিল না। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ! না, কোথাও নেই। শাহিদা স্বামীকে বলল, রাফির ব্যাগটা একবার দেখা দরকার। যেভাবে সে ওটা আগলে রাখে, নিশ্চয়ই টাকা কড়ি চুরি করে সে সেখানে জমিয়েছে। নিজে তালা চাবি লাগাতে পারে না, কিন্তু বুড়ো আলীকে দিয়ে তা সব সময় লাগিয়ে রাখবে! দেখো, সবুজ নোটটা ওখানেই পাওয়া যাবে।

রাফিকে প্রায় মাইল খানেক দূরের এক বাসায় একটা চিঠি দিয়ে পাঠানো হলো। পাঠিয়ে তারা তার ব্যাগের তালাটা খুলল। খুলে দেখে ব্যাগে ওর একটা পাজামা, দুটো পাঞ্জাবি, তার দশ বছর বয়সের একটা শার্ট, তৃতীয় শ্রেণীর বই ও খাতা রয়েছে। এ ছাড়া সার্কিট হাউস ময়দানে তার মালাপরা একটা বাঁধানো ফটো ও শুকনো দড়ির মতো দু টি বাসি ফুলের মালা। টাকা পয়সার নাম গন্ধও নেই।

ব্যাটা বজ্জাত! টাকা পয়সা সব সরিয়ে রেখেছে! নইলে এতদিন ধরে আছে, বেতন না পাক ফাঁকতালে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিল! সে কারণে বকশিশ বা দানটান কিছুই কি সে পায় নি?

আসলে টাকা পয়সা বকশিশ যা পেত সে তা বুড়ো পুরনো কাজের লোক আলীর কাছে রেখে দিত।

বাসায় ফিরে নিজের ছোট ঘরটাতে ঢুকেই বুঝতে পারে, তারা ব্যাগটা খুলে তছনছ করা হয়েছে।

আলী তখন রান্নাঘরে কাজ করছিল। রাফি ছুটে সেখানে আসে।

আলী চাচা, আমার ব্যাগের তালা কেডা খুলছে? আমার মালা দুইটা কেডা দলা-মচা কইরা ফালাইয়া দিছে?

আলী সব খুলে বলল। তারপর দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, থাউক গা! মনিবরার উপর কোনো কতা কইয়া লাভ নাই। আর অহন যেমুন মনিব হৈছে আমরার! থাউক ছোড মুহে বড় কথা মানায় না।

আলী চাচার কথায় রাফি একদম চুপ হয়ে যায়। কিন্তু এখানেই শেষ না। ওরা এখন থেকে কথায় কথায় ওকে হাতকাটা চোরা বলে ব্যঙ্গ করে। ওদের নিষ্ঠুরতা তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু মিথ্যা অপবাদ সহ্য করা রাফির জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

আজ আবার আসমত আলীর মানি ব্যাগ থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট খোয়া যায়। রাফি তখন জোহরের নামাজ পড়ছে। ওরা রাফি! রাফি! বলে চেঁচিয়ে ডাকছে। তাড়াতাড়ি নামাজ সেরে রাফি কাছে এসে দাঁড়াতেই আসমত আলী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে, শুধু কাজে ফাঁকি দেবার ফন্দি! হাত নেই একটাও, তাও নামাজের ঢং!

কথাগুলো রাফির বুকে বাজে। ভেজা গলায় বলে, ইমাম সায়েব কইছে ইশারাতেও নামাজ করন যায়।

চুপ বেয়াদব! কথার ওপর কথা!

আসমত ঠাস করে জোয়ান রাফির গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

বল্ হাতকাটা চোর! আজকে আবার আমার পঞ্চাশ টাকার নোটটা কোথায় সরিয়েছিস?

অপমানে, দুঃখে রাফির চোখে পানি এসে যায়। তা মুছে স্পষ্ট কণ্ঠে তেজের সাথে বলে, অকারণে আমারে মারা আপনের ঠিক হয় নাই! আমি আপনের টাকা সরাই নাই! আমি চোর না, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিসেনা!

এঃ! মুক্তিযোদ্ধা! মুক্তিসেনা! সে তো একুশ বছর আগের কথা!

একুশ বছর ক্যান্, একুশ হাজার বছরও যদি বাংলাদেশ থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা লোকে মনে রাখবই!

কথাগুলো বলে আর ওঘরে দাঁড়য় নি রাফি! নিজের ঘরে এসে চামড়ার ব্যাগটা বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে এক রকম ছুটেই বেরিয়ে পড়ল। জট পাকানো মালা দুটো তুলে নিল ব্যাগে।

আলী রাফির জমানো টাকাগুলো ওর ব্যাগে ভরে দিয়ে কান্না ভেজা সুরে বলে, যা, চইল্যাই যা! যেখানেই থাকবি এহানের চাইয়া অনেক বালা থাকবি! কাউরে দিয়া চিঠি লেখাইয়া আমারে তোর খবর দিছ্।

শাহিদা ও আসমত তখন অন্য এক ঘটনার মোকাবিলা করছে। রাফি এ ঘর থেকে চলে যেতেই ওদের তের বছরের ছেলে তানীম এসে ঢোকে। কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে, আব্বা আম্মা-তোমরা রাফি চাচাকে কেন এত বড় অপমানটা করলে? চোর কললে, গালমন্দ করলে, হাত তুলে চড়ও বসালে! তোমরা কি নিজের চোখে দেখেছ সে-ই চুরি করেছে?

দেখেছি, কী না দেখেছি সে কোনো প্রশ্ন নয়। আমাদের ধারণা নিশ্চয়ই ও সত্য বলছে না! আর যা করেছি, ঠিকই করেছি।

না করো নি! আর তোমাদের ধারণাও ঠিক না। কিছুটা উদ্ধত স্বরে বলে তানীম। তারপরেই স্বর নামিয়ে বলে, আব্বা-আম্মা, তোমরা আমাকে মাফ করে দাও! আসলে টাকাগুলো আমিই নিয়েছি। গতরাতে, পরশু ও আরো দু দিন।

বাবা-মা বোবা হয়ে যায়। তানীম তাদের খুবই ভাল ছেলে, তানীম তাদের গর্ব। গর্বের সাথে বলত আসমত,

তানীম তার দাদার চরিত্র পেয়েছে। আর এই ছেলের এতটা অধঃপতন!

টাকা চুরি করে তুমি কী করেছ তানীম?

আসমত আলীর স্বরটা যেন আর্তনাদ হয়ে বুকে থেকে বেরিয়ে আসে। নিজে চাকরিতে সৎ থাকতে পারে নি। তাই বলে তাদের ভাল ছেলে তার মত হোক তা সে কোনোদিনও চায় নি। তানীম চোখ তুলে বলল, আসলে ঠিক চুরির উদ্দেশ্যে আমি টাকাগুলো নেই নি। স্কলারশিপের টাকাটা পেয়েই আমি টাকাগুলো মানিব্যাগেই রেখে দেবো বলে ঠিক করেছিলাম ও তখনই এ বিষয়ে বলতাম।

কেন তুমি টাকা নিয়েছিলে? আর কেনইবা তুমি তোমার আম্মার কাছে টাকা চাও নি?

টাকা নিয়েছিলাম, আমরা ফুলকুঁড়ি ক্লাব থেকে এ বছর বিজয় দিবসে পুরনো মুক্তিযোদ্ধা যাঁরা এ শহরে আছেন, তাঁদের জন্য একটা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করব, সেজন্য! আর আম্মার কাছে টাকা চাওয়া? একবার নয়, পাঁচ ছ বার চেয়েছি! আম্মা বলেছেন, তার সৌখিন কতকগুলো খরচ আছে- সিনেমা, টেম্পল্পাড়ের নতুন ফ্যাশনের দুটো শাড়ি কেনা, বান্ধবীদের নিয়ে এমাসে একদিন চাইনীজ খাবারের

www.pathagar.com

টাকাটা হাতে রেখে, আর বাড়তি টাকা তাঁর নেই। তোমার নতুন ব্যবসায় আর একটু উন্নতি হলে, তিনি আমার এ ধরনের খরচের কথা ভেবে দেখবেন। মোট কথা আমি বুঝলাম, আমি এক পয়সাও আম্মার কাছ থেকে পাচ্ছি না। আম্মাকে দেখেছি এটা সেটা দরকার না হলেও কিনে ফেলেন। তখন তোমার ব্যাগ থেকে টাকা বের করে নেন। আমিও তাই করলাম, তবে টাকাটা আমি অদরকারে নয়, খুবই দরকারের জন্যই নিয়েছিলাম, আর বলেছি তো, সেটা আমি ফেরতও দিয়ে দিতাম।

ওদিকে রাফি সার্কিট হাউস ময়দানে এসেছে। তার গৌরবের, তার পুরস্কার পাওয়ার জায়গাটা শেষ বারের মতো একবার দেখে চলে যাবে অন্য কোনো শহরে। তার নিজের শহর, যে শহরে তার জন্ম, যেখানকার মুকুল নিকেতনে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সে পড়াশোনা করেছে, যে শহরের পথ, ঘাট, অলি-গলি, হাট, নদী-পুকুর সব তার চেনা। যেখানকার পথের ধুলার সাথে তার যুদ্ধের কাহিনী জড়িয়ে আছে। যে শহরের লোকদের বাঁচাতে গিয়ে তার হাত দু টি গেছে, সেই ময়মনসিংহ ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করতে হচ্ছে! বুকটা তার ব্যথায় ভেঙে যায়।

তানীমের মা-বাবার ভুল ভাঙলো। তারা তাড়াতাড়ি নানান জায়গায় লোক পাঠায়, বিশেষ করে ত্রিশাল ও মাশকান্দা বাস স্ট্যান্ডে, ফেরি ঘাটের কাছে ও রেল স্টেশনে। আলী তানীমদের নিয়ে আসে সার্কিট হাউসের মাঠে। দূর থেকে দেখে, যেখানে বিজয় দিবসে মঞ্চ তৈরি করা হয়, সেখানে বসে রাফি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ওরা সবাই যখন রিকশা থেকে মাঠের ধারে নামল, রাফি তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখের পানি মুছে একটা রিকশা ডাকছে। রাফির আলী চাচা সহ তানীমরা তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

রাফি ভয় পেয়ে যায়। আসমতের দিকে ফিরে, হাত জোড় করে বলল, আপনে আমারে মারছেন। আল্লাহ জানেন আমি চোর না, আমি আপনেরার একটা পয়সাতেও হাত দেই নাই। দোহাই আপনেরার। আমারে নিয়া থানা পুলিশ করবাইন না। এতে সব মুক্তিযোদ্ধারই অপমান! আর আমি তো আপনেরার বাসাত থাইক্যা, আমার জানের শহর ময়মনসিংহ থাইক্যাই এক্কেবারে যাইতাছিগা।

রাফির মধ্যে এখন মুক্তিযোদ্ধা জেগে উঠেছে। তাই তার বক্তব্য এখন স্পষ্ট ও সাহসী ।

আসমত রাফির পিঠে হাত রাখল। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শাহিদা। বলল, আমাদের খুবই ভুল হয়ে গেছে রাফি! তুমি আমাদের মাফ করে দাও ভাই! ঘরে ফিরে চলো!

–না ভাইজান, আমি আর আপনেরার বাসাত যাইতাম না। আমার একটা হাতও নাই, কাম করনের কোনো ক্ষমতা নাই।

শাহিদা এগিয়ে এসে বলে, হাত তোমার কাজের উপযুক্ত নাইবা থাকল, তোমার মুখের কথা আমাদের অনেক কাজে লাগবে। তোমার অস্তিত্বই আমাদের ছেলেদের, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রেরণা যোগাবে। তুমি তানীমদের মতো ছেলেদের কাছে যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখে নি তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী শোনাবে! তুমি হলে মুক্তিযুদ্ধের একটা নিশানের মতো।

রাফি অবাক হয়ে থাকিয়ে থাকে! সে কি বাস্তব জগতে আছে? না কি মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা কোনো নাটকের সংলাপ শুনছে?

ততক্ষণে আলী চাচা তার ব্যাগটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, আর তার অকেজো বাঁ হাতটা শক্তকরে ধরল তানীম।

www.pathagar.com

চাইনিজ খাওয়া

খাবারের প্রতি আজগরের ঝোঁকটা একটু বেশি। মা নেই বলে বাবার সে খুব বেশি আদরের। বাবা আজিম একজনের দোকানে সারাদিন পরিশ্রমের পর যেটুকু রোজগার করে, তার প্রায় সবটাই ব্যয় করে ফেলে ছেলের জন্যে ভাল ভাল খাবার কিনে। খেয়ে খেয়ে দশ বছরের আজগর বেশ নাদুসনুদুস হয়ে উঠেছে। আর খাবারের প্রতি লোভও তার অনেক বেড়ে গেছে ।

এক একদিন তার এক এক রকম খাবারের আবদার ।

বাজান হাটে যাচছো তো? আমার জন্যি খাগড়াই কিনে আনবা।

আইজকে কিন্তু আমার জন্যি ঢ্যাবা ঢ্যাবা কদমা আনবা ।

আমার জন্যি আইজকে তিলে খাজা আন্‌তি মনে থাক্‌পিনি তো?

আইজ রথের মেলাততে ছাচ খাজা আর ঢ্যাপের খই আন্‌তে হবিনি। কোনো কোনো দিন বলে,

বাজান মেলাদিন কাটাল খাইনে। আইজকে কাটাল আনবা!

আজিম বলে,

কাটাল কি একুন হয়রে বাপু? কাটাল উটপি বোশেক জষ্টি মাসে।

ধ্যের ছাতা! সব মাসেই কাটাল হবি নি ক্যা?

আজগরের রাগ ও বিরক্তি দেখে হাসে আজিম— স্নেহের হাসি।

পাড়ার ছেলেরাও হাসে, তবে ওরা হাসে ঠাট্টা করে। ওরা ওর আজগর নামটাই বদলে দিয়েছে। ওকে ডাকে ওরা 'পেটকো আজগ্যারে'।

পাড়ার ছেলে গেন্দা সেদিন ঠাট্টা করে বলল,

এই পেটকো অ্যাজগ্যারে! আইজ রাইত তিনটের সুমায় আমাদের বাড়ি তোর দাওয়াত!

যা, যা। মিত্যে কতা কওয়ার আর জাগা পালিনে! বাজান ছাড়া চোদ্দজন আমাক্ তিনটের সুমায় খাতি ডাক্‌পিনি! দাদি বাঁচে থাকতি, সেই বলে ডাইক তো না!

অবাক হয়ে যায় গেন্দা! বলে,

অমা! আজিম চাচা সত্যি তোক রাত তিনটের সুমায় খাতি দেয়! গর্বের সাথে মাথা ঝাঁকায় আজগর। হ, দেয়ই তো! চালিই দেয় !

সেই যখন তখন খাবার যোগাতো যে বাবা, হঠাৎ তিন দিনের অসুখে ভুগে মরে গেল।

বেচারা আজগরের সে কী বুক ভাঙা কান্না!

ও বাজান, বাজান গো! তুমি তো মরে গেছ! আর বলে ফিরে আসপানা। একুন আমাক কিডা খাগড়াই, কদমা, বাতোসা কিনি দিবিনি?

বাবা মরে গেলে কদমা, খাগড়াই তো দূরের কথা, গরিব চাচার সংসারে এসে দুবেলা মরিচ ভাতও জোটে না আজগরের। তার চাচা-চাচি নিজেরাই তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে এক বেলা আধপেটা খায়, আর একবেলা থাকে উপোস দিয়ে! আজগরের ভরা পেট খাওয়া জুটবে কী করে?

ঠিক এ সময়ে ঢাকা থেকে হক সাহেব এলেন গাঁয়ের বাড়িতে কোনো একটা কাজে।

আজগরের চাচা গরজ করে আজগরকে হক সাহেবের সাথে দিয়ে দিলেন। হক সাহেব তাকে কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়ে, বড় হলে পরে নিজেদের কারবারে লাগিয়ে দেবেন ভাবলেন।

www.pathagar.com

আজগরের এক মামা তার কাজের প্রধান সহকারী ছিল। গেল বছর হঠাৎ মারা গেছে।

যশোরের অজ পাড়া গাঁ থেকে একেবারে রাজধানী ঢাকার পথে যাত্রা।

গাড়ি ছাড়তেই কাঁদতে শুরু করে আজগর।

অ বাজান, বাজান গো! কিডা আমাক্ তুমার মতন খাতি দিবি গো? হক সাহেবের একজন সাথের যাত্রী মৃদু হেসে বলেন, ছেলেটা তার বাবার দুঃখে কাঁদে? না, খাবারের জন্যে কাঁদে?

হক সাহেব বলেন, বেচারার বাপ শুনেছি সারাক্ষণ ওকে খাবারের ওপরই রাখতো।

কমলাপুরে তাদের ট্রেন থামে। নেমে চারদিক তাকিয়ে আজগরের যেন মাথা ঘুরে যায়। .....এরি নাম ঢাকা শহর!

ওরা মাত্র নেমেছে, দেখে, তাদের সামনে দিয়ে চলেছে একটা বিরাট কাঁচের বাক্স।

একজন লোক সেটাকে ঠেলে হাঁঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাক্সের মধ্যে বড় বড় গামলায়া সাজানো রয়েছে পানতোয়া, রসগোল্লা, চমচম, পাউরুটি ও আরো অনেক রকম খাবার। দেখে আজগরের জিভে পানি এসে যায়।

পাশের রাস্তায় একজন হাঁকছে, চট্‌পটি! চট্‌পটি! মজাদার চট্‌পটি! চট্‌পটি!!-এ আবার ক্যামুন খাবার? মনে মনে ভাবে আজগর।

আর একজন মোটা অথচ সুন্দর সুর করে বলছে।

চাই, চা-গ্রাম! চা-গ্রাম!

চা-গ্রামটাই বা ক্যাম্বা খায়?

আরো বহু জনে বহুরকম খাবার নিয়ে চলেছে। আজগরের ইচ্ছে হয়, সব কিছু একটু খেয়ে, অন্তত একটু চেখে দেখতে! কিন্তু হক সাহেবকে বলতে সাহস হলো না। পথে অনেক খাবার খাইয়েছেন।

একটা স্কুটার নিলেন হক সাহেব। স্কুটারে যেতে যেতে আজগর দু পাশে তাকিয়ে দেখে।..আরে বাপরে! এক বাড়ির ওপর আরেক বাড়ি। আবার তারও ওপরে কয়েক ধাপ বাড়ি! কী তাজ্জব কাণ্ড!

আজগর গ্রাম ছেড়ে কোনো দিন শহরে যায় নি। বাড়ি, গাড়ি, সাজানো বাগান, দোকান পাট--- আরও কত কী যে দেখল আজগর!

নানান রকম দোকানের মধ্যে মিষ্টি, ফল ও বিস্কুটে সাজানো দোকান গুলোই বেশ ভাল লাগল আজগরের।

এরোম সাজানো দোকানের খাবার খাতি না জানি কত মজা! মনে মনে ভাবল সে।

এরপর আজগর হক সাহেবের সাথে একটা বড় বাড়িতে এসে পৌঁছলো। লোহার গেট খুলে একজন জোয়ান লোক ছুটে এল। সালাম জানিয়ে বলল,

হঠাৎ আইলেন স্যার?

হ্যাঁ, একদিন আগেই চলে এলাম। বললেন হক সাহেব।

তাঁর স্ত্রী সোফিয়া হক তখন ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনো কারণে বাইরে গেছেন।

হক সাহেব একটা চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। লোকটিকে বললেন,

www.pathagar.com

মালী আমি এক্ষণই বাইরে যাচ্ছি। তোমাদের বেগম সাহেবা না ফেরা পর্যন্ত একে একটু দেখে রেখো। আর, কিছু খেতে দিও।

মালী, তাকে হাত মুখ ধুইয়ে সামান্য খাবার খাইয়ে নিজের কাজে মনোযোগ দেয়।

কাঁচি দিয়ে পাতাবাহারের পাতা ছাঁটে ও খুরপি দিয়ে ফুল গাছের গোড়ায়া মাটি নিড়ায়।
আজগর কাছে এসে বসে। প্রশ্ন করে, এ মিয়েভাই, এ গাছে কী ফল ধরবিনি?

মালী হাসে। দুষ্টুমি করে বলে, এই গাছগুলাইনে পাকা টসটসে খুব মিঠা মিঠা ফল ধরবো।

সত্যি? খুশিতে আজগরের সব কটি দাঁত বেরিয়ে পড়ে।
মালী কেবল মিটি মিটি হাসে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সোফিয়া হক ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। ইতোমধ্যে হক সাহেবও বাড়ি ফিরেছেন। তাঁর কাছ থেকে সোফিয়া হক ওর সম্বন্ধে সব শুনলেন। বাবুর্চিকে ডেকে বললেন, ছেলেটা গোসল করে এলেই ভাত খেতে দাও! কত দূর থেকে এসেছে! আজগরের দিকে ফিরে বললেন, এই যে আজগর, আমাকে ডাকবি খালাম্মা বলে। ও হলো তোর শিরিন আপা, আর ওই যে তড়বড় করে বাইরে চলে গেল ওকে ডাকবি ভাইয়া–শিপার ভাইয়া, বুঝলি? আয়, এবার আমার সাথে ঘরে আয়।

ঘরে ঢুকে আজগর তো তাজ্জব বনে গেল। আরে কী কান্ড! একটা ছোট বাক্স থেকে আওয়াজ আসছে...ক্রিং....ক্রিং...ক্রিং...

www.pathagar.com

ছুটে এলেন শিরিন আপা। চোঙের মতো কী একটা কানের ও মুখের কাছে ধরে একা একাই কথা বলতে শুরু করলেন যে! শিরিন আপা তখন বলছেন,

হ্যালো! কে, ছোট চাচা? আজ দুপুরে বাসায় খেতে আসবে না? নজবত চাচার সাথে চাইনিজ খেতে যাচ্ছে? ও আচ্ছা– আচ্ছা– আম্মাকে বলছি এক্ষণই!

মায়ের দিকে ফিরে খবরটা দিল শিরিন।

কী খেতে যাচ্ছেন? চাইনিজ!! এ খাবারের নামটা নতুন শুনল আজগর।

দুপুরে মুরগীর গোশত দিয়ে পেট পুরে খেয়ে খুব খুশি হলো আজগর। খেতে খেতে একবার মনে পড়ল- কী খাওয়ার কথা যেন বলছিলেন শিরিন আপা? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। চাইনিজ খাওয়া । কী জানি? ক্যামুন ধারা খাবার কে জানে?

কয়েকটা দিন গড়িয়ে যায়।

এখানে বেশ সুখেই আছে আজগর। ছোটখাট কাজ আর খাওয়ার মধ্য দিয়ে তার দিন কেটে যেতে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝেই গাঁয়ের কথা মনে পড়ে। সাথিদের কথা, ছোট নদীটা, ছনে ছাওয়া তাদের ছোট মাটির ঘর..... বিশেষ করে বাবার কথা মনে হলে বুক ফুঁড়ে কান্না নামে!

কত রকম খাবার যে তাকে তার বাজান এনে দিত! কত ভাল ছিল তার বাজান! চাচা-চাচির কথাও মনে হয়। তারাও তাকে আদর করতো। হলে কী হবে? তাদের সবাইকে যে এক বেলা না খেয়ে থাকতে হতো!

আজগরের কান্না থেমে যায়। সব সহ্য করতে পারে আজগর, ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না ।

এখানে নানান রকম খাবার খেতে পাচ্ছে বলে খুশি আজগর। তবে দেশে যে রকম খেত, ঠিক সে রকম না। কতকগুলো খাবার বেশ স্বাদের লাগে, আবার কতকগুলো একটুও ভাল লাগে না। এখানে ঘি দিয়ে যে কোরমা ও রোস্ট করা হয়, সেগুলোর কেমন মিঠে মিঠে স্বাদ! তাদের চুনো মাছের চচ্চড়ির তুলনা হয় না! এখানের কোরমা পোলাও ছাড়া সবাই আর একটা খাবার খুব পছন্দ করে খায়। সেটা হলো সেই যে প্রথম এসেই শুনেছিল-ছোট চাচা খেয়েছিলেন সেই চাইনিজ খাবার। এটা কী ধরনের খাবার আজগর এখনো তা খায় নি। খাওয়া তো দূরের কথা, দেখেই নি কোনো দিন। তা, দেখবে কী করে? সে খেয়াল করছে, এ বাড়িতে 'চাইনিজ' কেউ খাবার ঘরে বসে খায় না। ও খেতে হলে সবাই সাজ গোজ করে বাড়ির বাইরে চলে যায়।

ইতোমধ্যে আজগরকে তার শিরিন আপা পড়াতে শুরু করেছে। বর্ণ পরিচয় শুরু।

প্রথম দিন শিরিন আপা তাকে পড়ালেন- 'অ' এতে অজগর। খুব খুশি হয়ে গেল আজগর। আরে, এ যে প্রায় তারি নামটা! কিন্তু মানেটা শুনে গা শিরশির করে ওঠে আজগরের।–অবাবা! অজগর নাকি মস্ত বড় সাপ। কী সর্বনেশে কথা! ধ্যেৎ, এরোম পড়া কি ভাল লাগে?

বই বন্ধ করে ফেলে আজগর। গায়ে তার রীতিমতো কাঁটা দিয়ে ওঠে ।

পরদিন শিরিন আপার তাগিদে ফের বই খুলতে হলো। আজ কিন্তু পড়তে গিয়ে খুশিতে ডগমগ হলো আজগর। -ওহ! কী সব মজার কথা! 'আ' এতে আম, 'ই' এতে ইলিশ মাছ।

খুব উৎসাহের সাথে পড়ে আজগর। এক সময় বলে, জানেন শিরিন আপা, আজিজ চাচাদের কাঁচা মিঠে আম গাছের না, আমগুলো খুবই মজার! আমরা সব সুমায় পায়ড়ে খাতাম। আর ইলশে মাছ না, আমার খাতি সব বেরতে ভাল লাগে।

শিরিন আপা হাসে! হাসতে হাসতে বলে, বুঝেছি। খাবার কথায় ভরতি তোর বই। খুব তাড়াতাড়ি পড়া শেখা হয়ে যাবে। নে, পড় এবার!

www.pathagar.com

এরপর দু দিন বাদেই শিরিন আপা তাকে পড়ালো- 'ক' এতে কলা, 'খ'এতে খেজুর। আজগরের সন্দেহ জাগে। প্রশ্ন করে,

শিরিন আপা, ওডা কি খেজুর না খাজুর? খাজুর গুড় আর খাজুর রস বাড়ি থাক্‌তি কত খাতাম!

শিরিন আপা হেসে ফেলে।

শুদ্ধ ভাষায় একে খেজুর বলে, বুঝলি?

আজগর হাসে। এমনি ভাবে আজগর শিখল 'চ' এতে চিনি। আজগর প্রশ্ন করে, শিরিন আপা, ওডাক তো চেনি বলে। আগে যে চেনি কতাম। মিষ্টি করে ধমক দেয় শিরিন, এবার থেকে আর চেনি বলবে না, বলবে চিনি। মনে থাকে যেন! চয়ের অক্ষরে এসে আজগরের মনে পড়ে যায় চাইনিজ খাবারের কথা। বলে, আচ্ছা শিরিন আপা, 'চ' দিয়ে তো চাইনিজ খাওয়া কওয়া যায়, তাই না? ওর শিরিন আপা ঘাড় নাড়ে, তা হয়।

সেদিন সোফিয়া হকের ছোট বোন ও তার স্বামী এলেন বগুড়া থেকে। সোফিয়া হক তাদের খুব সমাদর করলেন। এক সময়ে বললেন, তোমরা যে ক দিন ঢাকায় থাকবে, এক বেলা করে চাইনিজ খাবে। যদিও আমি নিজে তা রান্না করতে পারি না, তবে বেশি দূরেও তোমাদের যেতে হবে না। ওই তো রাস্তার ওপাশেই রয়েছে।

আজগর জানালার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বেশ কয়েকবার উঁকি মেরে দেখল। মনে মনে বলল, কই, কোনো দোকানদার তো বসে চাইনিজ বেচতিছে না!

ওরা বসবার ঘরে আলাপ করছে, এমনি সময়ে আরো দু জন মেহমান এলেন। তাঁদের জন্যে চা তৈরি করতে বলা হলে ঘোর আপত্তি জানালেন তাঁরা।

পেটে তিল ধরনের জায়গা নেই। দুপুরে চাইনিজ খেয়েছি। মজা লাগছিল বলে খাবারের পরিমাণটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। কাজেই মাফ চাই!

ওরাও চাইনিজ খেয়ে এসেছেন? খুবই মজার খাবার!

এরপর আরো বহুবার চাইনিজ খাবারের কথা শুনে আজগরেরও চাইনিজ খেতে ভীষণ ইচ্ছে হলো। সেদিন সন্ধ্যার আগেই শিপারের কাছে মনের ইচ্ছে প্রকাশ করল, শিপার ভাই, একটা কতা বলি?

শিপার তখন বাইরে বের হওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি করছে। বলল, কী বলবি বল তাড়াতাড়ি!

আচ্চা, বলেন তো চাইনিজ খাতি ক্যামুন?

চাইনিজ খেতে? খুব ভাল। আমার তো বাসার খাবারের চেয়েও চাইনিজ খেতে বেশি ভাল লাগে।

তালি আমি একদিন খামু।

চাইনিজ খাবি? তা আব্বা বা আম্মাকে বলিস না কেন? খাইয়ে আনবে খন। বলে চলে যায় শিপার।

তা তাঁদের কাছে বলবার আগেই আজগর একদিন চাইনিজ খাওয়া না হোক, চেখে দেখার সুযোগ পেয়ে গেল। সেদিন রোববার। দুপুরে সবাই চাইনিজ খেতে বাইরে চলে গেলেন।

ওরা চলে গেলে খুব আপসোস হলো আজগরের। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল একবার বলে যে সেও তাঁদের সাথে আজ চাইনিজ খেতে যাবে। খেয়ে দেখবে কেমন এটা — মিঠে, টক, নোনতা, পানসে না ঝাল? কিন্তু মেহমানদের সামনে তাই কি বলা যায়? তাই শেষ পর্যন্ত তার বলা বা যাওয়া কোনোটাই হলো না। বাসায় আয়া ও বাবুর্চি ছাড়া রইলেন শিরিন আপা। ভীষণ মাথা ধরেছে বলে শিরিন আপা চাইনিজ খেতে গেলেন না।

কাছেই ওষুধের দোকান। মাথা ব্যথার ওষুধের নাম কাগজে লিখে আজগরকে দোকানে পাঠানো হলো।

www.pathagar.com

দোকানে এসে আজগর দেখে- হলদেটে ফরসা, ছোট চোখ, খাট নাক অথচ সুন্দর একটা লোক ভাঙা ভাঙা বাংলায় কর্মচারী সালামের কাছে কী কী ওষুধ চাচ্ছে।

লোকটাকে দেখে ভারি মজাই লাগল আজগরের। সালামের কাছে লোকটা ওষুধের একটা লম্বা ফর্দ দিল। সালাম তা মিলিয়ে মিলিয়ে ওষুধ দিতে থাকে। আজগরও এক ফাঁকে তার ওষুধের নাম লেখা কাগজটা সালামের সামনে এগিয়ে দেয়। ওষুধ কিনে নিয়েও দাঁড়িয়ে থাকে আজগর। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটে খুঁটে দেখে সেই হলদেটে ফরসা লোকটাকে।

সালাম তার দিকে ফিরে বলল, কিরে, তুই দেহি লোকটারে চোখ দিয়া গিল্যা খাইতাছস! আগে বুঝি চাইনিজ দেখস নাই! কুনদিন?

চাইনিজ! ও চাইনিজ! এম্বা!! এক বুঝি মানষি সক করে খায়?.... দূর ছাই! ওতো মানুষ! দেখতি অম্বা হলি কী হবি? আসলে তো মানুষই! না হয় আরাক দেশের মানুষ। .... তেবে গা...তাহলি কি এর হাত পাও ধুয়ে কোনো ঝোলটোল রাদে? না, সেরোম কিছু?

মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে আজগর। নিজেই জবাব দেয়। এক সময় সালামকে প্রশ্ন করে, অ সালাম ভাই, সত্যি কি উডাক চাইনিজ কয়?

তা সত্যি না মিথ্যা-ওরেই জিগানা!

হাসি হাসি চোখে লোকটির দিকে ফিরে বলে সালাম। ভদ্রলোক ওদের কথা কিছুটা বুঝতে পারেন। বলেন,

হ্যাঁ বালক, আমি চায়নিজ আছে।

আজগরের মাথায় সব তাল গোল পাকিয়ে যায়। ... চাইনিজ !! সকলে যে খায় সেই চাইনিজ !! তা কেমন করে হয়?

লোকটি তখন ওষুধগুলো ব্যাগে তুলছেন। আজগর খুব নিচু স্বরে সালামকে জিজ্ঞেস করে,

আচ্ছা সালাম ভাই, মানষি যে চায়নিজ খায়, ইডা কি হেই চাইনিজ? সালাম ওর মনের ভাব বুঝতে পারে।

একটা দুষ্টুমি বুদ্ধিতে ওর দু চোখ চিকচিক করে ওঠে। বলে,

হ্যাঁ, ওই চাইনিজ তো।

তাহলে মানষি ওক খায় ক্যাম্বা?

হেসে ফেলে সালাম , তা আমি কী জানি?

আপনি খায়ছেন কোনেদিন?

মজা করবার জন্যে জবাব দিল সালাম,

না, খাই নাই এহনো। তবে চাইখ্যা দেখছি।

চাইনিজ ভদ্রলোক যখন হাত-ব্যাগে ওষুধগুলো গুছিয়ে নিয়েছেন। চলে যাবেন এখন। আজগর বলে, আমি তালি ইকটু চাকে দেখপো সালাম ভাই?

আজগরের প্রশ্নে হো হো করে হেসে ওঠে সালাম। ভদ্রলোক কিছু বুঝে উঠবার আগেই আঁতকে ওঠেন, লাফিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন।

ওহ গড। কী হইয়াছে? বালক কি পাগল হইয়া গিয়াছে?

আশে পাশের দোকান ও রাস্তা থেকে ততক্ষণে লোকজন মার মুখো হয়ে এসেছে। কী হয়েছে? কী হয়েছে? কী হয়েছে জানবার আগেই আজগর পড়িমরি করে দে ছুট! লোকজন তখন হৈ চৈ করছে।

www.pathagar.com

ব্যাপার কী? ব্যাপারখানা কী? প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে সালাম। হাসতে হাসতে সব ঘটনাই সে বলে সবার কাছে।

ওদিকে আজগর তখন ছুটতে ছুটতে হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁপছে। হাত থেকে ফসকে গিয়ে হারিয়ে গেছে তার শিরিন আপার জন্যে কেনা মাথা ব্যথার ট্যাবলেটগুলো।

হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে শিরিনের ঘরে। কীরে, কী হলো?

জবাবে ভ্যাৎ করে কেঁদে ফেলে আজগর।

এ্যা... এ্যা— সবাই চাইনিজ খায়! সালাম ভাই কলো সেও বলে চাকে দেখেছে। আমি কোনো দিন খাই নি ! কেবোল ইকটু চাকে দেকতি গেছি-অমনি...

কী চেখে দেখতে গিয়েছিলি তুই?

শিরিনের প্রশ্নের জবাবে ফুঁপিয়ে ওঠে আজগর।

সালাম ভাই কলো উডাক্ চাইনিজ কয় -একটা সুন্দর মানষির মতোন। আমি...এ....এ শিরিন বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটা। সে হেসে ফেলে। ওর মাথা-ব্যথা ততক্ষণে আপনিই কমে গেছে। ওষুধ হারিয়ে ফেলেছে তাতে আজগরকে না বকে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে থাক, আর কাঁদিসনে! আমরা কালই তোকে চাইনিজ খাইয়ে আনব।

চাইনিজ খাবারের নাম শুনে কিন্তু খুশি না হয়ে, আঁতকে ওঠে আজগর। চেঁচিয়ে লাফিয়ে ওঠে। দু হাত নেড়ে বলে, ওরে বাবারে বাবা! আর না! আমি আর চাইনিজ খাতি চাব না। কোনো দিন না !

মানষি খালি মিছে কতা কয় চাইনিজ নাকি মজার খাওয়া। হুর, মজার না, ছাতা!

www.pathagar.com

পয়সা অত সস্তা নয়

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তৃতীয় দফা ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করল মিল্টন।

দাদাজান, দাদাজান, দাওনা এক টাকা পঁচিশ পয়সা! বইয়ের দোকানটা বন্ধ হয়ে যাবে যে!

হোক গে বন্ধ! মিল্টনের দাদাজান দাঁত খিঁচুনি দিলেন।

দোকান বন্ধ হচ্ছে বলে তোমাকে সব পয়সা ঢেলে দিয়ে আমার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে হবে, তাই না? খুব মজা পেয়েছ দেখছি!

বারে, মজা পেলাম কোথায়? বই কিনতে হবে না? কাল বই না কিনে স্কুলে গেলে স্যার শাস্তি দেবেন যে! হুঁ, আমি তাহলে স্কুলে যাবো না!

না তুমি স্কুলে যাবে না! বাসায় বসে বসে ঘাস কাটবে! ঘাস কাটার জন্যে আবদুল আছে। তোমাকে সে কাজটি করতে হবে না।

আমি ঘাস কাটি বা না-ই কাটি, মোটকথা বই না নিয়ে আমি কিছুতেই স্কুলে যাবো না, দেখো, হুঁ !

দাদাজান মিল্টনের হাতে এবার পঁচিশটা পয়সা গুঁজে দিয়ে বলেন, না, না, ওকাজ করিসনে নে ভাই! পঁচিশটা পয়সা রাখ! স্কুলে লজেঞ্চুস কিনে খাস!

একটু আগে দ্বিতীয় দফা ঘ্যান-ঘ্যানানি থামাবার জন্য আরো পঁচিশ পয়সা দিয়েছিলেন দাদাজান। সে দিয়ে চিনেবাদাম কিনে বসে বসে খেয়েছে মিল্টন। খেয়েই ফের শুরু করেছে এক টাকা পঁচিশ পয়সা দাও। বই কিনব। ব্যাকরণ বই।

দাদাজান রেগে গেলেন। ভয়ানক রাগলেন।

এক টাকা পঁচিশ পয়সা অর্থাৎ কিনা পঁচিশ পয়সা যোগ আরে এক শ পয়সা। তা দিয়ে কিনতে হবে একটি মাত্র বই! সাধারণ একটা বাংলা ব্যাকরণ বই!....নাঃ ফতুর করবে ! এই মিল্টনটাই তাঁর শেষ সম্বল ব্যাঙ্কে জমানো সব টাকা ফতুর করে ছাড়বে।

সব তো গেছে পাক-মিলিটারি আমলে। গ্রাম থেকে ফিরে কিছুই পান নি। ঘরের সব জিনিস লুট হয়ে গেছে। একটা ঝাড়ু পর্যন্ত পান নি এসে। ঝুঁকি নিয়ে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রেখে পালিয়ে ছিলেন সবাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য! পালাবার সময় পথে বর্বর পাকসেনারা গুলি করে মেরে গেছে তাঁর একমাত্র ছেলে ও ছেলের বৌকে—ওই মিল্টনের বাবা ও মাকে।

ভাবতেই দু চোখের কোল ছাপিয়ে পানি উপছে পড়ে দাদাজানের! আহারে, মাসুম বাচ্চাটা আজ এতিম!

দাদাজানের চোখে পানি দেখে মিল্টন বলে, বারে, বইয়ের দাম চেয়েছি বলে কান্না শুরু করে দিলে? উহুঁ সেটি হবে না! কাঁদ-কাট যাই কর, বইয়ের দাম তোমাকে দিতেই হবে!

চোখের পানি মুছে দাদাজান আলমারি থেকে পঞ্চাশ পয়সা বের করে মিল্টনের হাতে দিয়ে বললেন, নে ভাই পঞ্চাশ পয়সা। দুটো সন্দেশ কিনে খাগে! তোর বাবা মা বেঁচে থাকলে আজ.....

দাদাজান হাতের পিঠ দিয়ে চোখের পানি মোছেন। মিল্টন তার দাদাজানের কান্না দেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলে,

বেশ, দাও পঞ্চাশ পয়সা! আর এর সাথে দাও আরো পঁচাত্তর পয়সা । তা হলেই হবে।

www.pathagar.com

কী বলছিস তুই? আমি এ পয়সা দিচ্ছি সন্দেশ খেতে। আর তুই কিনা....

আমি সন্দেশ খাবো না। না খেয়ে বই কিনব। জেদ ধরে মিল্টন।

বললেই হলো খাবো না! আবদুল!

জ্বি হুজুর! বলে মাথা ভরতি কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুলওয়ালা গাট্টাগোট্টা আবদুল এসে হাজির হয়।

আবদুল! পঞ্চাশ পয়সার সন্দেশ!

জ্বি হুজুর। ছুটে চলে যায় আবদুল। তারপর নিমেষের মধ্যেই সেই গল্পে পড়া আলাদীনের দৈত্যের মতো দুটো সন্দেশ নিয়ে হাজির । সন্দেশ দুটো খেয়ে নিয়ে আবারও হাত পাতে মিল্টন।

এবার বইয়ের দাম দাও! এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

চটে গেলেন দাদাজান।

ফের এক টাকা পঁচিশ পয়সা! কেন অর্ধেক দামে পুরানো বই কিনতে পার না? তা পারবে কেন? কেবল তালে আছ কী করে ফতুর করবে আমাকে!

পুরানো বইয়ের কথা মনে হতেই দাদাজান তৎপর হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বাষট্টি পয়সা বের করে মিল্টনকে দিলেন। দিয়ে ধমকে উঠলেন।

যা, ওঠ্। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে শিগগির কিনে নিয়ে আয় অর্ধেক দামে। যা এক্ষণই যা। নইলে অন্যেরা এসে ঠিক নিয়ে যাবে পুরনো বইগুলো। টাকার দাম আছে সবার কাছে, বুঝলি?

টাকার যে দাম আছে তা মিল্টনও বুঝতে পারে। কিন্তু হলে কী হবে! আজ সে পুরানো বইয়ের দোকানে যাবে কী করে? সে দোকান যে বহুদূরে। আজ বলে তার পায়ে একটা ফোঁড়া হয়েছে। হাঁটতেই পারছে না! অথচ নতুন বইয়ের দোকনটা রয়েছে তাদের বাসার একেবারে সামনে । সে কথা বলতেই দাদাজানের রাগ আরো কয়েক ডিগ্রি চড়ল।

বলি পায়ে ফোঁড়া হয়েছে, হাঁটতে পারবে না! তাই বলে রিকশা চড়েও কি যেতে পারবে না? যা শিগ্‌গির রিকশায় চড়ে যা! গিয়ে পুরানো বই একখানা কিনে নিয়ে আয়। সাবধান, নতুন বইয়ে হাত দিবিনে! তার জন্যে যদি কয়েকটা দোকান ঘুরতেও হয়, তাও রাজি। তবু সোয়াশ পয়সা ...দশটা বা পাঁচটা মাত্র নয়, একেবারে সোয়াশ পয়সা ... একটি মাত্র বইয়ের জন্যে খরচ করবি নে। হ্যাঁ মনে থাকে যেন।

এরপরে রিকশায় চড়ে তিন চার দোকান ঘুরে মিল্টন যখন পুরনো একটা ব্যাকরণ বই নিয়ে এল বাষট্টি পয়সায়, দাদাজান খুব খুশি হলেন। খুশি হয়ে দু টাকা ভাড়া চুকিয়ে বই খানা হাতে নিয়ে বললেন, এই তো বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছিস! একটা নয়, দুটো নয়, পুরোপুরি, বাষট্টিটি পয়সা বাঁচিয়ে দিয়েছিস! খুব ভাল করেছিস! এমনি করে প্রত্যেক ব্যাপারে আমাকে পয়সা বাঁচাতে সাহায্য করবি, বুঝলি? মিল্টন সব বুঝলেও কিছু বলবার উপায় নেই। তাহলে ভীষণ রেগে যাবেন দাদাজান। তারচে কী দরকার?

এর ক দিন পরেই আবার দাদাজান রাগ করলেন। রেগে-মেগে টং হলেন। এই পয়সার ব্যাপার নিয়েই। এবারের রাগটা বার্তালো গিয়ে শুধু একা মিল্টনের ওপর নয়, মিল্টনের বয়সী এক ঝাঁক ছেলের ওপরেও।

মিল্টনের বয়সী ছেলেদের খুব ভালবাসেন দাদাজান। কিন্তু তাই বলে ওদের জন্য ওই পয়সা খরচ!

হুঃ! পয়সা অত সস্তা কিনা!

www.pathagar.com

দাদাজান সেদিন তাঁর বসবার ঘরে বসে পয়সারই হিসাব-নিকাশ করছিলেন নিজে নিজে। এমন সময় সেখানে ঢুকল এক দল ছেলে। তারা চাঁদা প্রার্থী। চাঁদা তুলতে বের হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করবে বলে। মিল্টন দেখল তাদের ক্লাসের তুষার, মিন্টু, পিকলু, সবুজ ওরাও এসেছে। মনে মনে প্রমাদ গুনল সে। দাদাজানের কাছে ওরা এক পয়সা তো পাবেই না, উলটো কথা শুনতে হবে হাজার খানেক। ফিরে গিয়ে ওরা ওর দাদাজানের বদলে, পেছনে লাগবে মিল্টনেরই ...ঠোঁট বাঁকাবে, জিব দেখাবে, সব কটি দাঁত বের করে হাসবে। হয়ত বিদঘুটে সব ছড়াও লিখবে! নাহ্!

মিল্টন শুনল, দাদাজানের ঠোঁট বাঁকিয়ে প্রশ্ন করছেন, চাঁদা? তার মানে হলো গ্যে টাকা?

শুধু দু টাকা ধরেছি আপনার নামে। তাড়াতাড়ি সরে যাবার জন্য বলল একজন। মিল্টন তাকিয়ে দেখল ওদেরই পাড়ার রুবেল।

দাদাজানের স্বভাব ও কিছুটা জানে হয়ত।

দাও না দাদাজান, দুটো টাকা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও! ওদের হয়ত অনেক কাজ আছে, চলে যাক!

মিল্টন ব্যাপারটা আর বেশিদূর এগোতে দিতে চায় না।

কী বললি? তাড়াতাড়ি? তাড়াতাড়ি দিতে বললি? ওদের কাজ আছে? বলি, ওদের কাজ আছে, আর আমাদের আবদুলের কাজ নেই, না? আবদুল কেবল বসে বসে ভেরেন্ডা ভাজছে.... তাই কী বলতে চাস তুই?

মিল্টন তার দাদাজানের কথার তাৎপর্য ধরতে পারে না। দাদাজান তখন ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, এ্যাই ছোঁড়ারা, বোস, বোস! বসে পড় সব ! হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে থাকবিনে সঙের মতো!

ছেলেরা রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। তারই মধ্যে একজন সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলে, দুটো টাকা দিলে চলে যেতাম!

দুটো টাকা। বলি দুটো টাকা কি এমনি আসে? কষ্ট করে ও বাপের টাকা খরচ করে পড়াশোনা করেছি ছোটবেলায়। তারপর চাকরি করেছি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করেছি, ব্যাঙ্কে জমিয়েছি। তার মধ্যে থেকে পুরো দুটো টাকা তোদের এমনি এমনি দিয়ে দেবো? পয়সা খুবই সস্তা দেখেছিস তোরা, তাই না? হুঃ! অত নয়! পয়সা অত সস্তা নয়, বুঝলি?

ছেলেরা এ ওর মুখের দিকে তাকায়। তারা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, চলে যাবে বলে।

ওকি, সব উঠে দাঁড়ালি কেন? বোস, বোস না! এলি আর অমনি টাকা পেয়ে গেলি! তাই কি হয় কখনো? টাকা রোজগারে পরিশ্রম নেই?... এমনি এমনি আকাশ থেকে ঝুরঝুর করে পড়ে, না? বোস বললাম! আবদুল! এ্যাই আবদুল! কী ব্যাপার? আবদুলকে আবার ডাকা কেন? চাঁদা সংগ্রহকারীদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। লাঠি-টাঠি আনতে বলবেন নাকি আবদুলকে? হায় আল্লাহ! চাঁদা চাইতে এসে শেষ পর্যন্ত লাঠি পেটা!

ইতোমধ্যে গাট্রা-গোট্রা আবদুল এসে হাজির হয়ে বলল, জ্বি হুজুর। হুকুম করুন!

এই সেরেছে! এ যে সেই গল্পের ডাকাত সর্দারের জল্লাদের মতো! শুধু হুকুমের অপেক্ষায় আছে। দাদাজান ইশারায় কী যেন বললেন আবদুলকে। আবদুল মাথা ঝাঁকালো। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে একটা কোণাকুনি হাসি ছুড়ে মারল। তারপর ঝট করে সরে গেল সেখান থেকে। সন্দেহজনক হাসি ও গতিবিধি!

আমরা তাহলে যাই দাদাজান! প্রায় কেঁদে ফেলে রুবেল, চাঁদা লাগবে না। সত্যি বলছি, লাগবে না!

www.pathagar.com

সত্যি মিথ্যে বুঝিনে! চাঁদা নিতে এসেছ, তা এমনি দিয়ে দেবো? তাও একসাথে দুশটি পয়সা উহুঁ! তা চলবে না ! আমি একসাথে এত পয়সা মোটেই দিতে পারব না! একশ পঁচাশি' পয়সার একটি পাইও তোমরা বেশি পাবে না।

ওদিকে মিল্টনের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। কে জানে দাদাজান কী করবেন! ইতোমধ্যে দাদাজান আরো একবার মোটা গলায় হাঁক দিলেন, আবদুল!

ভেতর থেকে তেমনি স্বরে জবাব, আইতাছি হুজুর!

আইতাছি হুজুর! মুখ ভেংচে বলেন দাদাজান, তোকে আমি কী বলেছি?

আইতছি তো! সব ভালভাবে যোগাড় যন্ত্র কইরা লইয়া আইতাছি। আপনে হগ্‌গলরে ধইরা রাখুইন! দেখবাইন হুজুর, কেউ য্যান্ না পালায়!

আর যায় কোথা? ছেলেরা পড়িমরি করে দরজার দিকে ছুটে যেতে থাকে। দাদাজান ঝট করে উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন দরজায়। পথ আগলে বললেন, উহুঁ তা হবে না ! তাড়াতাড়ি বললেই হলো? তাড়াতাড়ি! তা আবদুল আর কত তাড়াতাড়িতে করবে সব ! অগত্যা, কী আর করবে? টিপটিপ বুকে প্রহর গুনতে থাকে ওরা। আল্লাহ জানেন, কী শাস্তি আছে ওদের কপালে! দাদাজানের হুকুমে না জানি কী নিয়ে এসে হাজির হচ্ছে আবদুল...যা দৈত্যের মতো শরীর! আর ছুটোছুটি করে ভূতের মতো! ওর দ্বারা অসম্ভব কিছু কাজ আছে বলে ওদের মনে হয় না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেতরের দরজা ফাঁক হলো। গণ্ডারের মতো লোকটা ! সেই আবদুল ভেতরে এল। হাতে একটা কেরোসিনের চুলো। ঘরের ভেতর চুলোটা রেখে বলল আবদুল, এইখানেই নিয়া আইলাম হুজুর ! গরম-গমর বুজলাইন তো !

গরম! গরম! তার মানে গনগনে আগুনের ছেঁকা দেবে ওদের গায়ে!

ওঃ! যা ভেবেছে, তাই। ছুটে গিয়ে লোহার একটা খুন্তি নিয়ে এল আবদুল। এবার আর উপায় নেই!

এরপর চুলোটা সামনের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে আগুন ধরিয়ে একটা কড়াই চাপিয়ে দিল। চাপিয়ে তার মধ্যে ঢেলে দিল বেশ কিছুটা ডালডা বা ঐ জাতীয় কিছু। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল আবদুলের দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। হাসছে দুষ্টের মতো।

ছেলেদের মুখ শুকিয়ে গেছে। মিল্টনের চোখের কোণে টলটল করছে পানি। ছেলেরা এ-ওর গায়ে জড়িয়ে আছে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে ওরা।

আবদুল উঠে দাঁড়লো। দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় আদেশ দিল, হ,ঠিক আছে! চক্ষু বন্ধই রাখেন আপনেরা। হ,খুল্‌বাইন না। মনে থাকে য্যানে!

অগত্যা কী আর করে? সবাই বন্ধ চোখের পাতা ঠেসে চেপে ধরে থাকে। মিল্টনও। ওদের বন্ধ চোখ, ঘর্মাক্ত হাত, কম্পমান পা। বুকের ভেতর শব্দ হচ্ছে-টিপ্, টিপ্, টিপ্! ওরা ফের শোনে আবদুলের বিদঘুটে স্বর, হ তাকাইবেন না কইলাম, সাবধান!

তারপরেই শোনা যায়-ছ্যাৎ, ছ্যাৎ, ছ্যাড়াৎ! একটু পরে পরে কী সব যেন পড়ছে কড়াইয়ে। কী এসব, কে জানে?

শুধু এইটুকুই জানে ওরা, আর উপায় নেই। মিল্টনের পাগলা দাদাজানের খপ্পরে পড়েছে। আগুনের ছেঁকা আজ খেয়েই যেতে হবে! বেশ কিছুক্ষণ ধরে শোনা গেল ওই ছ্যাৎ, ছ্যাৎ, ছ্যাড়াৎ শব্দ। নিশ্চয়ই খুব গরম করা হচ্ছে লোহার শিক, খুন্তি বা ঐ ধরেনের কিছু।

হায় আল্লারে! ভয়ে ওরা মিটমিট করেও তাকাতে পারছে না। হঠাৎ গলাফাটা এক আওয়াজে ওদের কানে প্রায় তালালাগার মতো অবস্থা !

www.pathagar.com

এক, দুই, তিন হ, এইবার হগ্‌গলে খোলেন চক্ষু! খোলেন, খোলেন কইলাম!

মিল্টনরা সবাই চোখ মেলল। মেলে দেখে... আরে একি ! সবার সামনে এক একটি পিরিচ, আর পিরিচে রয়েছে সুজি আর গরম-গরম লুচি!

খা! বসে থাকিসনে! তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নে তোরা। দাদাজানের গম্ভীর কণ্ঠের হুমকি শুনে সবুজরা তো থ! ওরা খেয়ে দেয়ে উঠে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, ধমকে উঠলেন দাদাজান, এ্যাই ছোঁড়ারা, চাঁদা নিয়ে গেলিনে?

ওই যাঃ ! খেতে খেতে ওরা চাঁদার কথা একদম ভুলেই গিয়েছিল ! এবার নির্ভয়ে চাঁদার খাতাটা এগিয়ে দেয় তুষার।

দাদাজান তাতে নিজের হাতে টাকার সংখ্যাটা লেখেন, এক শত পঁচাশি পয়সা। আর ধমকে ওঠেন দাঁত খিঁচিয়ে,

পনেরো পয়সা কিছুতেই পাবিনে তোরা। পনেরো পয়সা খুব কম দেখেছিস, না? পানিতে ভেসে এসেছে, খুবই সস্তা, তাই না? হাঁ কিছুতেই পাবিনে বলছি। তাতে কাঁদ আর মুখ কালো যাই কর না কেন, হুঁ! ছেলেরা একশ পঁচিশ পয়সা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল দাদাজানের বাড়ি থেকে। মুখ কালো তো দূরের কথা ওদের সবার সবকটি দাঁত বের হয়ে পড়েছে তখন।

যেতে যেতে চিৎকার করে ওরা।

...থ্রি চিয়ার্স ফর দাদাজান!

...হিপ্ হিপ্ হুররে!

...থ্রি চিয়ার্স ফর দাদাজান!

...হিপ্ হিপ্ হুররে!

www.pathagar.com

এমনটি সে চায় নি

তুষার থার্ড হয়ে ওপরের ক্লাসে উঠেছে। আব্বা-আম্মা তাকে একটা সুন্দর শার্ট উপহার দিয়েছেন। আর সে সাথে তার নাম করে কিনলেন একখানা চেয়ার। পড়ার টেবিলের খুব পুরানো পায়া জোড়া দেয়া চেয়ারটা সরিয়ে তাকে এটা দেয়া হলো। কিন্তু হলে কী হবে! বাসায় আনার সাথে সাথেই সেটা জাঁকিয়ে বসে আছে তুষারের ছোট ভাই হিমেল। তার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট। সবেমাত্র লেখাপড়ায় তার হাতেখড়ি হয়েছে।

সে চেয়ারে দু পা গুটিয়ে বসে বলে, এটা আমার চেয়ার। ভাইয়ার না। আমি এখানে বসব। বসে পড়ব। আমার অনেক পড়া!

শুনে আম্মা হাসেন। কিন্তু তুষারের হাসি পায় না। রাগ হয়! মনে মনে গজ গজ করে, ইঃ! তিনি চেয়ারে বসে পড়বেন! কী আমার পড়ুয়ারে!

আম্মা সেখান থেকে চলে গেলেই তুষার ধমকে ওঠে, এ্যাই ওঠ্! ওঠ্ চেয়ার থেকে! আমার পড়া আছে, অঙ্ক কষা আছে, ড্রইং আঁকা আছে!

হিমেল গ্যাট হয়ে চেয়ারে বসেই থাকে। আবার জিব বের করে মুখ ভেংচে বলে,

: থাকুকগে ওসব! এটা আমার চেয়ার ! আমি উঠব না।

: ইস ! তেনার চেয়ার! আব্বু বলল, থার্ড হয়েছি বলে আমার জন্য এটা এনেছে!

: আমিও থার্ড হবো!

হিমেলের ভঙ্গিটা গোঁয়ারের মতো। তুষারের তা সহ্য হয় না। কাছে এসে দেয় এক ধাক্কা!

: হবি তো হোগে! এখন তুই আমার চেয়ার ছাড়!

ধাক্কা খেয়ে হিমেল মেঝেতে পড়ে যায়। তেমন ব্যথা পায় নি। তবু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে।

: অ আম্মু, আম্মু গো! ভাইয়া আমাকে ধাক্কা মেরেছে! চেয়ার থেকে ফেলে দিয়েছে!

আম্মা ছুটে এলেন। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তুষারের দিকে তাকালেন।

: ছোট ভাই একটু শখ করে চেয়ারে বসেছে! কোথায় খুশি হবে, তা না-ভারি হিংসুটে তো তুই তুষার!

আম্মার বকুনি খেয়ে তুষারের রাগের মাত্রাটা আরো বেড়ে যায়। মুখে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে সে ফুঁসতে থাকে। এ্যাঃ ! ছোট ভাই হয়েছে বলে তার সব আহ্লাদ সহ্য করতে হবে! যখনই তাকে কিছু দেয়া হয়, হিমেল এসে আগে ভাগে তা দখল করে নেবে!

সেদিন আব্বা তার জন্য একটা র‍্যাকেট কিনে আনলেন, খপ করে সেটা নিয়ে নিল বাঁদরটা। খেলতে পারে না, তাও ফ্লাওয়ার আর র‍্যাকেট নিয়ে সে কী লাফালাফি! তাকে ধরতেই দেয় না! আরেক দিন তার জন্য রং ও তুলি আনলেন আব্বা। সে তখনই সেগুলো চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। আঁকতে তো পারে না গোড়ার ডিম! হিজিবিজি এঁকে শুধু শুধু কাগজগুলো নষ্ট করল! অথচ আব্বা বা আম্মা কিছুই বললেন না। তুষার কেড়ে নিতে গিয়েছিল। বাধা দিলেন আব্বা।

www.pathagar.com

: থাক না তুষার! ওর যা ইচ্ছে হয় আঁকুক না! তোকে না হয় আবার কিনে দেবো! বাঁদরটা তার নতুন শার্ট-প্যান্টগুলোও সব সময়ই কেড়ে নেবে। তার গায়ে সেগুলো 'ঢলর ঢলর' করবে, নিচের দিকে মাটিতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে। তাও ছাড়বে না! সে সেগুলো পরে সারা বাড়িতে চক্কর দেবে, ঢং করে আবার পাশের বাড়িতে দেখাতে যাবে! পোশাকগুলো যে ময়লা হচ্ছে, ভাঁজ ভেঙে যাচ্ছেতাই হচ্ছে, সেটা যেন কিছু না! আব্বা আম্মার শুধু ওই একই কথা ও না তোমার ছোট ভাই! ছোটভাইকে আদর করতে হয়। আদর না আরো কিছু করবে! আব্বা আম্মার আদরে আদরে ওটা একেবারে গোল্লায় যাচ্ছে!

পরদিন আবার ঠিক পড়ার সময় হিমেল এসে তার চেয়ার দখল করে বসল। অনেক পড়া শেখার আছে। কিন্তু হিমেল চেয়ার থেকে সরে না। অগত্যা সে গুম করে ভাইয়ের পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিল।

হিমেল চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, : অ আম্মা, আম্মাগো! ভাইয়া আমাকে কী ভীষণ মারছে! এ্যাঁ.... এ্যাঁ..... ।

আম্মা ছুটে এলেন। দু চোখে আগুন ঝরিয়ে ধমকে উঠলেন, : তোকে না কতবার বলেছি রোগা ছেলেটাকে কখনো মারবিনে, আর কাঁদাবিনে! তুষার সেদিন এক রকম পড়া না শিখেই, ভালভাবে না খেয়ে স্কুলে চলে গেল। পড়া না পারার জন্য ক্লাসে রীতিমতো শাস্তি পেতে হলো! ফলে মেজজাটা তার ভয়ানকভাবে খিঁচড়ে গেল। সে বলে চেষ্টা করছে ক্লাসের ফার্স্ট ও সেকেন্ড বয়কে কী করে ডিঙানো যায়! কিন্তু ডিঙ্গাবে কী করে?

কী করে হিমেলকে চেয়ার ছাড়া করা যায়, রীতিমতো তার এ একটা ভাবনা হয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল। ঠিক আছে! এভাবেই দুষ্টুটাকে শায়েস্তা করতে হবে! সে জানে, বেড়ালকে হিমেল ভীষণ ভয় পায়। একদিন ভুলে একটা বেড়ালের ঘাড়ে পা দিয়ে ফেলেছিল। ম্যায়াও করে গুঁড়িয়ে উঠেই বেড়ালটা হিমেলকে খামচে দিয়েছিল। এরপর থেকে বেড়াল দেখলে সে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। তাই তাদের বাসার ত্রিসীমানায় বেড়াল আসতে দেয়া হয় না।

সেদিন ঠিক সন্ধ্যার পর। আম্মা পাশের বাসায় বেড়াতে গেছেন। কাজের মেয়ে সাকেরা হিমেলকে নিয়ে বাইরে থেকে ফিরেছে। প্রায় প্রতিদিনের মতো আজ সন্ধ্যাতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। তুষার ঠিক জানে এখন সাকেরা হিমেলকে তার পড়ার ঘরে বসিয়ে রেখে হ্যারিকেন জ্বালাতে যাবে। ঠিক তাই! সাকেরা বলে, যাও ভাই, বড় ভাইয়ের কাছে বসগা। আমি বাত্তি জ্বালাইয়া আনি।

স্বাভাবিক নিয়মেই হিমেল চেয়ারের দিকে ছুটে যায়। সাথে সাথেই সে কী ভীষণ চিৎকার!

: অ ভাইয়া! বেড়াল! চেয়ারে একটা বেড়াল বসে আছে! তুষার তাড়াতাড়ি গিয়ে ভীত ভাইকে জড়িয়ে ধরে । বলে, চেয়ারটাতে বেড়াল বসেছে? তাহলে তুমি আর কোনোদিন ওই চেয়ারে বসো না। ক্যামন?

: আর বসব না! কোনোদিনও না! হিমেল স্বর ভয়ে কাঁপছে।

সাকেরা চেয়ারের দিকে তাকায়। কই? বিড়াল কই? নাই তো!

তুষারের কথায় হিমেল তাকে জোরে আঁকড়ে ধরে। তাহলে ভূত ! বেড়াল-ভূত!

: দূর ভূত বলে কিছু নেই। সব মনের ভুল, বলেনি আব্বু? তুষার ছোট ভাইয়ের ভয় দূর করতে চেষ্টা করে, আর ভাবে ঠিক বুদ্ধিই বের করেছি! আর আসবে এই চেয়ারে বসতে ? হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে!

www.pathagar.com

পরদিন শুক্রবার! স্কুল ছুটি। তুষার একটু দেরিতে ঘুম থেকে উঠেই পাশের ঘরে তার নতুন চেয়ারটার দিকে তাকালো। না, আজ আর হিমেল ওটা দখল করে জাঁকিয়ে বসে নেই। গতরাতের বুদ্ধিটা তাহলে খুবই কাজে লেগেছে!

বারান্দায় এসে দেখে এই সাত সকালে তাদের ডাক্তার মামা এসে হাজির। কী ব্যাপার?

আম্মা তাকে ডেকে এনেছেন। গতরাত থেকেই হিমেলের ভীষণ জ্বর! শুনে তুষারের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখে তার ছোট ভাইটা জ্বরে কাতরাচ্ছে। আম্মা কপালে জলপট্টি দিচ্ছেন।

: ওর জ্বর হয়েছে আম্মু?

: হ্যাঁ, সাকেরা বলছিল গতরাতে অন্ধকারে ও নাকি তোর চেয়ারে বসা একটা বেড়ালের গায়ে হাত দিয়ে ফেলেছিল। তাতে ভীষণ ভয় পেয়েছে! রাতে ঘুমের ঘোরে বেড়াল, বেড়াল করে কয়েকবারই চেঁচিয়ে উঠেছে। তুষারের বুকটা ধক করে ওঠে।

তাদের ডাক্তার মামা ইতোমধ্যে হিমেলকে পরীক্ষা করলেন। বললেন, হ্যাঁ খুব বেশি রকম ভয় পাবার কারণেই হিমেলের এ অবস্থা। তিনি প্রেসক্রিপশান লিখে বললেন,

: তাড়াতাড়ি এ ওষুধ কটা কিনে আনাও বুবু! ঘাবড়িয়ো না। ইনশাআল্লাহ ভাল হয়ে যাবে!

ঘর থেকে বের হয়ে ফের ফিরলেন। : বুবু, ওকে কিন্তু এখন একলা ঘরে রেখো না! এ সময়ে আবারও ভয় পেলে অবস্থা কিন্তু আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে আস্তে আস্তে বেড়ালের ভয়টা দূর করতে হবে, বুঝলে?

তুষারের মুখের রং ততক্ষণে একেবারেই বদলে গেছে। ভীষণ পানসে দেখাচ্ছে। হায়, হায়! এ কী হয়ে গেল? এ রকমটি তো সে চায় নি! সে হিমেলকে ভয় দেখাবার জন্য লাইট নিভে যাবার সাথে সাথে সাথেই ড্রইংরুমের ফোমে একটা গদির চেয়ার খুলে চেয়ারে রেখে দিয়েছিল।

তুষার ভাইয়ের শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলায়। ওর দু চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। আম্মার নজরে ধরা পড়বার আগেই সে তা মুছে ফেলে। বলে,

: আম্মু, তুমি তোমার কাজে যাও! আমি হিমেলের কাছে আছি।

সারাদিন ও রাতের অনেক্ষণ পর্যন্ত তুষার ছোট ভাইয়ের সেবা করেছে। হিমেলের জ্বর সেরে গেল। তুষার ভাইয়ের কপালে হাত বুলিয়ে, অত্যন্ত সঙ্কোচের সাথে বলে,

: তোমার এ ভাইয়াটা না খুব খারাপ!

: কেন? খারাপ কেন? তুমি তো কততো ভাল! আমাকে কততো আদর করো!

: করি! কিন্তু সেদিন আমি একটা খুবই খারপ কাজ করেছিলাম ভাইয়া!

হিমেল অবিশ্বাসী দুটি চোখ তুলে বলে, দূর!

: হ্যাঁ ভাইয়া, আমি খুব খারাপ! অনুতাপে ও ব্যথায় তুষারের স্মরটা কেঁপে ওঠে।

: সেদিন সন্ধ্যায় লাইট অফ হয়ে গেলে আমিই তোমাকে ভয় দেখিয়েছিলাম!

ছোট্ট হিমেল ভাইয়ের কথা ঠিক ধরতে পারে না। বলে, সত্যি তুমি ভয় দেখিয়েছিলে? কেন? ভয় দেখিয়েছিলে কেন?

www.pathagar.com

: ভয় দেখিয়েছিলাম ওই চেয়ারটার জন্য। তুমি যে কেবল আমার চেয়ারটাতে বসতে চাও সেজন্য। যাতে আর না বস, তাই এই ফোমের গদিটার ওয়ার খুলে চেয়ারে রেখে দিয়েছিলাম। তুষার সেই গদিটা নিয়ে আসে।

: এই দেখ ভাইয়া, হাত দিয়ে দেখ! বেড়ালের গায়ের মত নরম না? এখন আর তোমার ভয় নেই তো?

হিমেল মাথা নাড়ে। না, আর ভয় নেই।

এ সময়ে আম্মা হিমেলকে ওষুধ খাওয়াতে ঢোকেন। তুষার নিজেই আম্মার কাছে সব কথা প্রকাশ করে। তারপর মাথা নিচু করে আম্মার পাশে এসে বসে।

: আম্মা, তুমি আমাকে শাস্তি দাও!

আম্মার কপালে অসন্তোষের চিহ্ন দেখা গেল। রুষ্ট মুখে বললেন, তুমি খুবই অন্যায় করেছ! তবে শাস্তি আর দিলাম না, কেননা, তুমি তোমার অন্যায় বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ ও নিজেই নিজের দোষ স্বীকার করেছ!

আম্মা চলে গেলে তুষার হিমেলকে ধরে এনে তার চেয়ারটাতে বসিয়ে দিল।

: আজ থেকে এ চেয়ারটাতে তুমি ইচ্ছেমতো বসবে! তোমাকে আমি এটা একেবারেই দিয়ে দিলাম।

www.pathagar.com

রিনি ও রানির কাহিনী

রিনি বেড়াল তার ফুটফুটে বাচ্চা দুটো নিয়ে ভারি খুশিতে আছে। তার ছোট্ট মনিব নাজু তার ও বাচ্চাদের খুবই যত্ন নিচ্ছে। গ্রিলের ঘেরা দেয়া বারান্দার এক কোণে একটা কাঠের বাক্সে খড় বিছিয়ে ওদের জন্যে চমৎকার বিছানা করে দিয়েছে। নাজু বাচ্চা দুটোর সুন্দর নামও রেখেছে তাদের মায়ের নামের সাথে মিলিয়ে চিনি ও গিনি।

আজ তাদের এক বাটি দুধ খাইয়ে নাজু স্কুলে চলে গেলে, রিনি একটু বাইরে গেল। ফিরে এসে ভীষণ ভাবে চমকে ওঠে!

অ বাবা! দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে ইয়া বড় একটা হুলো বেড়াল! কী সর্বনাশ! আর একটু দেরিতে এলেই শয়তান হুলোটা কোনো এক ফাঁকে ঢুকে পড়ত আর বাচ্চাগুলোকে কামড়ে ধরে পালিয়ে যেত! ওকে দেখে রিনির ভীষণ রাগ হলো। ফুঁসে উঠল সে।

হেথায় কেন দাঁড়িয়ে তুই ?
ওরে পাজি হুলো!
ভাগ্! সরে যা! নইলে তোকে
করে দেব নুলো।

হুলো বেড়ালও চটে ওঠে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে, ইঃ!

ক্ষমতা তোর আছে জানা,
ওরে বিড়াল মিনি,
ওস্তাদিটা রাখরে শিকোয়
তোরে আমি চিনি।

রিনির গলা এক ধাপ চড়েছে। সে চেঁচিয়ে বলল,

মিনি মিনি ডাকবি নেকো
নামটি আমার রিনি।
ভাল করেই জানিসরে তুই
মা ছিল মোর মিনি!

তা বটে! তা বটে! দেঁতো হাসি হেসে হুলো তার ভুল শুধরে নেয়।

বিশেষ একটা মতলব নিয়ে সে এসেছে। সেটা হলো বাচ্চাগুলোকে একটা একটা করে নিয়ে গিয়ে তারপর মেরে ফেলা। তাই ভণ্ডামি করে নরম সুরে বলল,

বাচ্চারা সব ভাল তো বোন,
আছে ওরা সুখে?
একটু ওদের দেখে আসি
তুলে নিয়ে বুকে!

www.pathagar.com

রিনি হুলো বেড়ালের মতলব বুঝে ফেলে। সে ভীষণ চটে গিয়ে তাকে তাড়া করে বলে,

ফন্দিটা তোর বুঝে গেছি
এক্ষণই যা চলে!
নইলে আমি মারব তোকে,
কানটি দেবো মলে!

হুলোও তখন রেগে গেছে। শুঁটকো রিনির তেজ দেখে তার ভীষণ রাগ হয়। সে রিনিকে আক্রমণ করতে যাবে, ঠিক এমনি সময়ে সে পাশের বাড়ির কুকুর জনিকে আসতে দেখল। সুযোগ বুঝে রিনি ভেতরে চলে যায়।

জনি হুলোকে তাড়া করতে যাবে, আর এমনি সময়ে নাজুর ছোট ভাই নিপু করল কী,
দোতলায় ওপর থেকে ওদের গায়ে পানি ছিটিয়ে দিল। উদ্দেশ্য মজা দেখা।

জনি খেঁক করে উঠল। ভাবল কালো হুলোটা তার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। তাই চটে ঘেউ ঘেউ করে বলল,

জল কেন তুই দিলি মোরে
ওরে বোকা গাধা?
আমি দিলাম? মিথ্যেবাদী।
তুই তো দিলি হাঁদা!

সাথে সাথেই ফুঁসে উঠে জবাব দেয় হুলো বেড়াল। হুলো ভেবেছে জনিই তার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে ঘেউ ঘেউ ঘ্যায়াও আর মিউমিউ মেয়াও শব্দ ওঠে।

এক সময় হুলো বেড়ালটা হয়রান হয়ে সটকে পড়ে। ওদিকে বাসার আমগাছের ডালে বসে একটা বানর সব লক্ষ্য করছে। সে কিছুদিন হলো এক সার্কাস পার্টির খাঁচা থেকে পালিয়ে এসেছে। এসে নাজুদের ছাদে, যে ছাদে উঠবার কোনো সিঁড়ি নেই, সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। রাত্রে সেখানে লুকিয়ে থাকে, দিনে বের হয়।

সে দেখল এ-তো ভারি মজার খেলা! পানি ছিটালে কুকুর ও বেড়াল দু জনেই চটে যায়।

পরদিন হুলোটা ফের নাজুদের বাসায় ঢুকল। জনিও সে সময়ে এসেছে। হুলো বেড়াল কুকুরের মতলবটা আঁচ করল। কুকুরও বেড়ালের মনের গোপন ইচ্ছেটা বুঝে ফেলল। ওরা দু জনেই সুযোগ খুঁজছে কী করে রিনির বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়।

এদিকে বাঁদরটা তার বাঁদরামোতে সারা পাড়া অস্থির করে তুলেছে। আমগাছের কচি আম এক এক কামড়া খেয়ে নিচে ফেলে দিচ্ছে। গাছের পেয়ারা, লিচু, বিশেষ করে আধাপাকা কলাগুলো সব শেষ। সবাই ত্যক্ত-বিরক্ত। ওটাকে ধরার চেষ্টাও চলছে, কিন্তু কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

রিনি তো ভয়েই আধমরা! তার কেবলি ভয়, সুযোগ পেলেই বাঁদরটা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যাবে। একদম গাছের মগডালে তুলে নিয়ে ওপর থেকেই ছুড়ে মারবে নিচে! যা দুষ্টু আর পাজি কিনা এই বানর জাতটা!

বাচ্চাগুলোর এর মধ্যে চোখ ফুটেছে। কাঠের বাক্স ছেড়ে এদিকে-ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে।

www.pathagar.com

রিনি সাবধান করে দেয়,

ওরে চিনি, ওরে গিনি,
এদিকে আয় শোন্!
বাইরে তোরা কক্‌খনোরে
যাবিনে দুই বোন!

চিনি আধো আধো স্বরে বলে,

কেন মোদের বারণ কর,
বলতে হবে খুলে,
নইলে হঠাৎ চলেই যাব
হয়ত বা কোন ভুলে।

রিনি বাচ্চাদের কাছে টেনে বলে,

শোন্ রে মানিক লক্ষ্মী সোনা,
যাসনে কোথাও তোরা,
কুকুর, বানর, হুলোও আছে,
কামড়ে দেবে ওরা!

গিনি মিউমিউ করে বলে,

কুকুরটাকে হয় মা মনে
পাজির পা ঝাড়া।
হুলো বেড়াল সেটাও যেন
একটু আরো বাড়া!
কিন্তু বানর, ওকে আমার
ভালই মনে হয়,
জানালা দিয়ে নীরব চোখে
এদিকে চেয়ে রয়!

গিনির কথা শুনে রিনির বুক কেঁপে ওঠে। সর্বনাশ! বানরটারও নজর এদিকে পড়েছে! জানালার কাছে চলে আসে! চিনিও তখন কলকল করে বলছে,

শুধু কি তাই? মাঝে মাঝে
খাবার ছুড়ে মারে!
সত্যি মাগো বলছি শোনো,
ভাল লাগে তারে!

শুনে রিনি ভয়ানক চটে যায়। উঠে এসে দু মেয়ের গালে ঠাসাঠাস করে চড় বসিয়ে দিয়ে বলল,

খুব বলছ বুদ্ধুরা সব
বাঁদরটারে ভাল।
দেখার ভাল বাহির থেকে,
ভেতরটা তার কালো।

বাচ্চাদের মারার পরেই কিন্তু তাদের কাছে টেনে নিল রিনি। আদর করল, অনেক অনেক উপদেশ দিল, বাইরে যেতে মানা করল বারবার। ওদের সাবধান করে রিনি বাইরে এসে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে কুকুর ও হুলো বেড়ালের মধ্যে ফের ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। কুকুর বেড়ালের দিকে চোখ পাকিয়ে বলছে,

আজো দিলি আমার গায়ে
পানি ছিটিয়ে?

www.pathagar.com

আজকে তোকে করব সিধে
লেজ দে পিটিয়ে!
বেড়াল ঠোঁট বাঁকিয়ে জবাব দেয়,
লেজের বড়াই করিস নেকো
লেজ যে তোর বাঁকা,
গালটি ভরা বুলিই শুধু,
ভেতরে সব ফাঁকা!
যাক সে কথা, বলরে পাজি,
জল ছিটালি কেন?
তোদের মতো দুষ্টু গাধা
কেউ দেখে নি হেন!

এসব কথা শোনার পর কুকুর কি আর জবাব না দিয়ে পারে? সে খাপ্পা হয়ে বলে,

বললি কিরে মেনি বেড়াল
মিউ মিউ মিউ করে,
আজকে তোরে করব সাবাড়,
রাখব না জান ধড়ে!

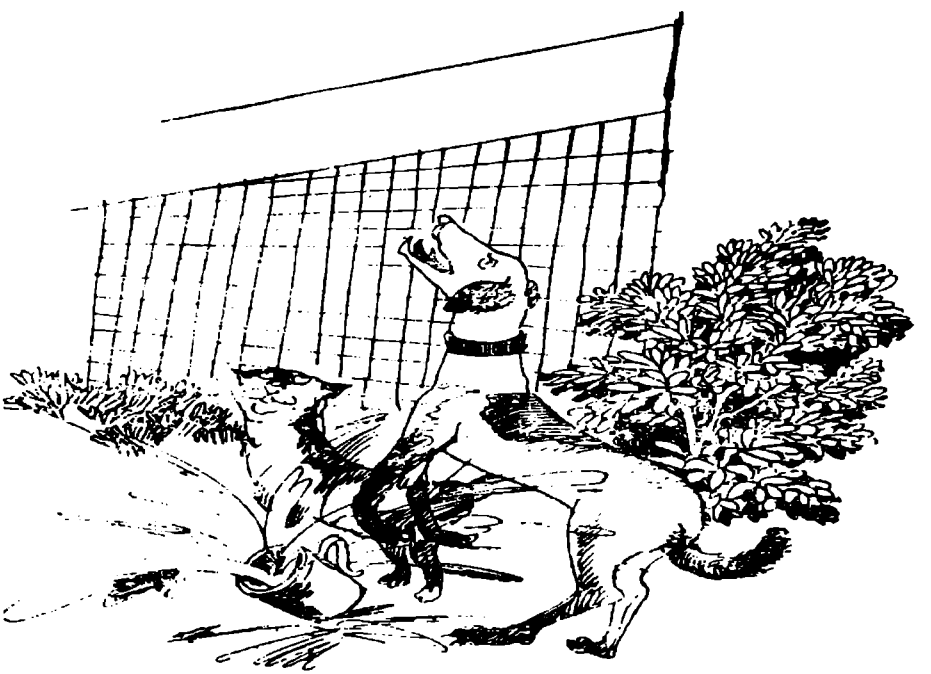

ওরা দু জন ভীষণভাবে ঝগড়া করছে। দু জনেরই গলার স্বর বাড়ছে তো বাড়ছেই। একজন আরেকজনকে আক্রমণ করতে চাচ্ছে। আর ওদিকে গাছের ডালে বসে বানরটা মজা দেখছে আর ফিকফিক করে হাসছে। তার হাতে ধরা একটা মগ।

নিতুকে সে এই মগ দিয়েই পানি ছিটাতে দেখেছিল। এক সুযোগে সে বাথরুম থেকে পানি ভরে মগটা নিয়ে এসেছে।

..... দু জনেরই ঘাড়ের কাছে মগটা এসে পড়লো ঠকাস করে।

www.pathagar.com

ওরে বাবারে, ভূত নাকিরে,
মগের বেশে এসে,
থাবড়া মেরে ধ্যাবরা করে
জানটা নেবে শেষে!

এই বলে কুকুরটা দিল এক লম্বা ছুট!
তাই তো রে-ভাই,
পালাই পালাই,
এ কি বিপদ এল!
ভূত না হলে
পেতনি হবে,
জানটা বুঝি গেল!
বলে হুলোও দেয় চম্পট!

আর ওপরে বসে বানর হেসে কুটিকুটি! হাসতে হাসতে একটু নিচের ডালে নেমে এল বানরটা। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বেড়াল-ছানা দুটো কী সুন্দর খেলা করছে! ওর খুব ইচ্ছে হয়, ওদের কোলে তুলে নিয়ে একটু আদর করতে।

তার অতীতের কথা মনে পড়ে যায়। হায়রে! কোথায় ছিল সে, আর কোথায় এসে পড়ল! কী সুন্দর ছিল ওই মধুপুরের ঘন বন! দল বেঁধে ওরা থাকত । মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী ও ছোট্ট সোনা-মানিক খোকনকে নিয়ে। ওদের কথা মনে হলে দুঃখে তার বুকটা ফেটে যেতে চায়। তার খোকন ছিল ভারি চঞ্চল! কেবলি এদিকে চলে যেত, আর সে তাকে খুঁজে খুঁজে বের করে আনত।

এমনি হয়েছে একদিন। বাচ্চাটাকে খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ মানুষের পাতা একটা ফাঁদে পড়ে গেল সে। লোকগুলো ছিল সার্কাস পার্টির। ধরা পড়ে সে তাদের খামচে ও কামড়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা তার সারা শরীর মোটা চট দিয়ে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছিল।

বাঁধা অবস্থায় সে তার ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কেঁদেছিল। কিন্তু কী যে নিষ্ঠুর ছিল ওরা! কেউ ওর দুঃখ বুঝল না। সার্কাস পার্টির তাঁবুতে এনে লোহার একটা খাঁচায় ভরল তাকে। তারপর শুরু করল তাকে ট্রেনিং দেয়া। দড়ির ওপর দিয়ে নানান রকম খেলা দেখাতে হবে।

...একটু এদিক-ওদিক হলেই কী ভীষণভাবে মারত যে ওরা ! সার্কাসের লোকেরা ওকে সুন্দর একটা নাম দিয়েছিল- রানি। কিন্তু ওখানে রানির মোটেই ভাল লাগছিল না। একদিন সুযোগ বুঝে পালিয়ে এসেছে। এসেও শান্তি নেই। গাছের নিচ থেকে এ ঢিল ছোড়ে, ও বাঁশ দিয়ে খোঁচায়। কেউ বা ধরতে চেষ্টা করে। তবুও এখন হাত পা খোলা! খোলা-মেলা জগৎ—এই যা!

এ বাসা থেকে অন্য কোথাও চলে যাবে ভাবছিল। কিন্তু পারছে না। বেড়ালের বাচ্চা দুটোর ওপর তার দূর থেকেই মায়া জন্মে গেছে। কাছে গিয়ে ওদের কোলে নিতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু ঘেরা দেয়া বারান্দায় ঢুকতে সাহসে কুলায় না। ফের যদি বন্দি হতে হয়!

তবু একদিন সাহস করে সেখানে ঢুকেই পড়ল। তাড়াতাড়ি একটা বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল। একটু আদর করেই চলে যাবে। আর তক্ষুনি পড়বি তো পড় , একেবারে ওদের মায়ের সামনে। বানরের কোলে বাচ্চা দেখে ভয়ে রিনি আঁতকে ওঠে। মনে মনে বলে,

হায়রে কপাল! বিপদ কত
আছে হুলো, জনি,
তার ওপরে জুটল এসে
বাঁদর একটা শনি।

এই বানরটাকে রিনি সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, সবচেয়ে বেশি সন্দেহের চোখে দেখে!

www.pathagar.com

যদিও রিনি খুবই ঘাবড়ে গেছে, কিন্তু মনে সাহস যোগাড় করে দাঁত খিঁচিয়ে বানরটাকে দিল প্রচণ্ড এক ধমক। ধমক খাওয়ার আগেই বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে রেখেছে রানি।

রিনি রানিকে রীতিমতো ধাওয়া করল। কী আর করবে রানি! ছুটে পালিয়ে গেল। সে যে বাচ্চাদের কোনো ক্ষতি করবে না, শুধু আদর করতে চায়, তা তো বুঝতে পারছে না ওদের মা। কোনো কিছু বলবারও সে সুযোগ দিচ্ছে না!

পরদিন খুব সকাল বেলা। রানি ছাদ থেকে বেরিয়ে, লাফ দিয়ে সবে মাত্র একটা উঁচু ডালে বসেছে, নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় রিনি কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে বাড়ির চারপাশে কী যেন খুঁজছে। পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে, ঘুরছে, আর করুণ ভাবে মিউমিউ শব্দে বিলাপ করছে,

কোথায় গেলি সোনা মণি
মানিক আমার ওরে!
বাঁদ্‌রীটা কি চুরি করে
নিয়েই গেল তোরে?

রিনির জন্যে রানির খুব দুঃখ হয়। মনে পড়ে, তার নিজের খোকনকে ছেড়ে এসে তার কী ভীষণ কষ্ট হয়েছিল! এখনো হয়। আপন মনে সে বলে,

বাচ্চাটাকে গেছে নিয়ে
হুলো কিংবা জনি,
হায়রে মায়ের কান্না দ্যাখ,
হারিয়ে চোখের মণি!

রানি বুঝতে পারে রিনি তার ওপর ভুল ধারণা করেছে। কিন্তু ঠিক এসময়ে আর রিনির ভুল ভাঙাবার সময় নেই। আগে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করা দরকার ! তারপর হবে ভুল ভাঙা-ভাঙির কথা।

রানি লাফিয়ে লাফিয়ে গাছের একেবারে মাথার–সবচেয়ে উঁচু ডালে উঠে চারদিকে তাকাতে থাকে। দেখতে চেষ্টা করে কেউ বাচ্চাটাকে নিয়ে পালাচ্ছে কিনা।

....আরে! ওই তো! বড় রাস্তার ওপর দিয়ে একটা কুকুর... হ্যাঁ জনিই, বাচ্চাটার ঘাড় কামড়ে ধরে পালিয়ে যাচ্ছে। রানি সাথে সাথেই মন ঠিক করে ফেলল। সে আপন মনে বলে,

ওই যে চলে যাচ্ছে জনি,
মুখে রিনির খুকি,
এক্ষণই যে ছুটতে হবে
নিয়ে প্রাণের ঝুঁকি।

রানি গাছের উঁচু ডাল থেকে লাফিয়ে একটা নিচের ডালে নামল। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ল এক বাড়ির ছাদে। ছাদের কার্নিশে লেগে হাঁটুতে চোট পেল সে। কিন্তু কোনো দিকে খেয়াল নেই তার। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সে পথে নামল। হঠাৎ রাস্তায় একটা বানর দেখে লোকজনেরা চেঁচিয়ে ওঠে-আরে! বানর! বানর!

রানি ততক্ষণে জনির একদম কাছে চলে এসে তার মাথায় লাগালো জোরসে এক থাপ্পড়।

হঠাৎ থাপ্পড় খেয়ে বোকা বনে যায় জনি।

ওর মুখ থেকে রিনির বাচ্চাটা মাটিতে পড়ে যায়। চিলের মতো ছোঁ মেরে রানি বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে এক লাফে উঠে এল রাস্তার ধারের এক দেয়ালের ওপর। জনি খুব খাপ্পা হয়ে ঘেউ, ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। অনেক গালিগালাজ করে।

মুখের গ্রাসটা কেড়ে নিলি
ওরে বাঁদ্‌রী ছুঁচি;
একদিন তার শোধটা নেব,
বুঝবি তখন বুঁচি।

www.pathagar.com

দূর থেকে রানিও চোখ পাকিয়ে বলল,

মুখ সামলে বলিস কথা,
ওরে অধম পাজি,
করতে কিছুই পারবি নেকো
রাখতে পারি বাজি।

ঝগড়া করার সময় নেই। রানি ফের লাফিয়ে লাফিয়ে এ বাড়ির ছাদ, ও বাড়ির দেয়াল, দোকান-পাট, গাছপালা, একের পর এক সব ডিঙিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছল নাজুদের বাসায়। বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে শক্ত করে সে ধরে রেখেছে।

নাজুদের তখনো ঘুম ভাঙে নি। ছোকরা চাকর দরজা খুলে বাইরে গিয়েছিল, এই ফাঁকে রানি বারান্দায় ঢুকে পড়ল। বেড়াল মা রিনি তখন বাক্সটার কাছে বসে মিউমিউ করে বিলাপ করছে।

হায়রে আমার মা-মণিরে,
এমনি করে মলি,
নিঠুর বানর শয়তানটা
তারি শিকার হলি?

ঠিক এমনি সময়ে পেছন থেকে এসে রানি রিনির বাচ্চাটাকে তার সামনে নামিয়ে রেখে বলল,

কান্নাকাটি রেখে এবার
বাচ্চাটাকে দেখ,
জনি নিয়ে পালাচ্ছিল,
সাবধানেতে রেখো!

হঠাৎ গিনিকে ফিরে পেয়ে বেড়াল-মায়ের সে কী আনন্দ! বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে সে রানির দিকে ফিরে আনন্দে কেঁদে ফেলল। বলল,

কীভাবে আজ কৃতজ্ঞতা
করবো প্রকাশ বোন,
জনতাম না এত উদার
মহৎ তোমার মন।

রানি জানালো ছোট্ট গিনি সোনাকে যে সে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে, এটা তার খুবই সুখের কথা! গিনি ও চিনিকে বাস্তবিকই সে ভীষণ ভালবাসে। বলল,

এখন থেকে আমায় তুমি
জেনো বন্ধু বলে,
মাঝে মাঝে বাচ্চাদেরে
দিও নিতে কোলে।

রিনি গদগদ কণ্ঠে বলল,

কোলে নেবে, কাঁখে নেবে,
যখন যা মন চায়,
বন্ধু বলে জানছি তোমায়
সন্দেহ নেই তায়।

এর পর থেকে রিনি ও রানির মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল, আর কুকুরটা হলো ওদের পরম শত্রু।

www.pathagar.com

ব্রোকেডের জামা

— জানো,আমার এই ফ্রকটা না, হংকংয়ের দর্জির তৈরি। খুব সুন্দর, না? এই যে দেখছ, এই যে ভীষণ ফোলা ফোলা কুঁচি, একে বলে পাফ্‌ফ্রিল, বুঝেছ?

রোজী তার বন্ধুদের চোখে প্রশংসামাখা দৃষ্টি দেখে খুবই গর্ব অনুভব করে।

রোজী এ স্কুলে নূতন ভর্তি হয়েছে। তার নিত্যনতুন ডিজাইনের দামি ফ্রক, কামিজ, কুর্তা, সালোয়ার তার নতুন বান্ধবীদের চমক লাগায়!

তাদের মনে অমন সুন্দর পোশাক পরবার ইচ্ছে জাগে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে উগ্র হয়ে ওঠে।

মিমি বলে, আমি আজই আম্মাকে বলব আমাকে অমনি একটা ফ্রক তৈরি করে দিতে। হ্যাঁ ভাই, তোমার ফ্রকটা আমাকে একটু দিও তো! আম্মা দেখে তৈরি করে দেবেন।

— তোমার আম্মা পারবেন এমনি বানাতে? সন্দেহ প্রকাশ করে রোজী।

— পারবেন না কেন? আম্মা তো আমার ও আমার ভাইবোনদের শার্ট-জামা নিজেই তৈরি করেন। তবে মুশকিল এই যে, আম্মা আবার সময়ই পান না। সারাদিন কেবল কাজ আর কাজ!

— আমি দর্জিকে দিয়েই বানাবো। রোকসানা তার ঝাঁকড়া চুলে ঢেউ তুলে বলে।

www.pathagar.com

— কী যেন বললে তোমার দর্জির ঠিকানাটা?

রোজী ঠিকানা বলে, রোকসানা তা খাতায় টুকে নেয়। ঠিকানা নিয়ে আক্ষেপ করে বলল রোকসানা, আম্মা কি সহজে দেবেন ভেবেছ? বলবেন, এই খরচ, ওই খরচ! থাক এখন! ঈদের সময় দেবোখন। তা আমি কি থাকতে দেবো নাকি? না দিলে যা কান্না শুরু করব কিনা! সবাই হেসে ওঠে।

রোকসানার বন্ধু আলেয়া বলে, আমিও দেখি মামিকে বলে। তা মামিই কি সহজে রাজি হবেন? মামিরও তো ওই একই রকম বকবকানি-এই খরচ-ওই খরচ!

রোজী মনে মনে বেশ একটু ফেঁপে ওঠে—তার গায়ের ফোলা কুঁচি দেয়া জামাটার মতো।

তার এসব খরচ-টরচ, ওজর-আপত্তির ব্যাপার নেই! নিত্যনতুন জামা, জুতা, মোজা আম্মা নিজেই কিনে দিচ্ছেন। সাজিয়েও দেন তার আম্মা নিজেই। সে বলল, আমার আম্মা এসব কিছুই বলেন না।

— ইস্, তোমার আম্মা কত ভাল! আক্ষেপ করে বলে মিমি। পরক্ষণে কী মনে করে বলে, আমার আম্মাও সাজিয়ে দিতেন, যদি তিনি সময় পেতেন। আম্মা সময়ই পান না!

এতক্ষণে তাদের খেয়াল হলো, বেঞ্চের একপাশে চুপ করে বসে আছে কচি। কচির জামাটা একেবারেই সাদাসিধে! কুঁচির লেশমাত্র নেই। রোজীর মতো নতুন ভর্তি হয়েছে সে।

কচির দিকে ফিরে বলল রোকসানা, তুমি তো কিছু বলছ না! রোজীর জামা তোমার পছন্দ হয় নি?

— খুব সুন্দর ওর জামা। শান্ত হাসি হেসে বলল কচি।

— তাহলে তুমিও একটা বানাও না কেন? নিজের ফ্রকের কুঁচিগুলো একবার গর্বের সাথে দেখে নিয়ে বলল রোজী।

— হ্যাঁ, বেশ হবে ! আমরা এক বেঞ্চে চারজন বসি, আমাদের সবার জামা একরকম হবে।

— চমৎকার হবে কিন্তু! ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দর জামা হবে—এই আমাদের বেঞ্চের চারজনের। খুশিতে ঝলমলিয়ে বলল রোজী।

— কিন্তু এবার কচির চোখের শান্ত হাসিটা নিভে যায়। বিব্রত বোধ করে কচি। বলে,

— কিন্তু তা হলে ভাই, আমাকে যে এ বেঞ্চ ছাড়তে হবে!

ক্ষুণ্ন হলো কচি। কেননা নতুন ভর্তি হয়েও সে ক্লাসের সেকেন্ড বেঞ্চে জায়গা পেয়েছে বলে মনে মনে খুশি হয়েছিল।

ক্লাসে বহু মেয়ে। এত মেয়ের মধ্যে পেছনের বেঞ্চে বসতে তার ভাল লাগে না। মেয়েরা সামান্য একটু গোলমাল করলে আর পড়া শোনা যায় না।

রোকসানা অবাক হয়ে বলল, কেন বেঞ্চ ছাড়বে কেন ভাই?

— আমি ও রকম সুন্দর জামা তৈরি করাতে পারব না।

— কেন পারবে না? তোমার আম্মাকে বলেই দেখ না!

কচির মুখের কাঁচা রোদের মতো সুন্দর হাসিটা মিলেয়ে গেছে। কুণ্ঠিত ভাবে সে সবার দিকে তাকিয়ে আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করল কচি,

— আমাকে-মানে আম্মার কাছে আমি কিছুতেই জামা চাইতে পারব না। তাই।

— কেন, কেন? চাইতেই মোটে পারবে না?

— তোমার আম্মা বুঝি দেবেন না?

— অনেকবার চাইলেও দেবে না?

— রাগ করে না খেয়ে থাকলেও না?

www.pathagar.com

মিনি-রোজীদের উচ্চ কণ্ঠের অনেকগুলো প্রশ্নের একটি সংক্ষিপ্ত মৃদু জবাব দেয় কচি, আমাদের যে বেশি টাকা নেই!

রোকসানাদের হতভম্ব মুখের ওপর ঢং ঢং ঢং করে টিফিন পিরিয়ড শেষ হলো।

এরপর ক টি মাস কেটে গেল।

রোজী নিত্য নতুন ডিজাইনের জামা পরে বাহবা ও প্রশংসা কুড়ায় মিমি, রোকসানাদের কাছ থেকে। এমন কি ক্লাসে পড়াশোনায় ভাল মেয়ে ফারজানা ও লাকী পর্যন্ত তাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে মনে হলো ।

এরি মধ্যে এল ষান্মাসিক পরীক্ষা। খেলা পণ্ডকারী দুষ্টু একটা ছেলের মতো। এসব পরীক্ষা-টরীক্ষা বড্ড বিচ্ছিরি! সব আনন্দ স্ফূর্তি নষ্ট করে দেয়। অন্তত রোজীর কাছে তাই মনে হলো।

ঝড়ো হাওয়ার মতো (যদিও বহুদিন আগে থেকেই সংকেত দেয়া ছিল) পরীক্ষাটা এল, আবার চলেও গেল।

আজ ফল বের হবে। ক্লাসে টিচার মাহবুবা আপা এলেন প্রথম পিরিয়ডে। সাথে কয়েক বাণ্ডিল খাতা। ওদের পরীক্ষার খাতা। ওদের ছ মাসের পড়া বা না পড়ার ফলাফল।

সবাই চুপচাপ। এমন কি বানরের সাথে পাল্লা দিয়ে যে দু চারজন মেয়ে ক্লাসে হট্টগোল আর শোরগোল করতে ওস্তাদ তারাও আজ দিব্যি শান্ত!

মাহবুবা আপা খাতার বাণ্ডিল খুলতে শুরু করেছেন, কে কী রকম লিখেছে, খাতা দেখে নাম ডেকে তা বলবেন তিনি।

কেমন যে আপা! না কি, ভুলত্রুটি তাতে ভালভাবে শোধরানো যাবে।

মিমির খাতা দেখে ধমকালেন আপা,

— দিন দিন তোমার উন্নতি হচ্ছে, তাই না? কীসব লিখেছ দেখতো খাতা খুলে!

রোকসানাকে বললেন, তোমার মনযোগ আজকাল কোন দিকে গেছে রোকসানা?

আলেয়াকে বলেন, তুমি তো আগে এমন লিখতে না আলেয়া!

নূতন মেয়ে রোজীকেও ছেড়ে দিলেন না আপা।

— এরকম পড়াশোনা করলে কিন্তু এখানে চলবে না রোজিনা।

জানতো এ স্কুলের নিয়ম! পর পর দু পরীক্ষাতে খারাপ করলে একদম টি সি দিয়ে দেয়া হয়।

এক একটা খাতা মেয়েদের ডেকে দিচ্ছিলেন মাহবুবা আপা, আর তাঁর মুখটা কুঁচকে যাচ্ছিল। একদম শেষের একটা খাতা বের করে খুশি হলেন তিনি। কুঞ্চিত মুখ মসৃণ হলো। খুশির হাসি হাসলেন।

— কিসমত আরা।

কচি উঠে দাঁড়ালো। খুশি খুশি চোখে আপা তাকালেন কচির দিকে। তারপর মিমিদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা সবাই একবার করে ওর খাতাগুলো দেখবে। কী সুন্দর যত্ন করে লিখেছে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর! বোঝা যায় খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করেছে কিসমত আরা। তোমারাও ওর মতো ভালভাবে পড়াশোনা করবে, বুঝলে?

সে দিন মাহবুবা আপার সেই পিরিয়ডে মেয়েরা দু জন দু জন করে কচির পরীক্ষার খাতাগুলো দেখল। দেখল আর প্রশংসায় ওদের চোখের তারা উজ্জ্বল হলো।

www.pathagar.com

টিফিনের সময় 'থ্রি-চিয়ার্স ফর কিসমত আরা!' বলে মেয়েরা খুব আনন্দ প্রকাশ করল। কচির সাফল্যে কয়েকজন আবার কিছু চিনেবাদাম ও মিষ্টি কিনে আনল। স্ফূর্তির মুহূর্তেগুলো ঘন করবার জন্য যারা গাইতে পারে তারা সবাই মিলে একটা কোরাস গাইল।

— হ্যারে কচি, তুই কতক্ষণ পড়িস রে?

— কখন উঠিস ঘুম থেকে?

— অমা! অত কম পড়লে হয়!

— অ, তাই বল! যখন পড়িস খুব মন দিয়ে পড়িস !

— কী বললি? তুই নিজেই পড়তে বসিস?

— আমি তো মা-বাবা তাগিদ না দিলে পড়তে বসি না কোনো দিনই। ইচ্ছে করে না ভাই!

— আমিও তাই। স্যার না এলে একা একা বসে পড়ব, এতো ভাবতেই পারি না কোনো দিন। আজ বুঝলাম, কচির মতো মন দিয়ে ক্লাসে আপাদের কথা শুনলে টিউটর ছাড়াও চলে।

কচিকে সবাই ডাকছে। কচিকে সবাই প্রশ্ন করছে। সবারই দৃষ্টি কচির দিকে। কচি যেন এই শ্রেণী-রাজ্যটির এক বিজয়িনী রানি।

আজ আর কেউ রোজী বেচারার দিকে তাকাচ্ছে না। বড়ই ম্লান হয়ে আছে রোজী। সে আজ পরে এসেছিল ব্রোকেডের একটা খুব সুন্দর জামা। খাস বিলাতের দরজির তৈরি। অনেক মেকিং চার্জ নিয়েছে জামাটার। কাপড়টাও খুব দামি। কিন্তু হলে কী হবে? আজ কেউ দেখছেই না রোজীকে। এমন কি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু মিমি, রোকসানা পর্যন্ত তার জামার প্রসঙ্গে একটা কথাও তুলল না। ওরাও মুখর হয়ে আছে কচিকে নিয়ে।

রোজী এবার নিজের পরীক্ষার খাতাগুলোর দিকে ভালভাবে তাকালো। ছিঃ! কী সব গোল্লাগাল্লিতে ভরতি! দূর। যা তা! ভারি লজ্জার কথা! এখন কী করবে রোজী? খাতাগুলো ফ্রকের আড়াল করে রাখবে, না ফ্রকের ফোলা কুঁচিগুলো আড়াল করবে খাতাগুলো দিয়ে?

www.pathagar.com

ডেভিডের বাবা

জুলি স্কুল থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সে একটি চলন্ত মালটানা গাড়ির কাছে এল। একজন লোক একটি চামচ বয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল। সেটি এত বড় ছিল যেন একটি বড় লম্বা হাতাওয়ালা কোদাল। অন্য একজন লোক একটি কাঁটা নিয়ে এল। সেটি এত বড় ছিল যেন একটি বড় খড় ইত্যাদি তুলবার লম্বা হাতাওয়ালা কাঁটা। তৃতীয় এক ব্যক্তি একটি ছুরি বয়ে নিয়ে এল। সেটি এত বড় ছিল যেন একটি লম্বা পতাকা দণ্ড।

'বাজে', বলল জুলি, 'এই লোকগুলো কারা আমি তা মোটেই জানতে চাই না'

সে বাড়ির দিকে সারাটা পথ ছুটে চলল এবং রাত্রের খাবারের সময় পর্যন্ত সে তার বিছানার নিচে লুকিয়ে রইল।

পরদিন জুলি লাফিয়ে লাফিয়ে আবারও স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। যেখানে একটা চলন্ত মালটানা গাড়ি ছিল। দেখা গেল সেখানে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। 'এই যে, আমার নাম ডেভিড। তুমি কি আমার সাথে খেলতে আসবে?' বলল ছেলেটি।

জুলি বেশ তীক্ষ্ণভাবে তার দিকে তাকালো। তার কাছে তাকে একজন সাধারণ ধরনের ছেলে বলেই মনে হলো। কাজেই সে খেলা করবার জন্য রয়ে গেল।

পাঁচটার সময় দূরের রাস্তার দিক থেকে কেউ একজন ডাকল, 'জুলি খেতে এস!' জুলি বলল, 'উনি আমার মা।'

এরপর কেউ একজন ডাকল, ডেভিড!!!'

'উনি আমার বাবা', বলল ডেভিড।

জুলি শূন্যে লাফিয়ে উঠে তিন চক্কর ঘুরে দৌড়ে বাড়িতে ছুটে গেল।

পরদিন জুলি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ি ফিরছিল এবং সে আবারও ডেভিডকে দেখল। ডেবিড বলল,'এই যে জুলি, তুমি কি আমার সাথে খেলতে আসবে?' জুলি তাকে খুবই সতর্কতার ডেভিড সাথে দেখতে থাকে। তার কাছে তাকে একজন সাধারণ ছেলে বলে মনে হয়। কাজেই সে খেলা করার জন্য রয়ে গেল।

যখন প্রায় ৫টা বাজল, ডেভিড বলল, 'জুলি অনুগ্রহ করে রাতের খাবারের জন্য আমাদের বাসায় থেকে যাও না!'

হঠাৎ জুলির ছুরি, বড় কাঁটা ও বড় চামচটার কথা মনে পড়ে গেল।

আমি জানি না, 'মনে মনে বলল জুলি,'হতে পারে এটা একটা খারাপ ধারণা। তবে আমি মনে করি ওরা খারাপ নাও হতে পারে।'

তবু সে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো 'বিদায়, বিদায়, বিদায় ডেভিড!'

ডেভিড আবারও বলল, 'জুলি তুমি খেয়ে যাও না!'

আমরা চিজবার্গার, চকোলেট, দুধ শেকস ও সালাদ খাবো।'

শুনে লাফ দিয়ে ওঠে জুলি,' ওহ! আমি চিজবার্গার ভীষণ পছন্দ করি! আমি থাকব, আমি থাকব!'

তারা রান্নাঘরে এল। সেখানে একটি ছোট টেবিলের ওপর চিজবার্গার, দুধ শেকস ও সালাদ ছিল। ঘরের অন্যদিকে ছিল একটি বিরাট টেবিল। তার ওপর কোদালের মতো বড় একটি চামচ, খড় তুলবার

www.pathagar.com

জন্য লম্বা হাতলযুক্ত বড় কাঁটার মতো একটি কাঁটা এবং নিশান টাঙাবার খুঁটির মতো বড় একটি ছুরি ছিল।

'ডেভিড', ফিসফিস করে বলল জুলি, 'ওখানে কে বসে?'

'অ', বলল ডেভিড, 'ওখানে আমার বাবা বসেন। ওই যে তিনি আসছেন! তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?'

ডেভিডের বাবা অদ্ভুত এক শব্দ করে এসে দরজা খুললেন। আসলে ডেভিডের বাবা ছিলেন একজন দৈত্য। তাঁর টেবিলে ২৬টি শামুক, ৩টি ভাজা অক্টোপাস এবং চকোলেট সস্ দিয়ে মোড়ানো ১৬টি ইট ছিল।

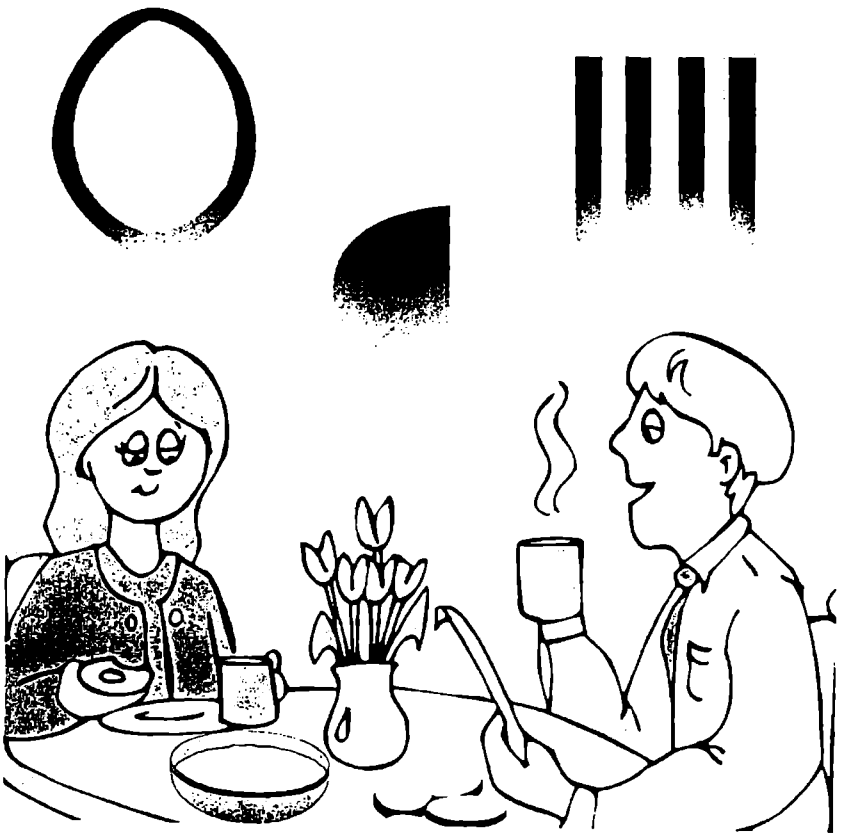

ডেভিড ও জুলি তাদের চিজবার্গার খেলো এবং বাবা খেলেন শামুক। ডেভিড ও জুলি তাদের দুধ শেকস্ পান করল, আর বাবা খেলেন অক্টোপাসগুলো। ডেভিড ও জুলি খেলো স্যালাড এবং বাবা খেলেন চকোলেট মোড়ানো ইট।

ডেভিডের বাবা জুলিকে জিজ্ঞেস করলেন যে সে একটি শামুক খাবে কি না, জুলি বলল, 'না।' ডেভিডের বাবা জুলিকে জিজ্ঞেস করলেন যে সে একটি অক্টোপাস খাবে কি না।

জুলি বলল, 'না।'

ডেভিডের বাবা জুলিকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে সুস্বাদু চকোলেট মোড়ানো ইট খাবে কি না।

www.pathagar.com

জুলি বলল, 'না।' তবে অনুগ্রহ করে আমাকে অন্য একটি দুধ- শেক্ দিতে পারেন?'

ডেভিডের বাবা তার জন্য অন্য একটি দুধ-শেক্ তৈরি করে দিলেন ।

যখন তাদের খাওয়া হয়ে গেল জুলি খুব মৃদুস্বরে বলল, যেন তার বাবা শুনতে না পারেন, 'ডেভিড তোমাকে তোমার বাবার মতো দেখতে লাগে না।'

'আসলে কি জানো, আমি তার পোষ্যপুত্র', বলল ডেভিড।

'তাই?' বলল জুলি, আচ্ছা ডেভিড, তুমি কি তোমার বাবাকে পছন্দ করো?'

'তিনি মহৎ', বলল ডেভিড , আমাদের সাথে রাস্তায় চলো, দেখবে তিনি কেমন!'

তারা রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। জুলি ও ডেভিড লাফিয়ে লাফিয়ে চলল এবং বাবা চলল ভম্, ভম্,ভম্-অদ্ভুত এক শব্দ করতে করতে।

ডেভিড ও জুলি একটা বড় রাস্তায় এল। তারা সেটা পার হতে পারছিল না। গাড়িগুলো ডেভিডের জন্য থামল না। গাড়িগুলো জুলির জন্যও থামল না।

বাবা হেঁটে রাস্তার মাঝাখানে গেলেন, গাড়িগুলোর দিকে তাকালেন এবং চিৎকার করে বললেন, 'থামো!'

মূলগল্প: রাবার্ট, এন, মাঞ্চ

গাড়িগুলো সব শূন্যে লাফিয়ে উঠল, বৃত্তাকারে তিনবার চক্কর দিল এবং এত জোরে রাস্তায় ফিরে গেল যে তাদের টায়ারগুলোর কথা ভুলে গেল।

জুলি ও ডেভিড রাস্তা পার হয়ে একটি দোকানে গেল। যে লোকটি দোকানে চালাচ্ছিল, সে বাচ্চাদের জিনিসপত্র যোগান দিতে চাইত না।

www.pathagar.com

তারা ৫ মিনিট, ১০ মিনিট, ১৫ মিনিট অপেক্ষা করল । দোকানি তাদের দিকে তাকাচ্ছে না।

এরপর ডেভিডের বাবা ভেতরে এলেন। তিনি দোকানির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই বাচ্চারা আমার বন্ধু!'

লোকটি শূন্যে লাফিয়ে উঠল, দোকানের চারদিকে তিনবার চক্কর দিল এবং ডেভিড ও জুলিকে ৩ বাক্স আইসক্রিম, ১১ ব্যাগ পটেটো চিপস এবং ১৯টি লাইফ সেভারস দিল, সব বিনা পয়সায়।

জুলি এবং ডেভিড রাস্তা দিয়ে হেঁটে একটি বাঁকের কাছে গেল। সেখানে ৮ম গ্রেডের ছয়জন বড় ছেলে পায়ে চলার পথের ওপর দাঁড়িয়েছিল। তারা ডেভিডের দিকে তাকালো। তারা জুলির দিকে তাকালো এবং খাবারের দিকে তাকালো। এরপর একজন বড় ছেলে তাদের কাছে এসে হঠাৎ জোর করে এক বাক্স আইসক্রিম নিয়ে নিল।

ডেভিডের বাবা সেই বাঁকের কাছে এলেন। তিনি বড় ছেলেদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলেন,

'মার এদের!'

শুনে ভয়ে ওরা দিল ছুট্!

লাফাতে গিয়ে তাদের শার্ট খুলে গেল, লাফাতে গিয়ে তাদের প্যান্ট খুলে গেল এবং তারা নিচে পরবার পোশাক পরে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল। জুলি তাদের পেছনে পেছনে ছুটল, কিন্তু সে পিছলে পড়ে গেল এবং তাঁর কনুইয়ে আঁচড় লাগল।

ডেভিডের বাবা তাকে তুলে নিয়ে ধরে রাখলেন। এরপর তিনি তার কনুইয়ের কাছে বিরাট একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন।

জুলি বলল, 'সত্যি, ডেভিড, সব কিছু নিয়ে তোমার বাবা একজন অতি চমৎকার লোক!

কিন্তু তাঁকে দেখলে এখনো কেমন ভয় ভয় লাগে।'

'তুমি কি মনে কর তিনি ভয়ঙ্কর?' হেসে বলল ডেভিড, 'তাহলে আমার দাদিকে দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর!'

www.pathagar.com

অহঙ্কারের পতন

এক বনের ভেতর একটা পুকুর ছিল। পুকুরের ধারে একটা গর্তে একটি মা-ব্যাঙ তার কয়েকটি বাচ্চা নিয়ে বাস করত। বাচ্চারা পুকুরে খেলা করত, আর তার আশেপাশেই শুধু ঘুরে বেড়াতো। মা তাদের কোথাও যেতে দিত না। তারা ছোট ছোট মাছ ও পোকা ধরে খেত, আর মায়ের কোল ঘেঁষে ঘুমাতো। যেহেতু তাদের বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হতো না, তারা জন্তু-জানোয়ারও বিশেষ দেখতে পেত না।

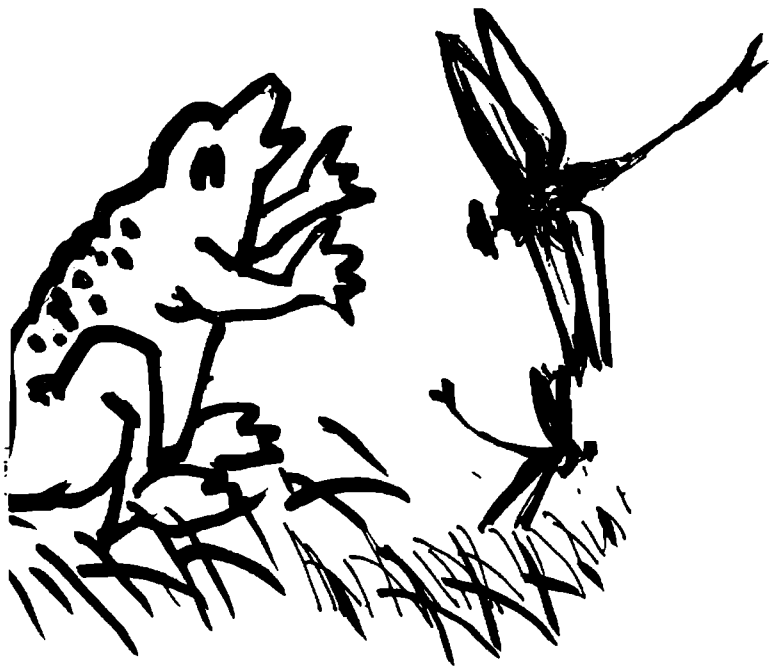

একদিন ব্যাঙের বাচ্চারা মাকে না জানিয়ে একটু সাহস করে তাদের ঘরের বাইরে এল। দেখে, সামনে একটা বিরাট গাছ! এমন চমৎকার ডালপালা মেলা গাছ তারা জীবনে দেখে নি। আর গাছের চারপাশে রয়েছে, ওহ্, কী সুন্দর সবুজ সতেজ ঘাসে ভরা ছড়ানো মাঠ। ও বাবা! মাঠের মধ্যে ওটা আবার কী! মস্ত বড় একটা জানোয়ার! জানোয়ারটা ঘাস খাচ্ছে। মজা করে খাচ্ছে!

ওটা যে ষাঁড় তা ওরা জানে না। দেখে ভয়ে ওদের বুক দুরুদুরু কাঁপতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে একজন বলে:

ও বাবারে! ওটা কিরে?
আছে দাঁড়িয়ে!
দেখতে পেলে আমাদের
দেবে মাড়িয়ে!

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়জন বলে:
পালাই, পালাই, ছুটে পালাই
চলরে ভেগে যাই,
মায়ের কাছে দেইগে খবর
এমন দেখি নাই!

ওরা পড়িমরি করে দে ছুট! ছুটতে... ছুটতে... ছুটতে বাসায় এসে সবাই মায়ের কোলে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

মা তখন তাদের জন্য পোকা-মাকড় ও ছোট মাছ গর্তের এক কোণে জড়ো করে রাখছিল। বাচ্চাদের অমন করে ছুটে আসতে দেখে সে ভীষণ ঘাবড়ে যায়। ভয় পেয়ে যায়।

কিন্তু বাচ্চাদের তা বুঝতে দেয় না। বলে,

কী হয়েছে? হয়েছে কী?
বল্ জলদি করে,
দেখছি তোরা ভীষণ ভয়ে
যাচ্ছিস যে মরে!
ওদের মধ্যে সেই বড়জন বলল:
বলব কিগো, অ মা-মণি
মস্ত দেহ তার,
এমন বড় জন্তু কভু
দেখি নি যে আর!

মা-ব্যাঙটি খুব অহঙ্কারী ছিল। কেননা সে ছিল তাদের পুকুরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাঙ।

www.pathagar.com

নিজের গণ্ডি ছেড়ে সে কোনো দিন দূরে কোথাও যায় নি। তাই সে মনে করত যে, তার চেয়ে বড় প্রাণী বুঝি পৃথিবীতে আর নেই। সে করল কী, মুখ দিয়ে শ্বাস টেনে নিজের শরীরটাকে ফুলাতে শুরু করে। ফুলাতে থাকে আর বলে:

এই যে আমি কত্তো বড়,
এর চে বড় নাকি?
কিংবা তোরা ভুল দেখেছিস,
সবই মিছে ফাঁকি!
দ্বিতীয় বাচ্চাটি বলল:
না, না, মা, ভুল নয়কো
নিজে গিয়ে দেখো!
সত্যি কথা বলছি সবাই
এইটা মনে রেখো।

মা-ব্যাঙ তার শরীরটাকে আরো ফুলাতে থাকে। ফুলাতে ফুলাতে সে ইয়া বড় একটা ঢোলের মতো হয়ে গেল! নিজের দিকে তাকিয়ে তার খুব গর্ব হলো। বাচ্চাদের বলল:

দেখরে আমায় এ্যাই বাছারা
দেখরে ভাল করে!
এর চে বড় কোনো কিছু
দেখিস নি তো ওরে!
বাচ্চারা আগের মতো সেই একই কথা বলে:
বলছি মাগো, ওই প্রাণীটি
তোমার চেয়েও বড়,
তুমিও মা দেখো নি কো
জন্তু অমন তরো।

মা-ব্যাঙ তাচ্ছিল্যের সাথে ঠোঁট বাঁকিয়ে শুধু হাসল। সে এবার খুব বেশি জোরে শ্বাস টেনে নিয়ে আরো ফুলতে থাকে। ফুলতে... ফুলতে... ফুলতে....ফুলতে এক সময়.... অ সর্বনাশ ! ফেটে গিয়ে একেবারে ফট্‌টাস্‌!...হায়, হায়, হায়রে! মরেই গেল মা-টা!! বাচ্চারা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। ঠ্যাং দিয়ে কপালে চাপড়ায় আর বলে:

হায়রে কপাল, এমনি তরো
কে জানত হবে,
এসে কি আর মা-মণিকে
খবর দিতাম তবে?
একজন বুড়ো ব্যাঙ ওদের সান্ত্বনা দিয়ে বলে:
কেঁদো নাকো সোনারা সব
কেঁদে কী আর হবে,
একটি কথা রেখো মনে
ভাল করেই সবে।
পৃথিবীটা বিরাট অনেক

www.pathagar.com

জীবও আছে বড়,
সব না জেনে কখনো যে
বড়াই নাহি করো।

এক বুড়ি ব্যাঙ মা-ব্যাঙের দুঃখে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। তারপর চোখ মুছে বাচ্চাদের কোলে টেনে নিল। নিয়ে দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে বলল:

অহঙ্কার কোনোদিন
মোটেই ভাল নয়,
অহঙ্কারীর চিরকাল
পতন হয়ই হয়।

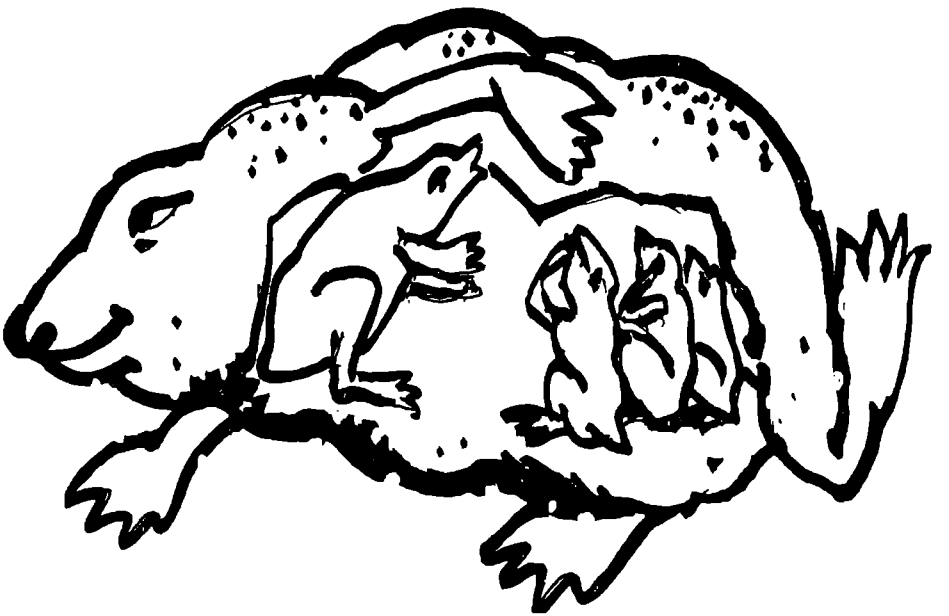

www.pathagar.com

পরীক্ষার হলে (রম্যগল্প)

পরীক্ষা দেয়াটা এত সহজ, এত চমৎকার, রীতিমতো একটা স্ফূর্তি ও মজার ব্যাপার তা ওরা আগে কখনো বোঝে নি। জানিস, চার বছর আগে আমার বড় ভাইয়া যখন এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছিল, আমিও একদিন গিয়েছিলাম তাঁর সাথে। কথা আরম্ভ করল মিলু, তখন কিন্তু পরীক্ষা দেয়াটা একটা বিচ্ছিরি, যাচ্ছে তাই ব্যাপার ছিল! আমার স্পষ্ট মনে আছে, ঢং, ঢং, ঢং, করে যেন বিকট এক ঢেঁড়া পিটানো হচ্ছিল, আর তাই শুনে কী বলব তোদের, যেন শুরু হয়ে গিয়েছিল একটা ফ্ল্যাট রেস। উলটো ভাবে ছুটে যাবার রেস। ছুট! ছুট! ছুট! পরীক্ষা যারা দেবে তারা ছুটল হলের ভেতর আর আমরা ছুটলাম হলের বাইরে গেটের দিকে।

মিলুর বন্ধুরা হাসি হাসি চোখে বলল, তারপর?

তারপর ঢং করে আর একটা মারাত্মক শব্দ হলো। মনে হলো বিরাট একটা বোমা ফুটল।

বাস, তারপর সব শেষ! কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাইরে থেকে আমার মনে হয়েছিল কেউ বুঝি মন্ত্র পড়ে ভাইয়াদের অজ্ঞান করে ফেলেছে। সেই অজ্ঞান ছেলেদের শুধু ডান হাত নড়ছে। কলম ধরা ডানহাত ! ওহ্ ! গা ছমছম করা রীতিমতো একটা ভূতুড়ে রাজ্যে ভাইয়াকে সেইদিন আমরা ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম। আর এখন? বলতে গিয়ে মিলুর বত্রিশ পাটি দাঁতের প্রত্যেকটা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে পড়ে; এখন তো বাজে বেল, আর সে সাথে শুরু হয় যত রকম মজার খেল!

আসরে একটি কচি কণ্ঠ এ সময়ে খিলখিলিয়ে ওঠে। সেদিকে নজর দেবার মত কারো সময় নেই।

সুমন বলে, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, আগে পরীক্ষার হলটা ছিল গোঁয়ার গার্ড সাহেবদের একচ্ছত্র রাজত্ব। আর এখন? এখন তা হলো একেবারে ফ্রি, অর্থাৎ মুক্ত এলাকা।

হ্যাঁ, এখানে এখন ইচ্ছেমতো ঘোরাঘুরি, বই ছোড়াছুড়ি, এমন কি দৌড়াদৌড়িও করতে পারা যায়।

বলল বিজন। তোরা খেয়াল করিস নি, সুজার পাশে বসে সব লিখে দিয়েছে তার বড় ভাই রেজা?

আরে ভাই তো ভাই, ববির বাবাকে দেখলাম বস্তা বস্তা বই সব বাক্স বোঝাই করে দিয়ে গেছে ববিকে। বাস্তবিক, বড্ড ভাল বাবা একজন!

কিন্তু.... গলার স্বর নামিয়ে বলল মিলু, আমার মা, বাবা, বড় ভাই কেউ ভাল না। ওঁরা আমাকে বলে দিলেন কী, যা পারবে নিজে লিখবে। টোকা টুকি করতে যাবে না।

কেন যাবো না শুনি? ভুরু বাঁকিয়ে বলে মিলু, আমি তো শুধু টুকেছি। নোট বইয়ের পাতা ছিঁড়ে বহু কষ্টে সৃষ্টে তা দেখে কেবল টুকেছি আর অন্যেরা যে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে টোকা আর টুকি দুটোই করেছে, তার কী?

মিলুর কণ্ঠের বিদ্রোহের রেশ উপস্থিত ওর অন্য বন্ধুদের মনেও নাড়া দেয়। মলয় বলে, আমার মা-ও অমনি ম্যাও ধরেছিলেন। পরীক্ষার হলে যাবার পথে পই পই করে বলা শুরু করলেন, সাবধান মলয়, অন্যেরা যে যাই করুক, তুই কিন্তু নকল করতে যাস নে!

হ্যাঁ, মা! মায়ের কথা তো আর ফেলা যায় না! তাই নিজের বিদ্যেই ফলাতে গিয়েছিলাম। ফল নিশ্চয় তাতে ফ্যালনা হতো না। বাংলার এক নম্বর প্রশ্নে জবাব লিখছি মনে হলো মুখস্থ করা পড়াগুলো মগজ থেকে মুষলধারে অর্থাৎ কিনা ভয়ানক বেগে খাতায় পড়ছে। হঠাৎ-হ্যাঁ, হঠাৎই হয়ে গেলাম একদম বেতাল! সব গেল তালগোল পাকিয়ে। কেননা, মুখ তুলে দেখি, আমার সামনে, পেছনে, ডানে ও বাঁয়ে আমারই বয়সী চারজন লম্বা চুলওয়ালা ছেলে দাঁড়িয়ে।

www.pathagar.com

তারা আমাকে গিরে ফেলেছে। না, না, আমাকে আক্রমণ করতে আসেনি! এসেছে আমাকে সাহায্য করতে। ওরা বুঝলি কিনা, ওরা সাহায্যকারী। খুব মহৎ ওরা, পরোপকারী।

তারপর? বন্ধুরা শ্বাস বন্ধ করে শোনে।

মলয় বলে, প্রত্যেকের হাতে নোট বইয়ের ছেঁড়া পাতা। একজন আমার খাতার দিকে তাকিয়ে বলল, এ্যাই বেগম রোকেয়ার সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে এত ভেবে কষ্ট করে লিখে, তোমার মূল্যবান জীবনটা নষ্ট করছ কেন? এই নাও ! এটা দেখে তাড়াতাড়ি লিখে ফ্যালো। নোট বইয়ের একটা ছেঁড়া পাতা সে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আর আমিও সেটা খপ করে ধরে ঝটপট সেটা কপি করে ফেললাম। মায়ের মানা মানলে কি আর ওদের হাত থেকে রেহাই পেতাম?

ফের শুরু করে মিলু, আব্বা, আম্মা ও ভাইয়ার আদেশ মতো হলের ভেতর বই নিয়ে যাই নি, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি, আরে বাপরে, বই, বই আর বই! বইয়ের তলায় ব্যাঙ চেপ্টা হয়ে প্রাণ বের হবার মতো অবস্থা! আর সেইসব বই বহনকারী দু জন বীরপুরুষ বুক ফুলিয়ে বসে আছে আমার বসবার সিটে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন বুঝলাম ওরা উঠবার জন্যে বসে নি, তখন আর বোবা হয়ে না থেকে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করলাম, ভাই, এখানে আমার সিট পড়েছে।

সিট! সিট কিহে? দু জনেই মুখে সিটি বাজাবার মতো শব্দ করে হাসল। হেসে বলল, তোমার মাথায় নিশ্চয়ই 'ছিট' আছে, নইলে এখানে আবার সিট খোঁজ করো তুমি? আমি ভ্যালভ্যাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার ভ্যাবলা দৃষ্টি দেখে ওরা ভরসা দিল, আরে ব্রাদার ভেবো না, কিস্‌সু ভেবো না তুমি! তুমি যেখানেই বসবে, সেটাই হবে তোমার সিট। বসে লেখবার জন্যে তো এবারকার প্রশ্নপত্র সেট করা হয়নি। তুমি যেখানে খুশি বসে, দাঁড়িয়ে কিংবা শুয়ে শুয়েও লিখতে পার। মোট কথা ঠেসে লিখে খাতাটা কেবল সাবমিট করতে পারলেই বুঝবে তোমার সার্থক হয়ে গেল পরীক্ষা দেয়া।

.....কী যে বুঝব, আর কী যে না বুঝব! চারদিকে তখন চিৎকার আর হৈ চৈ!

আ! থামতো তুই! বিরক্ত হয়ে বলে বিজন, শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার হলে তোর পোজটা কেমন হয়েছিল তাই শুধু আমরা শুনতে চাচ্ছি। আর কিছু না।

হ্যাঁ, শোন তাহলে! ঐ কোলাহলের মধ্যেই এক সময় মেঝেতে কোলাব্যাঙের মতো করে বসলাম। বসে কলম ধরলাম। কিন্তু বুঝতে পারি কলম চলাতো দূরের কথা, আমার রক্ত চলাচল তখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাইরের হৈ চৈ আর হল্লার শব্দ তখন হুড়মুড় করে আমার একেবারে মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে। পড়া যেটুকু মনের মধ্যে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম বুঝলাম মাথার ধারে কাছে তারা ঢুঁ মারবার সুযোগ পাচ্ছে না। কাজেই কী আর করি? ঝট করে উঠে চলে গেলাম বারান্দায়। ভাগ্যিস পড়ব বলে বইগুলো সাথে এনেছিলাম। ছেড়াৎ করে ছিড়ে নিলাম কয়েকটা পৃষ্ঠা। তারপর বাস! দেখলাম, দেখে ছড়ছড় করে তা ছড়িয়ে দিলাম খাতার ভেতরে।

আরে আমিও তো তাই করেছি! খুশি হয়ে বলে বিজন, একেবারে নোট বইয়ের প্রত্যেটি কথা হুবহু তুলে দিয়ে এসেছি। এমন কী "পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য', 'সারাংশ দেখ', ৩নং উত্তরের শেষাংশ দেখ", কোনো কথাই বাদ দিই নি। বুঝলি কিনা! নম্বর আমাকে আশির ওপর দিতেই হবে, মানে যাকে বলে চিঠির নম্বর।

আর অঙ্ক? সোল্লাসে বলে সুমন, এক দশমিকের যোগ করতেই আমার দশবার ভুল হতো। কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে আমি সব কটা অঙ্ক একেবারে শুদ্ধ করে দিলাম।

www.pathagar.com

করে দিলি? মানে নিজে করে দিলি? অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মলয়!

আহ, কী বোকার মতো প্রশ্ন করিস! নিজে করে এবারকার পরীক্ষার নিয়ম ভাঙব নাকি? আমাকে কেউ কোনোদিন আইন ভঙ্গকারী আপদ বলে অপবাদ দিয়েছে? না দেয় নি। তবে? তবে পরীক্ষার হলে গিয়ে আমি আইন ভাঙব একথা কী করে তুই ভাবতে পারলি? সে যাকগে! শোন, হলে গিয়ে দেখি সবাই একত্র হয়ে দেখে, মানে দেখাদেখি করে অঙ্ক করছে। তা আমি করলাম কী, সবার সাথে এক জোট হয়ে সব কটা দিলাম টুকে, একেবারে কপাল ও কলম দুটোই একসাথে ঠুকে। মনে হয় ঠকি নি মোটেই। মেলা নম্বর পেয়ে যাবো। ওই নামতায় যাকে ছয় নং ছিয়ানব্বনই, তাই পেয়ে যাবো এবার।

আমিও ইংরেজিতে ও রকম কী তার চেয়ে বেশি নম্বরই পাবো। বলল স্বপন।

কী করে? কী করে রে?

কী করে আবার? না দেখে লিখে!

না দেখে লিখে!

দু তিনটি কণ্ঠ যেন একসাথে আর্তনাদ করে ওঠে, সে কী। সবাই আমরা দেখে লিখলাম, আর তুই কিনা আমাদের বন্ধু হয়ে স্রেফ না দেখে লেখার মতো একটা বাজে কাজ করে ফেললি? নাহ, তোকে আমরা বয়কট করব!

আরে, কী বদখত বিচ্ছিরি কথা বলতে শুরু করেছিস? আমি কি কখনো সে রকম বাজে বয় হতে পারি, যাকে তোরা বয়কট করতে পারিস?

তবে যে তুই বললি না দেখে লিখেছিস?

হ্যাঁ, না দেখে লিখেছি। তবে না শুনে তো নয়। এবারকার পরীক্ষায় খসখস করে লিখে যাচ্ছিলাম আমি। ডিকটেশন দিতে দিতে দু তিনটি শব্দ বারবার মানে একটু পরে পরেই বলছিল সবুজ ভাই। হয়ত ও তিনটি শব্দের বাননই কিছুটা ভুল হতে পারে আমার।

সে শব্দ তিনটি কী শুনি?

সেগুলো হলো কমা, ফুলস্টপ ও সেমিকোলন।

বাদ দে, বাদ দে! কিছু যায় আসে না এতে। আশ্বাস দিয়ে বলে বিজন, তিন বানানে আর কত নম্বর কাটবে? তিনই তো ? বাকি সাতানব্বই নম্বর তো তোর কেটে দিতে পারবে না কেউ!

না, তা কক্ষনো পারবে না। মাথা নেড়ে বলল স্বপন, অবশ্য সে তিন নম্বরও যাতে না কাটতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। আমি করেছি কী বাংলাতেই অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষাতেই সেই কমা, সেমিকোলন ও ফুলস্টপ বানানগুলো লিখে দিয়ে এসেছি। জানিস তো আজকাল বাংলা ভাষার কদর কত বেশি! বিদেশী ওই অনেকগুলো ইংরেজি শব্দের চেয়ে বেশি। এই বাংলাতে লেখা তিনটি মাত্র শব্দের দাম হবে অনেক বেশি, ফলে হয়ত ইংরেজিতে একশ তিনই পেয়ে যাবো আমি।

এবার শোন, আমি কী করেছিলাম। ওস্তাদের মতো বলে কাফী।

হ্যাঁ, হ্যাঁ বল্! তুই কী করেছিলি?

কাফী দাঁত বের করে নীরবে হাসে। হেসে বলে, আমি কিন্তু কলম দিয়ে লিখতে যাই নি। কলম দিয়ে লিখতে যাসনি! তবে কী দিয়ে লিখেছিলি? পেন্সিলে?

www.pathagar.com

উহুঁ, কিসসু দিয়ে নয়। আমি লিখিই নি মোটেও। খামোখো লিখে কষ্ট করা কেন?

বারে, না লিখলে পরীক্ষায় পাস করবি কী করে?

সে কথাই তো বলছিলাম তোদের! হ্যাঁ শোন্ তাহলে, গলাটা পরিষ্কার করে বলে কাফী, আমি করেছি কী প্রথম থেকে শেষ অব্দি প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর, বই ও নোট বইয়ের পৃষ্ঠা কেটে, আঠা দিয়ে সেগুলো সুন্দর করে খাতায়, সেঁটে দিয়ে এসেছি।

ভূগোলের প্রথম প্রশ্নটা, সেই যে চিত্র সহকারে ঋতু পরিবর্তন, সে ছবিটা পর্যন্ত বই থেকে কেটে নিয়ে খাতায় লাগিয়ে দিলাম। অস্পষ্ট লেখা বা অসুন্দর লেখা বলে পরীক্ষকরা মোটেই প্যানপ্যান করবার সুযোগ পাবেন না। একেবারে ঝকঝকে সত্যিকারের ছাপার অক্ষর! হুঁ, নম্বর কাটার কায়দাটা অন্তত আমার খাতাতে খাটাতে পারবেন না তাঁরা। মনে হয়, বুঝলি কিনা ফার্স্ট সেকেন্ড একটা কিছু হয়েই যাবো এবার।

কাফীর যে এতটা বুদ্ধি আছে তা ওরা জানত না। আগে জানলে ওর কাছ থেকে বুদ্ধি ধার করে ওর মতোই পরীক্ষা দিয়ে আসত সবাই।

মিলুদের বাসার সামনে মাঠের একদিকে ছেলেদের এই বিকেলের আসর জমজমাট হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দেখা গেল ওদের মাঝে আরো একজন শরিক হয়েছে। সে আধা বয়সী মঈনুদ্দিন। মিলুদের মঈনু ভাই। বহুদিন থেকে মিলুদের বাসায় কাজ করে। মঈনুর হাতে একটা মিষ্টির হাঁড়ি।

কী ব্যাপার মঈনু ভাই? হাতে ওটা কী?

মলয় ও স্বপনের প্রশ্নের জবাবে মঈনু আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসল।

কী আর বেপার! আপনে গো যে বেপার, আমারো হেই বেপার।

ওহ হো, মঈনু ভাই যে এবার আমাদের মতোই পরীক্ষা দিয়েছে তা বোধ হয় তোরা জানতিস না? ওর সিট পড়েছিল অন্য সেন্টারে । মিলু ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলে।

তাই নাকি? তা কোনো দিন তো মঈনু ভাইকে পড়তে দেখি নি! এই প্রথম মুখ খুলল শিবলি। এতক্ষণ সে চুপ করে বসেছিল এক ধারে। পরীক্ষার হলে তালগোল পাকানো আর পাতা ছেঁড়াছেঁড়ির ব্যাপারগুলো তার পছন্দ হচ্ছিল না মোটেই।

তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল মঈনুদ্দীন, আইজকাইল আর পড়তে অয়না ভাইসাব, হে তো আপনেরা ভাল কইরাই জানেন। আমি যে কী কামে ছোটবেলায় কষ্ট কইরা কেলাস টু পর্যন্ত পড়ছিলাম এহন আপছোছ লাগে।

ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ে তুমি এস.এস.সি পরীক্ষা দিলে? অত্যন্ত বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে শিবলি। তাতে তুমি পাস করবে বলে মনে করো?

ক্যান করুম না? আমার খাতায় যে লেইখ্যা দিছে হেও নাকি বই দেইখ্যা লেইখ্যা ফাস ডিভিশন পাইছিল, লেডারও পাইছিল। আমারেও হেই ডিভিশন ও লেডার লইয়া দিব কইছে। হেই ফুর্তিতেই আপনেগো লাইগ্যা মিডাই কিন্যা আনছি। খান খান, আমার ফাসের খাওনডা আগে সাইর‍্যা লন। তারপরে আপনেগরটা তো আছেই।

মিষ্টির হাঁড়ির ঢাকনা সরিয়ে মঈনুদ্দীন তা সবার মধ্যে দেয়।

কী মজা! কী মজা! ছোট্ট একজনের হাততালিতে সবাই সে দিকে তাকালো। সে দিলু —মিলুর ছোট-ভাই। ক্লাস টুয়ে পড়ে। এই খুদে ছেলের উপস্থিতি কেউ খেয়ালই করে নি এতক্ষণ, অথচ প্রথম থেকেই সে এখানে আছে। দিলু হাততালি দিয়ে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আমিও তাহলে সামনের বছরই তোমাদের ওই পরীক্ষা দেবো। হ্যাঁ মিলু ভাই, তুমি আমার হয়ে লিখে দিও, ক্যামন?

www.pathagar.com

মিলু ও তার বন্ধুরা সবাই হেসে ওঠে। সেদিন হাসিখুশি ও মিষ্টি খাওয়ার পর ওদের আসর ভাঙে।

এর কিছুদিন পরই হলো দিলুর ষান্মাষিক পরীক্ষা। প্রথম দিন ছিল অঙ্ক পরীক্ষা।

পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরল দিলু। খুবই আনন্দিত ও হাসিখুসি দেখাচ্ছে দিলুকে। দিলু বাড়িতে এসেই তার মিলু ভাইয়ার খোঁজ করে ? মিলু ভাইয়াকে তার খুবই দরকার। পরীক্ষার হলে পাতা ছেঁড়ার মানে মজার ঘটনাটা মিলু ভাইয়াকে না বলা পর্যন্ত সে মোটেই শান্তি পাচ্ছে না। তা, পাতা ছেঁড়া এমন কী একটা কঠিন কাজ? একটা টান, আর ছ্যাড়াৎ করে একটা শব্দ এই যা। তবে হ্যাঁ, শব্দটা যেন জোরে না হয়। স্যারদের কানে না যায়।

স্যারেরা! মিলু ভাইয়াদের স্যারেরা চুপ করে থাকলে কী হবে? দিলুদের স্যারেরা অমনভাবে থাকেন না। বাব্বা! ছেলেরা একটু চোখাচোখি করলেই চুল টেনে দেন, আর কিনা হুঁঃ ! যা হোক এই ভয়ঙ্কর চোখালো স্যারদের চোখে ধুলো দিয়ে কেমন পাতাগুলো আজ ছিঁড়ে ফেলেছে দিলু। সে কথাটা বলবার জন্যেই তো মনটা চনমন করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর মিলু ভাই ফিরল বাইরে থেকে। তার কাছে সাঁ করে ছুটে গেল দিলু। কণ্ঠে তার উচ্ছ্বাস ঝরছে। এদিকে এস, এস মিলু ভাই! দেখে যাও! দেখে যাও তুমি!

কী দেখব রে ?

মিলু ছোট ভাইয়ের পেছনে পেছনে তাদের পড়ার ঘরে এল। দিলু হাসিমুখে তার স্কুলের ব্যাগটা তুলে ধরে।

হ্যাঁ আছে, এর মধ্যে আছে।

কী আছে, এর মধ্যে?

মিলুর কথার জবাব না দিয়ে বলে দিলু, জানো ভাইয়া, আমি না, আমিও পারি তোমাদের মতো।

কী পারিস আমাদের মতো?

পরীক্ষা হলে পাতা ছিঁড়তে পারি।

সে কী, ওইটুকুন পুঁচকে তুই, এততোটুকুন! তুইও গেলি পাতা ছিঁড়তে?

হ্যাঁ এ্যা। খুশিতে ছোট্ট মাথাটা দুলিয়ে বলে দিলু, ঠিক তোমাদের মতো! মিলু হতভম্ব হয়ে তার ছোট ভাইটির দিকে তাকিয়ে থাকে। দিলু ফিক করে হেসে ফেলে।

ভেবেছ বানিয়ে বানিয়ে বলছি আমি, না? এ্যাই দেখ, সব ক টা পাতাই আমি ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি। এক্কেবারে আমার নিজের হাতে, হ্যাঁ!

দিলু তার ব্যাগ থেকে কতকগুলো ছেঁড়া পাতা বের করে মিলুর সামনে তুলে ধরে।

একি রে! চমকে ওঠে মিলু! এগুলো তো দেখছি, তোর আজকের অঙ্ক পরীক্ষার পাতা!

হ্যাঁ, পরীক্ষার পাতা বলেই তো ছিঁড়েছি। এ্যাই দেখ না তুমি, সব কটা অঙ্ক করে তারপরই তো ছিঁড়লাম পাতাগুলো! ছিঁড়ে খালি খাতাটা স্যারকে দিয়ে অঙ্ক কষা পাতাগুলো লুকিয়ে নিয়ে এসেছি।

মিলুর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসে আর বলে, তোমরা সবাই পরীক্ষার হলে পাতা ছিঁড়ে নাও। নকল কর। আমি বুঝি পারি না? হ্যাঁ, আমি এবার নকল করতে পেরেছি। ক্যামন, পারি নি ভাইয়া?

দিলু গর্বের সাথে মাথা উঁচু করে তাকাতে থাকে, একবার মিলুর দিকে, আর একবার তার অঙ্ক কষা ছেঁড়া পাতাগুলোর দিকে। ওদিকে মিলুর মাথাটা তার নিজের অজান্তেই নুয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

লাল টিয়ে

বিশাল এক রাজ্য। নাম দৌলতপুর। সে রাজ্যের বাদশার ধনদৌলতের সীমা নেই। টাকা-কড়ি, সোনা-দানা, হীরে-জহরতে রাজ ভাণ্ডার একেবারে বোঝাই!

এত যে আছে বাদশার, কিন্তু গরিব দুঃখীদের একটি পয়সাও দান করেন না। শুধু তাই নয়, বাদশা খুব নিষ্ঠুর ও অত্যাচারীও।

তাঁর দুই মেয়ে। দু জনেই খুব রূপসী। বড় মেয়ের নাম লালমণি আর ছোট মেয়ের নাম নীলমণি। নীলমণির স্বভাব হয়েছে তার বাবার মতো। লালমণি ঠিক উলটো। তার মনটা বড়ই কোমল।

একদিন এক চাষী-প্রজা বাদশার কাছে একটা আবেদন নিয়ে এল।

সাধারণ নালিশ এলে বাদশা সেসব তাঁর মেয়েদের দিয়ে মীমাংসা করান।

চাষীকে তিনি তাঁর মেয়েদের কাছে পাঠালেন।

তাকে বাদশাজাদিদের দরবার-গৃহে আনা হলো।

সে তাদের কুর্নিশ করে, বড়জনের দিকে ফিরে বলল,

: সম্মানিতা শাহ্‌জাদি, আমি বড় আশা করে আপনাদের কাছে একটি আরজি নিয়ে এসেছি। গত তিন মাস ধরে আমি খুব অসুস্থ ছিলাম। তাতে আমার বহু পয়সা-কড়ি ব্যয় হয়ে গেছে। কিছু ধারও

www.pathagar.com

করেছি। ফলে জমির খাজনা দিতে পারছি না । আপনি আমাকে দয়া করে এ বছরের বাকি খাজনাটা সামনের বছরে দেবার অনুমতি দিলে খুবই বাধিত হবো।

শুনে লালমণি মিষ্টি হাসি হাসল ।

: অ, এই কথা? তুমি অসুস্থ ছিলে, তাই খাজনা দিতে পার নি। যাও, তোমার সে খাজনা আমি মাফ করে দিলাম।

চাষী দু হাত তুলে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানায়! হঠাৎ একটা ভয়ানক গর্জন শোনা যায়। নীলমণির গলার স্বর।

: না, ও সব মাফ-টাফ হবে না! যেভাবে পার, হালের বলদ বা জমি বিক্রি করে হলেও এ বছরের খাজনা এ বছরেই শোধ করতে হবে! এ আমাদের আব্বার হুকুম!

লালমণির মুখটা মলিন হয়ে যায়! বোনকে সে ভালভাবেই চেনে। সে তার নির্দেশের যে উলটো আদেশ দিয়েছে, তা না মানলে বেচারা চাষীর ওপর ভয়ানক অত্যাচার চলবে।

তাই সে নিজের কানের দামি দুলজোড়া খুলে চাষীর হাতে তুলে দিয়ে বলল,

: নাও, এ দুটো বিক্রি করে খাজনা শোধ করে দিও!

নীলমণির তাতেও ভীষণ আপত্তি। রেগে বলল,

: দেখ লালবু, তুমি বেশি ভালমানষি করতে যেও না! আব্বা এসব একটুও পছন্দ করেন না! তা জেনেও, তুমি সব সময় এ ধরনের অন্যায় করে চলেছ! গেল বছর পাশের গাঁয়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তুমি রাজকোষ থেকে বেশ কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের সাহায্য করেছিলে। এ বছর ঝড়ে কতকগুলো সাধারণ লোকের কুঁড়ে ঘর তুলে দিয়েছে! এ ধরনের আরো অনেক কাজ করে তুমি রাজভাণ্ডারের বহু অর্থ নষ্ট করেছ!

আব্বার কাছে এসব মহা অপরাধের কাজ! আমি এতদিন তাঁর কাছে এসব ব্যাপারে কিছুই বলি নি। আজ না বলে ছাড়ছিনে! নীলমণি ঝড়ের বেগে বাদশার কাছে ছুটে গেল। গিয়ে সব বলে দিল।

শুনে বাদশা তো রেগে আগুন!

: কী! মেয়ে আমার কথামত চলবে না, আমি যে ধরনের কাজ পছন্দ করি, তা করবে না, এ রকম মেয়েকে দিয়ে রাজকার্য চালানো তো দূরের কথা, একে রাজপুরীতে রাখাই বিপদ!

রাগে বাদশার মাথায় যেন আগুনের হলকা ছুটোছুটি করতে থাকে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে তিনি ভীষণ নিষ্ঠুর একটা আদেশ দিয়ে দিলেন।

: এ্যাই, কোথায় আমার রাজ প্রহরীরা! ওই দুর্বল মনা মেয়েটাকে তোমরা দেশের বাইরে রেখে এস! আমার রাজ্য পেরিয়ে, স্বর্ণপুর ছাড়িয়ে, রাক্ষুসে পাহাড় ডিঙিয়ে, জিন-সাগরের পাশে যে কাঁটা-ভরা বন, সেখানে ওকে রেখে এস!

বাদশার আদেশ শুনে প্রজারা ডুকরে কেঁদে ওঠে। তারা বড় শাহজাদিকে জান দিয়ে ভালবাসে, ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে।

বৃদ্ধ উজির পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে বাদশার কাছে অনুনয় করে,

: হুজুর, বেয়াদবি নেবেন না! আপনার কাছে আমি সবার হয়ে অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে এ কঠোর আদেশ তুলে নিন।

কিন্তু বাদশার ওই এক কথা-

: না, যে মেয়ে আমার মতো নয়, তাকে রাজ্যে রাখলে ভবিষ্যতে আমার বিপদ হতে পারে।

এ সময়ে এক দরবেশ রাজদরবারে প্রবেশ করবার জন্য বাদশার কাছে অনুমতি চাইলেন।

www.pathagar.com

বাদশা ফকির-দরবেশ, আলেম-আউলিয়া এ ধরনের লোকদের মোটেই পছন্দ করেন না। কাজেই তাঁকে ভেতরে ঢুকবার অনুমতি দিলেন না। দরবেশ কী আর করেন! বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

নির্বাসনে যাবার আগে লালমণি করুণভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। ছুটে গরিব দুঃখী প্রজাদের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু না, পালাবার কোনো পথই নেই।

ফটকের কাছে এসে দেখে পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডালে বেশ কয়েকটা পাখি বসে আছে। ওদের দিকে তাকিয়ে লালমণি মনে মনে বলে,

: আহা! আমি যদি ওদের মতো পাখি হয়ে যেতে পারতাম, তাহলে বোধহয় অনেক সুখী হতাম! মানুষের নিষ্ঠুরতা থেকে দূরে থাকতে পারতাম!

সদর দরজা পার হয়েই লালমণি সেই দরবেশকে দেখল। লালমণি তাঁকে সালাম জানালো! তিনি দুআ করলেন।

বাদশাজাদির এই অপমান তাঁর সহ্য হচ্ছে না। খুব নিচু স্বরে বললেন,

ভয় পেয়ো না লাল-মামণি
নিক্না যতই দূরে,
লাল টিয়ে রূপ ধরে তুমি
যাও নিমেষে উড়ে!
ভাবনা কেন, ছিলে যেমন
তেমনি আবার হবে,
স্বর্ণপুরের বাদশাজাদা
যখন তোমায় ছোঁবে।

সাথে সাথেই লাল রঙের একটি টিয়ে পাখি টিউ টিউ শব্দ করে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে উড়ে চলে গেল। পড়ে রইল দুটো হাত কড়া ও শক্ত একটা লোহার শিকল, যা দিয়ে তাকে বাঁধা হয়েছিল।

...কী হলো? কী হলো? লালমণি যে লাল টিয়ে হয়ে উড়ে গেল! হৈ চৈ রব উঠল। প্রহরীরা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করল। বেশ কয়েকজন দক্ষ পাখি শিকারি যোগাড় করা হলো। শিকারিরা আন্দাজের ওপর নির্ভর করে কত যে তীর ছুড়ল! কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। টিয়ে ও সে সাথে দরবেশ কোথায় যে উধাও হয়ে গেল কারো তা নজরে পড়ে না।

ওদিকে লাল টিয়ে উড়ছে, উড়ছে উড়ছে। নিজ রাজ্যের সীমানা কখন পেরিয়ে এসেছে! নিচে এক অচেনা দেশ। নদী-নালা, পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় পাছপালা। লাল টিয়ে একটা ঝাঁকড়া গাছের ডালে এসে বসল। ডানাতে তার ক্লান্তি নেমেছে। হঠাৎ সাঁ করে একটা তীর তার পাখা ঘেঁসে চলে গেল। সে ধপ করে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর খপ্ করে এক শিকারি তাকে ধরে ফেলল। ধরে তার সে কী আনন্দ! আনন্দে লাফাতে থাকে আর বলে,

আরে আরে দেখছি কীরে,
লাল টুকটুক টিয়ে!
অনেক অনেক মিলবে টাকা
এই পাখিটা দিয়ে।

পাখিটা সে তাদের স্বর্ণপুরের বাদশা সোনারাজের কাছে বিক্রি করে অনেক অনেক টাকা পাবে। বাদশার পাখি পোষার ভীষণ শখ! সে তার রাজ্যের অনেকটা জায়গা জুড়ে গাছপালা লাগিয়েছে। তার চারপাশে ও ওপরেও রূপার তার দিয়ে ঘিরে নিয়ে, বিরাট আকারের চমৎকার একটা খাঁচা তৈরি করেছে। পাখিদের কাছে সেটা খাঁচা বলেই মনে হয় না। সেখানে নানান ধরনের পাখি!

শিকারি মহা আনন্দে লাল টিয়ের পায়ে দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বলে,

www.pathagar.com

কত্‌তো পাখি দিলাম তাঁরে
নিত্যি ধরে ধরে,
সুন্দর হয় টিয়ে এমন
ভাবছি কেমন করে!

সত্যিই তাই! লাল টিয়ের মতো সুন্দর পাখি সে খাঁচায় একটাও নেই। সোনারাজের খাঁচাতে যে ক টা টিয়ে আছে সব ক টার পাখার রং সবুজ। লাল টিয়েটা পেয়ে সোনারাজ মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। লালটিয়ের দু চোখে আশার আলো জ্বলে। এই তো সেই বাদশা, যাঁর মনটা মায়ায় ভরা, যাঁর কথা দরবেশ বলেছিলেন! একবার তাকে ছুঁলেই সে নিজের রূপ ধারণ করবে। কিন্তু বাদশা যে কোনো পাখির গায়ে হাতই দেন না! দেবেন কী করে?

পাখি কি একটা দুটো? হাজার হাজার পাখি! তাদের যত্ন ও তদারক করার জন্য বহু লোকজন রয়েছে।

আজকাল আবার বাদশা সোনারাজের কাজ অনেক বেড়ে গেছে। তার আব্বার মৃত্যুর পর বিশাল রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব এখন তার। বড় ভাল আর দয়ালু ছিলেন তার আব্বা । সোনারাজ ঠিক তার আব্বার মতো হয়েছে। মাঝে মাঝে সোনারাজ তার প্রিয় পাখিগুলোকে এক নজর দেখে যায়।

একদিন সোনারাজ রাজসভায় বসেছে, এমন সময় দৌলতপুরের রাজদূত এসে তাকে একখানা পত্র দিল। সেখানকার বাদশা লিখেছেন,

: আমার রাজ্যের লাল রঙের সুন্দর একটি টিয়ে পাখি উড়ে চলে গেছে। যদি পাখিটা আপনার শৌখিন খাঁচার মধ্যে রেখে থাকেন, তবে তা ফেরত পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করছি।

চিঠি পড়ে সোনারাজের মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। খাঁচার কাছে এসে বলল,

তোমায় দিতে মন চায় না
ওগো অচিন পাখি,
তবু তোমায় ছাড়তে হবে,
কেমনে ধরে রাখি?

লাল টিয়ে হঠাৎ কথা বলে ওঠ।

লুকিয়ে রাখো তোমার ঘরে,
নইলে ওরা আমায় ধরে
দেবে সাজা এমন করে,
সেই সাজাতে যাবোই মরে!

টিয়ের মুখে কথা শুনে সোনারাজ তো অবাক! তার সন্দেহ হলো নিশ্চয়ই কেউ মন্ত্র পড়ে একে পাখি বানিয়ে রেখেছে। তার খুব মায়া হলো। আহা! বেচারা পাখিটা যে বাঁচবার জন্য তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছে!

সোনারাজ তখন দৌলতপুরে খবর পাঠিয়ে দিল যে পাখিটা তার কাছে আশ্রয় চেয়েছে। কেউ মৃত্যুভয়ে আশ্রয় চাইলে তাকে তা দেয়া ও রক্ষা করা মানুষের পুণ্যের কাজ। তাই সে এই পাখিটা ফেরত দিতে পারছে না। বদলায় সে শ খানেক অন্য টিয়ে পাখি দেবে।

শুনে দৌলতপুরের বাদশা ভীষণ খাপ্পা হয়ে ওঠেন। সোনারাজের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন।

www.pathagar.com

দু রাজ্যেই তখন যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। লাল টিয়ে শিউরে ওঠে। সোনারাজ তাকে দেখতে এলে সে মিনতি করে বলে,

আমার জন্যে বাঁধবে লড়াই
কখ্খনো না চাই,
দাও তুলে দাও, ওদের হাতে
চলেই আমি যাই!

সোনারাজের মন কেঁদে উঠল। না, লাল টিয়েকে নিষ্ঠুর বাদশার কাছে কিছুতেই ফেরত পাঠাবে না!

ফলে শুরু হলো যুদ্ধ। ভীষণ যুদ্ধ! যুদ্ধে বুড়ো বাদশা হেরে গেলেন। তাকে বন্দি করে কারাগারে নিয়ে আসা হলো

শুনে লাল টিয়ের দু চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। নিষ্ঠুর হলেও বাবা তো! সোনারাজ খুশি হয়ে যুদ্ধ জয়ের খবর দিতে এসে দেখে তার প্রিয় লাল টিয়ে কাঁদছে।

কী হলো গো টিয়ে পাখি খুলে আমায় বলো!

তোমার চোখে ঝরছে পানি
কেন এমন হলো?

লাল টিয়ে জবাব দেয় না। কেবলি কাঁদে আর কাঁদে।

সোনারাজ মনে দুঃখ পায়। লাল টিয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে,

: কেন তুমি অমন করে কাঁদছ? বলো, কোথায় তোমার ব্যথা! আমি তা দূর করতে চেষ্টা করবো।

লাল টিয়ে তবু নীরব। নীরবে সে ফোঁপাতে থাকে। সোনারাজের খুব মায়া হয়। সে টিয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে যায়। আর সাথে সাথেই-একী! কী দেখছে সে! সামনে দাঁড়িয়ে অপরূপা এক সুন্দরী! তার গায়ের রঙে বাগানটি যেন আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। অবাক সোনারাজ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

: কে? কে তুমি?

: আমি লালমণি! ওই পরাজিত বাদশার বড় মেয়ে।

এরপর লালমণি সব খুলে বলল ও করুণ চোখে তার আব্বার মুক্তি চাইল। মুক্তি দেবার আগে সোনারাজ বাদশাকে দিয়ে দুটো প্রতিজ্ঞা করালো। একটি হলো রাজ্যে ফিরে গিয়ে বাদশা প্রজাদের ওপর কোনো রকম জুলুম করতে পারবেন না, অন্যটি হলো লালমণিকে তার সাথে বিয়ে দিতে হবে।

বাদশা দু টি শর্তই খুশি হয়ে পালন করবেন বলে ওয়াদা করলেন।

নরম ও উদারমনা বড় মেয়ের ওপর তিনি বহু জুলুম করেছেন, নিষ্ঠুরভাবে তাকে নির্বাসনেও পাঠাচ্ছিলেন; অথচ সেই মেয়ে তাঁর জন্য কী না করেছে!

রাজ্যে ফিরে গিয়েই তিনি নিরপরাধ বন্দিদের মুক্ত করে দিলেন। শুধু তাই নয়, তাদের কাছে মাফও চাইলেন। আর যাদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায় করেছিলেন তাদের সব টাকাও ফেরত দিয়ে দিলেন।

এরপর সোনারাজ ও লালমণির বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। নীলমণি এসে বোনের কাছে মাফ চায়। লালমণি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

বিয়ের দিন। লালমণির সেই দরবেশের কথা সে একটুও ভোলে নি।

লালমণির ইচ্ছায় এ বিয়েতে গরিব-দুঃখীদেরই বেশি করে দাওয়াত করা হলো। তাদের খুব যত্ন করে বসানো হলো, খাওয়ানো হলো। জীবনে তারা এই প্রথমবারের মত এত মজার মজার খানা-

www.pathagar.com

কোরমা, পোলাউ, টিকিয়া, কালিয়া, দই, পায়েস, মণ্ডা-মিঠাই এ ধরনের খানা যততো খুশি খেলো। পেট ভরে খেলো। খানার পর সবাই আবার বাড়তি উপহারও পেল।

বিয়ের পর সোনারাজ লালমণিকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে আসে।

এক সময় নতুন রানিকে পাশে নিয়ে সেই বিরাট রূপোর খাঁচাটার কাছে এসে দাঁড়ালো। লালমণির চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে।

গাছের ডালে পাখিরা তখন বিয়ের আনন্দে গাইছে ও নাচছে।

সোনারাজ বেশ কিছুক্ষণ ওদের নাচ দেখল, মিষ্টি-মধুর গান শুনল।

এরপর একসময় খাঁচাটার দরজা সম্পূর্ণ খুলে দিল। দিয়ে বলল,

বন্দি করে রাখব নারে
খাঁচায় তোদের আর
তোদের কাছে মাফ চেয়ে আজ
ভাঙছি রূপোর দ্বার!

পাখিরা খাঁচা থেকে বের হয়ে পড়ে।

বাইরে এসে ডানা ঝাপটা দেয়। খুশিতে কিচির মিচির করে। সোনারাজ ও নতুন বউকে অনেক অনেক দুআ করে ও শুকরিয়া জানায়। বলে,

মোতির দাঁড়ে, রূপোর ঘরে,
যতোই রাখ আদর করে
তবু তাতে মন না ভরে,
ধুকে ধুকে জীবন মরে।

রূপোর ঘরটা ভেঙে ফেলায় পাখিরা খুশিই হলো। অবশ্য গাছপালাগুলো না কাটার জন্য অনুরোধ করে।

গাছগুলো ভাই কেটো নাকো
যত্ন করে রেখো,
ফল-ফলাদি খাবার খেতে
আসব আবার দেখো!
সোনারাজ হেসে বলল,
: আচ্ছা, তাই হবে।
পাখিদের সে কী আনন্দ!

ময়না, বাবুই, চড়ুই, কাকাতুয়া, পায়রা, শালিক, মাছরাঙা ও ঘুঘুরা রিনরিনে সুরে কোরাস শুরু করেছে, তান ধরেছে দোয়েল, ফিঙে, টুনটুনি, বুলবুলি, শ্যামা ও চন্দনারা। ধুয়ো ধরেছে কাক, চিল, শকুন, রাজহাঁস, পাতিহাঁস ও বন মোরগেরা। কোকিলের কুহু তানে রাজ্যটি মুখরিত হয়ে উঠেছে। পেখম ধরে নাচছে ময়ূর ও ময়ূরীরা।

একদল পাখি আবার নতুন বউকে ঘিরে নাচতে শুরু করেছে আর দুষ্টুমি করে বার বার ডাকছে, "বউ কথা কও! বউ কথা কও!"

.....যাবার আগে সবাই ওরা বর-বধূকে শুভ কামনা জানায়। বলে : আমরা আবার আসব।

বর বধূ হাত নাড়ে : নিশ্চয়ই আসবে। যেতে যেতে পাখিরা ফিরে চায়, আর বলে,

তোমরা যখন গাছতলাতে
বসবে দু জন এসে,
আমরা তখন গান শোনাবো
নাচব হেসে হেসে!

www.pathagar.com

ভূতের খপ্পরে (উপন্যাস)

হেলেনা খান

www.pathagar.com

প্রকাশক : পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।
প্রচ্ছদ : তাপস মজুমদার
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

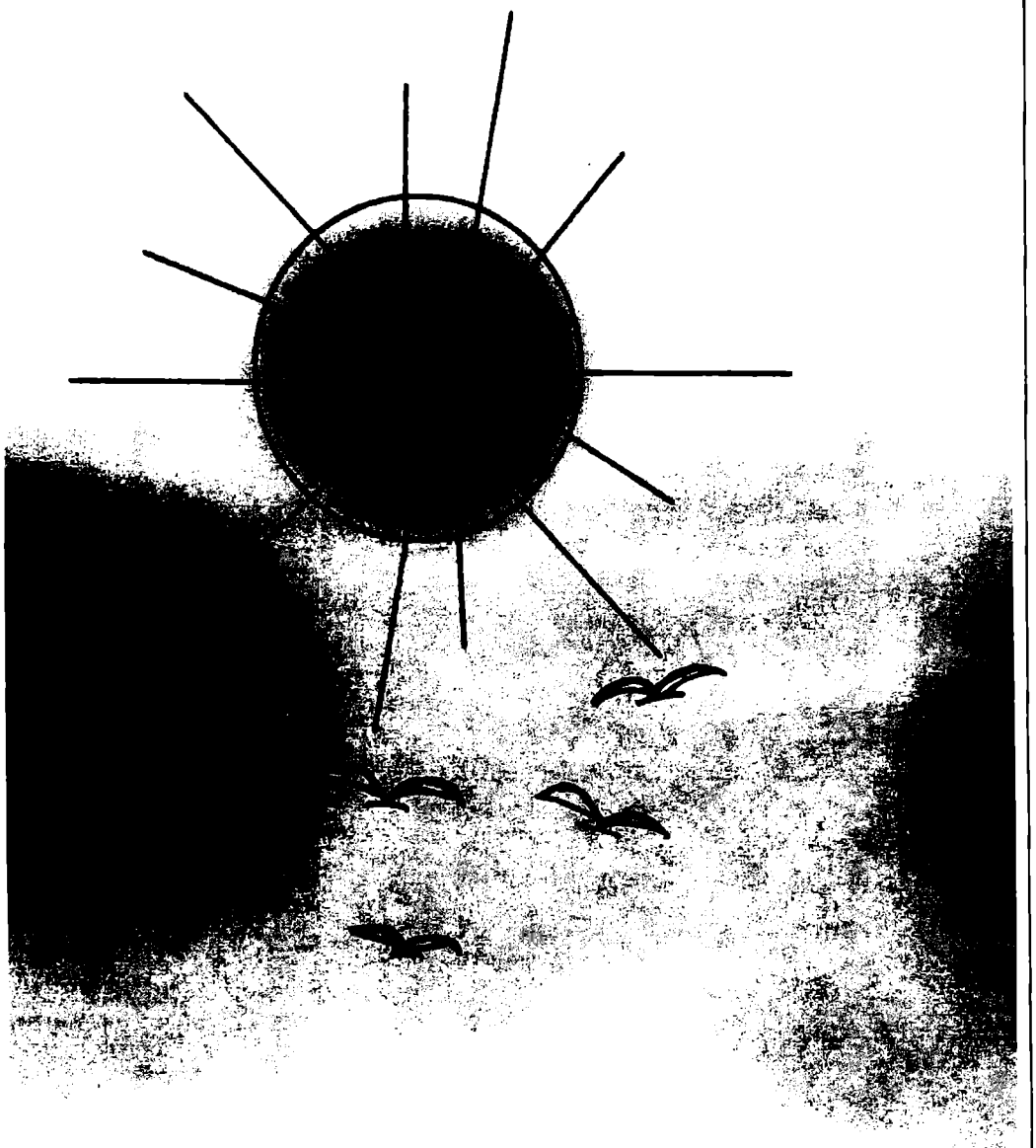

www.pathagar.com

ভূতের খপ্পরে

পপলু তার বন্ধু সবুজের জন্মদিনে তাদের বাসায় অনেক খেলাধুলা ও হৈচৈ করেছে। খেয়েছেও অনেক আজ। ভরপেট ও ক্লান্ত পপলু বাসায় ফেরে। হাতে একটা বই। নাম 'ভূতের খপ্পরে'। প্রচ্ছদটা দেখলেই ও বাবারে! কী ভয়ংকর! নয় দশফুট লম্বা একটা পেতনির ছবি! নাক নেই, চোখ নেই, মুখে, গায়ে, হাতে চামড়া-মাংস কিছু নেই। খোলা মুখে বত্রিশ পাটি দাঁত। ইয়া লম্বা হাড্ডি বের করা দু'টি হাত! মিশ্‌কালো একটা শাড়ি পরা। মাথায় লম্বা ঘোমটা।

পপলু বারান্দায় উঠে ডাকে, আম্মা ! কোনো সাড়া নেই।

বু-য়া! পপলু এবার চেঁচিয়ে ডাকল। বুয়াও জবাব দেয় না।

এসময়ে রান্নাঘর থেকে একটি মেয়ে মানুষ বের হয়ে এল। অস্বাভাবিক লম্বা ও শুকনো কাঠির মতো শরীর। পরনে কুচকুচে কালো শাড়ি। লম্বা ঘোমটা টানা। মুখ দেখা যায় না। পপলু আগে তাকে কোনোদিন দেখে নি। তাই জিজ্ঞেস করে, তুমি কে?

: আমি নতুন বুঁয়া।

পপলুর মনে হলো নতুন বুয়ার সর্দি হয়েছে। তার স্বরটা কিছুটা নাকি। সে নিজে থেকেই বলে, আগের বুঁয়া খবর পাঁইছে তার ছোড নাঁতি হঠাৎ মইরা গেছে। হের লাইগ্যঁ আম্মা আমারে রাখ্‌ছুইন।

: অ! তা আমাকে একগ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে দাও তো! খুব, পিপাসা পেয়েছে! ওই উঠানের টিউবঅয়েল থেকে পানিটা এনো। বিছানায় বসে ছিল পপলু, এবার ঘাড়টা ঘুরালো। ও আল্লাগো! কী দেখছে সে!! ভয়ে পপলুর বুকের রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হয়ে যায়! নতুন বুয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু হাত দুটো! ও বাবা বাবাগো! বারান্দা থেকে উঠোনের শেষ সীমায় টিউবওয়েলের কাছে! লম্বা দুটো হাত ! এক হাত দিয়ে টিউবঅয়েলের হ্যান্ডেল চাপছে, অন্য হাতটি দিয়ে কলের মুখে গ্লাসটা ধরে রেখেছে। ও আল্লাহ! আল্লাহগো! একটা তীব্র চিৎকারের সাথে সথে পপলু বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। দাঁত চেপে পপলু দম বন্ধ করে শুয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর তার আম্মা আমিনা আহমদ ঘরে ঢুকলেন। বললেন, : একি রে! এমন অবেলায় ঘুমাচ্ছিস যে! শরীর খারাপ? পপলু কাছে গিয়ে মা কপালে হাত রাখলেন, না:! জ্বর টর নেইতো! কী হয়েছে রে মানিক ? ওঠ্‌!

পপলু একবার বারান্দার দিকে, আর একবার টিউবঅয়েলের দিকে তাকায়। কোথায়? নতুন বুয়াটা নেই তো! আম্মা বলেন, কিরে এখনো ঘুমের ঘোর ভাঙে না?। ওঠ্‌ না তাড়াতাড়ি! আজ আমরা গ্রামে যাচ্ছি না! ট্রেন ফেল করব তো!

মার দিকে তাকিয়ে দেখে পপলু। খোঁপা বেঁধে, গহনা পরে, শাড়ি পালটে একদম রেডি!

পপলুর চোখের সামানে এখনো ভাসছে কালো শাড়ি পরা নতুন বুয়াটার বার-তের হাত লম্বা দুটো হাড্ডিসার হাত!

গোল গোল চোখ করে কাঁপা গলায় বলে পপলু, একটা নতুন বুয়া রেখেছ না আম্মা! ওটা আসলে একটা পেতনি নয় শাঁখচুন্নি।

গোছানো বাক্স পেঁটরা এক জয়গায় জড়ো করে রাখতে রাখতে বলেন আম্মা, শাঁকুচুন্নি পেতনি কিছুই না, ওটা হলো একটা চুরনি! খালি বাসা পেয়ে বেটি সামনে যা যা পেয়েছে নিয়ে সটকে পড়েছে।

www.pathagar.com

পপলু বলে, আম্মা, ওটা চুরনি না! আমি নিজের চোখে দেখেছি! ও বাবাগো! কী ভয়ংকর ! এ সময়ে পপলুর আব্বা আব্দুল জব্বার আহমদ বাসায় ঢোকেন। একেবারে রিকশা নিয়ে এসেছেন। বলেন, সব রেডি নিশ্চয়ই। ওঠ, তাড়াতাড়ি রিকশায় ওঠ!

: থানায় ডাইরি করে এসেছ? আম্মার প্রশ্ন বলেন আব্বা, হ্যাঁ করেছি, আর দেরি নয় তাড়াতাড়ি কর।

ট্রেনে বসে আব্বা বলেন, তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম, অপরিচিত কাজের লোক কখনো রাখতে নেই! দেখলে তো কী হলো!

তা বটে, আম্মা লজ্জিত ও দুঃখিত হয়ে বলেন, বুয়ার টেলিগ্রাম এল তার নাতিটা মরে গেছে! আর তখনই এল ওই বুয়াটা। ভাবলাম যাক, আর কোনোদিন এমন ভুল হবে না। একটা ব্যাপারে পপলু খুবই নিশ্চিন্ত হলো। ভাগ্যিস্ আজ তাদের ওই মহারাজা রোডের বাসায় থাকতে হবে না!

গ্রামে যাচ্ছে, ওহ্ কী বাঁচাটাই না সে বেঁচে গেল!

অল্পক্ষণের মধ্যেই গৌরীপুর স্টেশনে ট্রেন থামে।

দুই

গাঁয়ের বাড়িতে এসে পপলু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেই পেতনির ভয়টা বুকের ভেতর ঠাণ্ডা বরফের মতো জমে ছিল। সেটা গলে সরে গেছে। গ্রামের দৃশ্যে আনন্দে তার মনটা ভরে ওঠে। সুন্দর সবুজ ক্ষেত। পায়ে চলা সরু পথ। পথের ওপর ঝুঁকে পড়া ঘন বাঁশ ঝোপ। বিল, পুকুর ও ছোট্ট একটা নদী নিয়ে চমৎকার তার নানার বাড়ি!

বাড়িতে আসবার পথে ভারি সুন্দর একটা পুকুর দেখে এসেছে পপলু। শাপলা ফুলে বোঝাই পুকুরটা।

বাড়িতে এসে পপলুর আব্বা, আম্মা, মামি ও হিরণ মামা বাড়ি ঘর ঘুরে ফিরে দেখেন। হিরণমামা ও মামিও আজই ঢাকা থেকে এসেছেন। বহুদিন পরে গ্রামে এসেছেন।

বাড়ি ঘর সব ঝকঝকে করে রেখেছে রহমত শেখ, যাকে পপলুর আম্মা, মামিরা সবাই রহমত চাচা বলে ডাকেন। টিনের মস্ত বড় বড় ঘর। মেঝে পাকা। রান্নাঘর, গোলাঘর, ঢেঁকিঘর সবই পরিষ্কার, সুন্দর। কিন্তু সবচেয়ে পপলুকে আকর্ষণ করেছে বাড়ির পেছনের ফলবাগানটা! পপলু এক চক্কর দিয়ে বাগানটা ঘুরে এল।

এসে দেখে তারই বয়সী কয়েকটা ছেলে তার আম্মা ও মামিকে কদমবুসি করছে।

ওরা হলো টুকু, টুনু, মঞ্জুর ও মতি । টুকুকে জিজ্ঞেস করে পপলু,

: তুমি কোন ক্লাসে পড়?

: ক্লাস ফোরে।

: ক্লাস ফোরে? আমিও তো সে ক্লাসেই পড়ি!

: আমিও ফোরেই পড়ি। বলল মঞ্জুর।

অন্যান্য ছেলেরাও স্কুলে পড়ে শুনে খুশি হলো পপলু।

: তোমরা কিন্তু রোজ আমার সাথে খেলতে আসবে। আসবে তো?

: নিশ্চয়ই আসব।

পললুদের পাশের বাড়ির ছেলে মতি বলল,

: হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে, চলো আমাদের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে খন।

: হ্যাঁ, তাই চলো। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে রওয়ানা দেয় পপলু।

আম্মা বললেন, অন্যদিন যেখানেই যাবি, আমাকে না বলে যাবিনে কিন্তু। বন-জঙ্গল, সাপ-খোপ,

www.pathagar.com

জোঁক, বিচ্ছু কত কিছু আছে!

: হ, ঠিকই কইছ মা!

পপলুদের রহমত ভাই উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে, ওই গুলাইন ছাড়াও আরো অনেক কিছুই এদিক উদিক ঘুরতে থাকে। কে কুন সময় শরীলে আছর কইরা বয় কে জানে?

আম্মা ও মামি দু জনেই একটু চমকে উঠলেন।

তখনকার মত নানান কারণে রহমত ভাই, প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল সেটা চাপা পড়ে যায়। সন্ধ্যায় রহমত ভাইয়ের ঘরে এসে তাকে চেপে ধরল পপলু।ঔই যে দুপুরে কাদের কথা বলছিলে রহমত ভাই, তাদের কথা তোমাকে বলতে হবে !

অ, ভূত, পেতনি, দত্যি আর 'শকশ' দের কথা? (ময়মনসিংহের গ্রাম্য ভাষায় ভূতকে শকশ বলে)

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদেরি কথা। তোমাকে সব বলতে হবে কিন্তু। ওরা কোথায় থাকে, কী খায়, কোথায় ওদের দেখা পাওয়া যায়, সব কথা!

আঙুল দিয়ে জানালার বাইরে দেখিয়ে বলে, রহমত ভাই। ওই যে, এহান থাইক্যা বিলটা দেহা যায়, হেই বিলের কাছে হেরা পরায়ই আসা যাওয়া করে। বুঝলা পপলু ভাই, ভূতের থাকে ইয়া বড় বড় চক্ষু। হেই চক্ষু কিন্তু আমাগো মতো কপালের নিচে থাকে না, থাকে উপরে। আর পায়ের পাতা ও আঙুল গুলাইন থাকে উলটা দিকে। ভূত পেতনিদের বিশেষত্ব হলো ওরা শুঁটকি মাছ, গজার আর বোয়াল মাছের গন্ধ পেলে সে বাড়িতে আসবেই আসবে। ছদ্মবেশে আসবে। হয়তো কোনো ফকির সেজে আসবে, নয়তো পড়শি! কখনো কখনো আবার পশু পাখির বেশ ধরেও আসে। মাছ পেলে তো কথাই নেই। না হলে মাছের কাঁটা পেলেও খুশি! চেটেপুটে খাবে, তবে যাবে সেখান থেকে। তখন নাকি অনেক সময় ওদের ইয়া লম্বা জিবটা বেরিয়ে পড়ে।

রহমত ভাই নাকি একবার তা দেখেছিল নিজের চোখে। তার একটা বিস্তৃত বিবরণ দিল।

তখন রহমত ভাই নাকি জোয়ান ছিল। খুব শক্তি ছিল শরীরে। এখনকার মত চুলও পাকে নি, দাঁতও নড়ে নি। একদিন রাত্রে পপলুর নানার জমির বর্গার সব ব্যবস্থা করে সরু আলের ওপর দিয়ে বাড়ি ফিরছিল সে। দরাজ গলায় একটা গানও ধরেছিল। গান গাইতে গাইতে বেতঝোপের কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো রহমত ভাই। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল।

ইহা আল্লাগো! কী দেখছে সামনে! একটা কুচকুচে কালো হুলো বেড়াল। চেটে পুটে গেরস্তবাড়ির এঁটো কাঁটা খাচ্ছে! জিবটা তার তিন হাত লম্বা!!

গেরস্তবাড়ির পাকঘরের পেছন দিকের পথে ফিরছিল রহমত ভাই। পাটখড়ির বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে ঠিকরে পড়ছিল কুপির আলো। সে আলোতেই দেখেছিল ওই দৃশ্য।

রহমত ভাই ভয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু ঘাবড়ে যায় নি। তা যাবে কেন? ওর তো খুব সাহস ছিল, আর ভূত, পেতনি তাড়াবার সব দোয়া দরূদও তার জানা ছিল।

সে হাততালি দিয়ে সরাতে গেল বিড়ালটাকে। ফল হলো উলটো। লাফ দিয়ে রহমত ভাইয়ের দিকে এগিয়ে এল বিড়ালটা। সেই মূহূর্তে তার বুকের রক্ত জমে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে নিমেষের জন্যেই। রহমত ভাই ভয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শুরু করল ভূত তাড়াবার দোয়া-

ভূত- পেতনি দত্যি-দানো।
শাঁকচুন্নির ঝি!

www.pathagar.com

সঙ্গে আছে আল্লা-রসূল
করবি আমায় কী?
আর যায় কোথায়? পড়ি মরি করে বিড়ালটা দে ছুট!

সেদিন যদি অমন দৌড়ে না পালাতো ভূতটা তবে নাকি সেখানেই বেশ কিছুক্ষণ ধড়ফড় করে তারপর মরে যেত। লোকে জানতো একটা কালো বিড়াল মরেছে। কিন্তু জানত না যে, ওটা আসলে ছিল একটা ভূত।

বিলের ধারে ভূতেরা

পপলু রহমত ভাইয়ের কাছ থেকে ভূত তাড়াবার দোয়াটা শিখে নিল। আরো শিখে নিল, একা একা চলতে হলে কী কী সাথে রাখতে হয়। সাথে এক টুকরো লোহা রাখলে ভূত, পেতনি, জ্বিন ধারে কাছেও ঘেঁষতে সাহস পায় না।

তিন

পরের দিন সকালে আম্মা যখন বাড়ির কাজের ছেলে আলীকে বাজারে পাঠাচ্ছিলেন, পপলু এসে ধরল,
: আম্মা, শুঁটকি খাব, আর খাব গজার মাছ।

www.pathagar.com

আম্মা হাসলেন। তিনি ভাবলেন, পাড়ার ছেলেদের কাছে শুঁটকি ও গজার মাছের স্বাদের কথা শুনেছে পপলু। বললেন: বেশ, শুঁটকি আনিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু গজার মাছ, না পপলু, গজার মাছ থাক!

: তাহলে বোয়াল।

: আচ্ছা।

পপলু এক ছুটে চলে এল নতুন বন্ধুদের কাছে। দেখে, ওরা বড় একটা গাছের নিচে বসে জটলা করছে। বটগাছের পাশ ঘেঁষে একটা ছোট নদী বয়ে চলেছে। ওরা চোখ গোল গোল করে কী একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে।

: কী ব্যাপার? পপলু এসে দাঁড়লো।

: এসো, পপলু এসো। শোনো, কী ভয়ঙ্কর এক ঘটনা!

পপলুকে ওরা বসবার জন্যে জায়গা করে দিল।

মঞ্জুর বলল: গতরাতেও নাকি সেই রাজকুমারী দেখা দিয়েছিল।

: তাই নাকি?

: তা, খাসি নিয়ে গিয়েছিল কে? প্রশ্ন করে মতি।

: খাসি নয়, মুরগি নিয়ে গিয়েছিল এনায়েত মোল্লা।

আজ সকালেই এনায়েত মোল্লার ছেলেটা অনেকটা ভাল হয়েছে নাকি।

মঞ্জুরের কথার পিঠে বলল টুকু। পপলু ওদের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। তাই অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করে,

: কী ওস্তাদি করছো সবাই! আগে বলবে তো কী ঘটনা। তারপর বুঝব কী মুরগি, খাসি আর রাজকুমারীর গল্প করছো তোমরা!

: তবে শোনো!

শুরু করে মঞ্জুর। বিজ্ঞের মতো মুখ ভঙ্গি করে বলে, শুনে আবার ভয়ে পায়ে না তো?

: ভয়? ভয় কেন? তোমরা যেখানে ভয় পাচ্ছ না, আমি ভয় পাব কেন? পপলু রীতিমত অপমানিত বোধ করে।

বুঝতে পেরে মঞ্জুর হেসে বলে, না, এই বলছিলাম কী, শহরে গাড়ি, মোটর, ট্রাক, স্কুটার চলে হরদম শব্দ হয় সারাক্ষণ! তাই বোধ হয় ভূত থাকে না। চকিতে পপলুর সেই পেতনিটার কথা মনে পড়ে যায়। সেই লম্বা হাতয়ালা ভয়ঙ্কর সে দৃশ্যটা। পপলু বলল, না ভাই, ও তোমাদের ভুল ধারাণা। শহরেও ভূত, পেতুনি, শাঁখচুন্নি সবই আছে। ওরা আরো ভয়ঙ্কর! মঞ্জুর তার আগের কথায় ফিরে যায়। বলে, : হ্যাঁ শোনো, আমাদের এ কলতাপাড়া গ্রাম থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আছে 'পরীর জাংলা'। নামটা দিয়েছে এখানকার লোকেরা। আগে ও বাড়ির নাম ছিল সেন বাড়ি। সেন বংশের জমিদাররা থাকতো ও বাড়িতে। এখন অবশ্য সেন বাড়ি ভেঙেচুরে যা তা হয়ে গেছে!

: সেই সেন বাড়ির একমাত্র মেয়ের নাম ছিল রাজকুমারী। বাপ মায়ের খুবই আদরের ছিল বুঝতে পারছো!

একদিন সেই আদরের মেয়ের হলো ভয়ানক জ্বর! কত ডাক্তার, বদ্যি কবিরাজ এল! অসুখ সারল না! অসুস্থ অবস্থাতে তার খুব মাংস খেতে ইচ্ছে হলো । কিন্তু সে ইচ্ছে তার পূরণ হলো না। দু দিন পরেই মরে গেল রাজকুমারী।

তারপর কত বছর কেটে গেছে সেন বংশের জমিদারি কবে ধ্বংস হয়ে গেছে, সে ঘটনা অনেকে জানেও না। কিন্তু এই কিছুদিন আগে সেন বংশের ভাঙা জমিদার বাড়ির একটা কামরায় সেই রাজকুমারীর

www.pathagar.com

সন্ধান পাওয়া গেছে। কারো বাড়িতে কোনো অসুখ বিসুখ দেখা দিলে হঠাৎ কোনো সময় ফকির এসে হাজির হয়। ফকির বাড়ির সেই অসুস্থ লোকটির জন্যে রাজকুমারীর উদ্দেশ্যে মানত করার জন্যে পরামর্শ দেয়।

মানতের খাসি পাঁঠা, গরু, আর তা না থাকলে হাঁস-মুরগি সেই ভাঙা বাড়িতে দিয়ে আসতে হয়। শোনা যায়, রাজকুমারীর অতৃপ্ত আত্মা সে সব জ্যান্ত খাসি-পাঁঠার রক্ত শুষে খায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ তাকে দেখাও নাকি যায়। আজ এত বছর পরেও রাজকুমারী সেই আগের মতো সুন্দর ও ছোট্টটি রয়ে গেছে।

বলতে বলতে মঞ্জুরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মতি, টুকু, টুনুও একবার ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক তাকালো। পপলু ভেতরের ভয় দমিয়ে প্রশ্ন করল।

: তোমরা কেউ দেখেছ সে রাজকুমারীকে?

: না, আমরা দেখিনি তবে আমার দূর সম্পর্কের এক চাচাতো ভাই দেখেছেন। বলল টুকু।

কবে, কোথায়, কীভাবে দেখেছিল; দেখার আগে বাড়ির পেছনের বাঁশঝাড় থেকে গায়েবি আওয়াজে যা বলেছিল, দুটো খাসি চাই, দুটো খাসি! এসব বিস্তারিত ভাবে বলল টুকু।

: তা, তোমাদের রাজকুমারীকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

পপলুর চোখের তারা দুটো নেচে উঠেছে। সেখানে ভয় ও ভাবনার সাথে অদম্য কৌতূহল!

ইচ্ছে? ওরে বাবারে, ওই পেতনি দেখবার কার আবার ইচ্ছে হয়? ঘাড় মটকে দেবে না?

বেলা হয়ে গেছে দেখে সবাই উঠে পড়ল।

চার

বাড়ি ফিরে পপলু দেখে তার রহমত ভাই পুরানো বড় একটা আলমারি থেকে মোটা মোটা বাঁধানো খাতা নামিয়ে দিচ্ছে।

রান্না ঘরের কাছে এসে একটা তীব্র গন্ধ নাকে গেল পপলুর। আমিরন বু শুঁটকি ভর্তা করছে। তারই গন্ধ।

পপলুকে দেখে তার আম্মা তাড়া দিলেন, এই যে কোথায় ছিলি এতক্ষণ? যা তাড়াতাড়ি গোসল করে আয়! শুঁটকি, বোয়াল মাছ সবই রান্না হয়েছে।

খাওয়া সেরে পপলু করল কী এক টুকরো বোয়াল মাছ ও বেশ কিছুটা শুঁটকি মাখা ভাত রান্না ঘরের পেছনে ছিটিয়ে দিল। দিয়ে দূর থেকে দেখতে থাকে কী হয়!

ওমা, সত্যিই তো! পপলু! দেখল, একটা ধেঁড়ে কাক এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল বোয়াল মাছের টুকরাটা। আর কোত্থেকে লাফ দিয়ে এল একটা কালো হুলো বেড়াল। এসে গপাগপ খেতে শুরু করল সেই মাছ-ভাত। কাকটা উড়ে চলে গেছে। অত্যন্ত তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বেড়ালটাকে লক্ষ্য করতে থাকে পপলু।

....ওর তিন হাত লম্বা জিবটা যদি বের হয়ে পড়ে?

পকেটে হাত দেয় পপলু। হ্যাঁ, লোহার পেরেক একটা আছে সাথে। আর দোয়াটা...মনে মনে আওড়ালো পপলু। দোয়া পড়বার সাথে সাথেই ওকি! চলে গেল বেড়ালটা!

নাঃ! ভুল করছে সে! আগেই দোয়াটা পড়া উচিত হয় নি! তার উচিৎ ছিল বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা।

: মাগো, দুইডা ভিক্ষা দ্যান!

একটা ভিখারির বিদঘুটে কণ্ঠে তার চমক ভাঙলো।

www.pathagar.com

পপলু বাড়ির পেছন দিক থেকে ছুটে দেউড়ির দিকে গেল।

: বাই, আম্মারে গিয়া কওগা দুইডা বাত দিতে।

পপলু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। রহমত ভাই বলেছে ভূত, আর জ্বিনেরা যে ছদ্মবেশেই আসুক না কেন, ওদের পাগুলো উলটো দিকে থাকবেই। আর, ওদের ছায়াও পড়ে না। পপলু দেখল ভিখারিটা বেড়া ঘেঁষে ছায়ায় দাঁড়িয়েছে। এতে তার সন্দেহ বাড়ল। সে ছুটে বাড়ির ভেতর দিয়ে দু মুঠো চাল নিয়ে এল। এসে রোদে দাঁড়িয়ে ভিখারিকে ডাকল,

: এ্যাই, এদিকে এসো! এসো ভিক্ষে নিয়ে যাও!

লোকটা আসে না। সে ওর গায়ে জড়ানো ছেঁড়া চাঁদরটা ভালভাবে চেপে ধরে বলে,

: এই খানে আইসা দেন্না বাই! পপলুর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। তাহলে রহমত ভাইয়ের কথাই সত্যি!

বজ্জাতটা ছায়া ছেড়ে রোদের দিকে আসছে না। এদিকে এলে ওর ছায়া ও উলটো পা পপলুর নজরে পড়ে যাবে কি না! তাই। পপলু বাড়িতে গিয়ে রহমত ভাইকে ডেকে আনতে গেল। ওর বুকটা এবার রীতিমত দুরদুর করছে। মনে মনে আপনিই আওড়ে যাচ্ছে সেই দোয়াটা—

ভূত, পেতনি, দত্যি দানো
শাঁখচুন্নির ঝি,
সঙ্গে আছে আল্লা-রসূল
করবি আমার কী?

রহমত ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসে দেখে ভূতটা শূন্যে মিলিয়ে গেছে, কী আশ্চর্য! এমন চাক্ষুষ একটা প্রমাণ পাবে ভূতের, পপলু ভাবতেই পারে নি কিন্তু।

রহমত ভাই গলার স্বর নিচে নামিয়ে বলল, সাবধান কিন্তু পপলু ভাই! ঠিক ভর দুপুর বেলায় দেও জ্বিনেরা এদিক ওদিক ঘুরাফিরা করে।

হ্যাঁ, তার প্রমাণ তো এই একটু আগেই পপলু পেল।

পপলুর মনে সাথে সাথেই উঁকি দিল তাহলে আজকেই আর একবার ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক না! আম্মা, আব্বা, হিরণ মামা সবাই ব্যস্ত । তার দিকে নজর দেবার মত সময় নেই কারো। এই তো সুযোগ!

আচ্ছা মঞ্জুরকে কি সাথে নেবে? ভাবল পপলু! না, তাতে বাহাদুরি নেই! আর দরকারই বা কী?

পপলুর সাথে পেরেক আছে। আর ভালভাবে ভূত সারাবার দোয়াটা জানা আছে! একাই ভাল।

একা একা কোথায় যাবে? হ্যাঁ, যাবে নদীর ঘাটে। সেখানে বিরাট বটগাছটার ডালে দোল খেতে খেতে ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে। পপলু এসে নদীর ঘাটে বসল। নির্জন, নিস্তব্ধ দুপুর। পপলুর জীবনে এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। বড় ভাল লাগছে তার এমনি দুপুর। আর দুপুরের শান্ত নদী ...নদীর ঘাটে বহুদিন আগে বাঁধানো পুরানা ঘাট। আস্তর উঠে গেছে অনেক জায়গায়। ইট বের হয়ে আছে এবড়ো থেবড়ো। হঠাৎ যেন মনে হয় বিরাট কঙ্কালের চোয়ালে গাঁথা নড়বড়ে দাঁতগুলো।

ঘাটের কাছে বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা। দু দিকে বাঁশবন ও বেতঝোপ। ধীর বাতাসে বাঁশগাছগুলো একটু একটু দুলছে। পাতার ফাঁকে শিরশিরে বাতাস বইছে।

চমকে ওঠে পপলু। ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। কারা কথা বলছে? কানপেতে শোনে পপলু। ঠিক ঠাহর করতে পারে না।

www.pathagar.com

পপলু একা এসেছিল শুধু নিজের চোখে এক নজর ওদের দেখবে বলে। একবার পেতনি দেখে তার মনের বল অনেকটা বেড়েছে। কিন্তু কোথায়? কারো টিকিটি তো দেখা যাচ্ছে না! পপলু বাড়ির দিকে ফিরে চলল ।

সরু মেঠো পথ। দু পাশে গাছ পালার সারি। সামনে একটা বেতঝোপ। দূর থেকে পপলু দেখল বেত ঝোপটা নড়ছে। কী ব্যাপার? ভূত, পেতনি বা জ্বিন নয়তো! ওরা এমনি ভরা দুপুরেই নাকি বের হয়ে, যখন চারদিক খুব নির্জন থাকে। বাস্তবিকই তাই। ...ভূত একটা বেরিয়ে গেল ঐ বেত ঝোপের ভেতর থেকে। বেরিয়েই কোনো দিকে না তাকিয়ে, হাঁটতে থাকে হন্ হন্ করে।

ধড়াস করছে পপলুর বুকের ভেতরটা। যদি ওর দিকে লাফিয়ে আসে ভূতটা? তখন কী করবে? পকেটের পেরেকটা শক্ত করে চেপে ধরে সরবে ভূত তাড়াবার সেই দোয়াটা পড়তে থাকে পপলু।

সেজন্যেই বোধ হয় ভূতটার ছুটবার গতি আরো বেড়ে যায়।

পপলু লক্ষ্য করে দেখে এটা সেই ভূত, যে আজ শুঁটকি ও বোয়াল মাছের গন্ধে তাদের বাড়িতে গিয়েছিল, যাকে ভিক্ষা দিতে গিয়ে পপলু দেখেছিল চাদর দিয়ে গা ভালভাবে ঢেকে নিচ্ছে! যে কিনা শেষ পর্যন্ত শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল। সেই ভিখারির বেশ ধরা ভূতটাই তো!

পপলু এবার বেতঝোপের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে।

আচ্ছা, কেমন দেখতে ওই বেতঝোপের ভেতরটা অর্থাৎ ভূতের বাসাটা?

বুকের ভেতর কেমন একটা শিরশিরে ভয়ের কাঁপন। তবু এক অদম্য আকর্ষণে বেতঝোপের দিকে এগিয়ে গেল পপলু। দু হাতে সরালো বেতগাছগুলো। সরিয়ে দেখে না, কোনো ঘর-টর নেই! কিন্তু তাজ্জব কাণ্ড!একটা শার্ট পড়ে আছে। নতুন একটা শার্ট।

: শার্ট! ভূতেরা আবার শার্ট পরে নাকি? তা, পরে বৈকি! মানুষের ছদ্মবেশ নিতে হয় ওদের।

পপলু ভয়ে ভয়ে শার্টটার দিকে তাকালো । হালকা নীল রঙের নতুন সুন্দর একটা শার্ট। শার্ট হাত দেবার সাহস হলো না। কী জানি, যদি কিছু হয় আবার!

পাঁচ

বিকেলে টুকু, মতি, মঞ্জুর সবাই এল। ওদের সাথে পপলু গ্রাম দেখতে বের হলো। ওরা যাবে নদীর ধারে ফাঁকা মাঠে। পথ চলতে চলতে ওরা কথা বলছিল। একটা ভাঙা মন্দিরের কাছে এসে শোনে, ভেতর থেকে একটা ফোঁপানো কান্নার স্বর ভেসে আসছে। কী ব্যাপার? কাঁদে কে?

পপলু ভাঙা মন্দিরের ভেতর উঁকি মেরে দেখে একটা রোগা টিঙটিঙে ছেলেকে চড়চাপড় লাগাচ্ছে বেশ তাগড়ামত একটা ছেলে। বয়সে পপলুদের চেয়ে বেশ কিছুটা বড়ই হবে। ছোট ছেলেটা বলছে,

: আর ভুলতামনা, মাইরো না আমারে! ঠিক তুমারে বড়ই আইন্যা দিয়াম। আইজ ভুল হইয়া গেছে।

বড় ছেলেটার কর্কশ স্বর শোনা যাচ্ছে। আগে বল, ভুইল্যা গেলি ক্যান? ক্যান ভুইলা গেলি বড়ই আনতে?

মতি খাটো গলায় বলল, চৌধুরী বাড়ির ছেলে বাদশা। বড়ই পাজি। ওদেরই রায়তের ছেলে ফেলুকে মারছে। আহা, ফেলুটার মা নেই।

www.pathagar.com

পপলুর চোখ ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে। মুখ ভেংচে বলল, : আহা, মা নেই! সে জন্যে ভারি মায়া তোমাদের! মা মরা টিঙটিঙে ছেলেটা যে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, তাতে তো মায়া হচ্ছে না। যাও না, ওই ধেড়েটাকে লাগিয়ে এসো না কয়েক ঘা!

মঞ্জুর, মতি, টুকুরা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে থাকে। বাদশাকে ওরা ভয় পায়। ওতো চৌধুরী বাড়ির ছেলে!

পপলুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। ছেলেটার ব্যবহার অসহ্য! সাঁ করে ছুটে এসে পপলু ওর মাথায় দুটো গাট্টা লাগিয়ে ছিল। : কেন, অকারণে ওই শুঁটকো ছেলেটাকে মারছ?

আচমকা আক্রান্ত হয়ে বাদশা প্রথমে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, চোখ পাকিয়ে তাকালো পপলুর দিকে। বললঃ মারছি, বেশ করছি, একশবার মারব, হাজার বার মারব! তুমি কোত্থেকে এসেছ ওস্তাদি করতে? পপলু নিজেকে সংযত রেখে বলল, যেখান থেকেই আসি না কেন, তুমি ওকে এভাবে অকারণে মারলে, আমিও তোমার মাথায় গাট্টা মারব।

: ইস, দেব না হাত ভেঙে কথাটা বলল বটে বাদশা, কিন্তু পপলুর পিছনে মঞ্জুর, টুকু দেখে ও বুঝল ছোঁড়াটা একলা নেই। ওর শাগরেদ জুটেছে ওই বাজে ছোকরাগুলো, কাজেই মারামারি শুরু না করে সে মানে মানে সেখান থেকে সরে পড়ল।

এরপর ওরা এগিয়ে গেল। বাঁয়ে ঘন বন, ডান দিকে শাপলা দীঘি। অজস্র লাল শাপলা পুকুরের চার পাশ। শাপলা দিঘির কাছে এসে টুকুরা জোরে জোরে "লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যেল আযিম" পড়তে শুরু করল। আর বাতাসের বেগে ছুটে পালাতে থাকে। পপলু তো অবাক!

: অমন করছো কেন? ছুটছো কেন সবাই?

: দৌড়াও, দৌড়াও পপলু! কথা বলো না এখন! ছুটতে ছুটতে বলে টুকু। শাপলা পুকুর আজর‍্যা পুকুর। কেউ এখানে আসে না। এই পুকুরে মাছ আর মাছ। কিলবিল করে হাজার হাজার মাছ। তবু কেউ মাছ ধরতে আসে না।

: কী পুকুর বললে আজর‍্যা? আজর‍্যা মানে? জবাবে সংক্ষেপে বলল মঞ্জুরঃ মানে হল ভূতুড়ে, বুঝলে? 'আজর' জ্বিন আছে শাপলা পুকুরে, খুব খারাপ ভূত ওটা। তোমার এক মামাই তো ওই পুকুর ঘাটে এসে মারা গিয়েছিল।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁ জিজ্ঞেস করো রহমত ভাইকে। থাক্, আজ মঙ্গলবার, ওসব কথা না বলাই ভাল।

: কেন, মঙ্গলবারে ভূতের কথা বললে কী হয়?

: কী হয়? ও সব্বনাশ! রাতে এসে বাড়ির কারো ঘাড় মটকে দিয়ে যাবে যে! আর কোনো প্রশ্ন না তুলে পপলু ওদের সাথে এগিয়ে চলে। না। একদিন একা এসে ভালভাবে দেখতে হবে এ দিঘির আশে পাশে কী আছে।

ওরা নদীর ধারে ফাঁকা মাঠে খেলাধুলা করে। প্রথমে হাডুডু, পরে কানামাছি। ফেরবার সময় সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে ওরা অনেকটা ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। কয়েকটা গৃহস্থ বাড়ির পেছনে আলের ওপর দিয়ে ওরা ফিরছে। হঠাৎ বাজফাটা এক গর্জনে চমকে ওঠে পপলু।

: ও কেরে এমন চিৎকার করে গালাগাল করছে?

: জুম্মার দাদি। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে বলে মঞ্জুর। জুম্মা অবশ্য বেঁচে নেই। ওই যে শাপলা দিঘি, পানির জ্বিন আছে যেখানে, সেই জ্বিনে টেনে নিয়ে গিয়েছিল জুম্মাকে। মঙ্গলবারে ঠিক

www.pathagar.com

দুপুর বেলা জুম্মা একলা গোছল করতে গিয়েছিল কি না! জ্বিনের খপ্পরে পড়েছিল বেচারা। কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে চলে।

পেছন থেকে সমুদ্র গর্জনের মত শোঁ শোঁ শব্দ তখনো ভেসে আসছে। চোরেরা জুম্মার দাদির নারকেল গাছ থেকে নারকেল পেড়ে নিয়ে গেছে চারটা। অদেখা অদৃশ্য চোরদের বাপ দাদা তুলে সে গাল দিচ্ছে, শাপশাপান্ত করছে আঙুল মটকে। সারা গাঁয়ের মধ্যে এই একটি বাড়ি থেকে চোরেরা চুরি করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। জুম্মার দাদির চিৎকার ধাপে ধাপে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছবে যে সবাই জেনে যাবে গাঁয়ে চোরের আবির্ভাব হয়েছে। নিশ্চিন্তে দুটো নারকেল খাওয়া হয়ে উঠছে না চোরদের।

: বাপরে বাপ, গলা নয়তো যেন কামানের গর্জন! বলতে বলতে ওরা কানে হাত দিয়ে ছুটে পালালো সেখান থেকে।

ছয়

বাড়ি ফিরে পপলু শোনে তার আব্বা ও হিরণ মামা গ্রামের পরিচিত লোকদের সাথে বেড়াতে বের হয়ে গেছেন। আম্মা ও মামিকে ঘিরে গ্রামের কয়েকজন বউ-ঝি গল্প করছেন। রহমত ভাই তার ঘরে কী যেন করছে।

পপলু তাদের রহমত ভাইয়ের ঘরে এসে চৌকিতে বসল। বলল: ও রহমত ভাই, শাপলা দিঘির গল্প বলো। শিগ্‌গির বলো

শাপলা দিঘি কে কেটেছিল, কে বাঁধিয়েছিল তার সুন্দর ঘাট, তা জানে না রহমত ভাই। তবে পরবর্তী বহু ঘটনা জানে সে। কেশে গলা সাফ করে রহমত ভাই। বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করল, মঙ্গলবারের দুপুরে জুম্মার করুণ মৃত্যুর কাহিনী। তার তলিয়ে যাওয়া দেহ যখন ফুলে ভেসে উঠেছিল, স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল জুম্মার গলায় সরু আঙুলের ছাপ। ও নিশ্চয়ই শাপলা দিঘির 'আজর‍্যা' জ্বিনের আঙুলের ছাপ ছিল।

এরপর রহমত ভাই পপলুর আপন মেজো মামার মৃত্যু কাহিনী বলল। শাপলা দিঘির পাশে তখন চওড়া রাস্তা ছিল। গরু ঘোড়া চলত সে রাস্তায়। পাশেই ছিল বড় একটা মাঠ। মাঠে ছেলেরা খেলাধুলা করত।

: বুঝলা পপলু ভাই, শফিক মিয়াও রোজ ওই খানে খেলতে যাইত। একদিন চোর চোর খেলতে খেলতে মাঠ পার হয়ে রাস্তার মধ্যে ছুইটা আইছিল। আইসা ধপপাস কইরা পড়ছিল রাস্তায় উপ্‌রে। আজর‍্যা জ্বিনে টানতে আছিল শাপলা দিঘির থাইক্যা।

রহমত ভাইয়ের স্বরটা ভিজে উঠেছে। সেই বিশ বছর আগের করুণ দৃশ্যটা তার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠেছে। গলা ঝেড়ে বলল রহমত ভাই: রাস্তার উপর পইড়া গিয়া জবর দুঃখু পাইছিল শফিক মিয়া। হাঁটুর কাছে ছাল উইঠ্যা গেছিল। ঝিম ধইয়া পইড়াছিল কিছুক্ষণ।

: তারপর?

: তারপর, খেলার দোস্তদের দিকে তাকাইয়া নাকি কইছিল, কিচ্ছু হয় নাই আমার, সামান্য একটু লাগছে। কিন্তু উইঠাই খুঁড়ায়া খুঁড়ায়া হাঁটতাছিল হে। মা বাবারে জানতে দেয় নাই। পাছে বকা শুনন লাগে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে এই শাপলা দিঘির ঘাটেই অনেকক্ষণ বসেছিল পপলুর শফিক মামা! বন্ধুরা সবাই চলে গেলে সে বাড়ি ফিরেছিল।

www.pathagar.com

: হেইডাই হইছিল কাল গো! হেইখান থাইক্যা আইসাই শফিক মিয়া বিছনা নিল। শাপলা দিঘির আজর‍্যা ভূতে আছর করছিল তারে। তাই না অমন সুন্দর সিধা শরীলডা তার বেঁকাচুরা কী রকম যে হইয়া গেল!

ডাক্তার আইসা কী একটা নাম কইল হ, মনে পড়ছে, কইল

ধনুষ্টঙ্কার। সময়মত ইনজেকশন পড়লে বাঁচত। তা, বাঁচত না, ইনজেকশনেও বাঁচত না শফিক মিয়া। তারে ঠাইস্যা ধরছিল ভূত। ইনজেকশনে কী হইত?

রহমত ভাইয়ের দু চোখের কোণে জমে ওঠা পানি এবার অঝোরে ঝরে পড়ে।

পপলুরও তার না দেখে সেই শফিক মামার জন্য মনটা কেমন করে ওঠে। তার আম্মার সাত বছরের ছোট ছিল সেই শফিক মামা।

দু চোখের পানি মুছে বলল রহমত ভাই, এই তুমার মতোই ছোট ছিল। অনেকটা তুমার মতোই আছিল দেখতে।

সাত

এরপর থেকে শাপলা দিঘি যেন অদৃশ্য হাতছানি দিয়ে ডাকে পপলুকে। সুন্দর শাপলা দিঘির ঘাট, মাছ কিলবিল করে অজস্র।

বাসার কাজের ছেলে আলীকে দিয়ে একটি বড়শি তৈরি করালো পপলু। মঞ্জুরকে বললো একদিন: চল্ মঞ্জুর, শাপলা দিঘিতে মাছ ধরে আসি।

: শাপলা দিঘিতে মাছ ধরা!

চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করে মঞ্জুর: না বাবা, ওখানে কে মরতে যাবে?

সাথি না পেয়েও দমে না পপলু। সে যাবেই শাপলা দিঘিতে। নিজ চোখে দেখতে চায়, সত্যিকারের কিছু সেখানে আছে কিনা।

পপলুর আম্মা ও মামি যখন আছরের নামাজে দাঁড়িয়েছেন, সেই সুযোগে ছিপ হাতে পপলু দিল এক দৌড়! আলীকে দিয়ে আগেই মাছের আধার তৈরি করে রেখেছিল।

শাপলা দিঘিতে এসে দেখে একটি ছাগল সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে পানি খাচ্ছে চোঁ চোঁ করে।

যা হোক, একজন সাথি পাওয়া গেল। ...যা নির্জন আর নীরব কি না! আসবার আগে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি পপলু। কিন্তু পপলুকে দেখে পানি খাওয়া বন্ধ রেখেই ছাগলটা সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে দিল দৌড়।

: যা, চলে গেল! আক্ষেপ করে বলে পপলু। বিকেলের উজ্জ্বল দিন এখানে আবছা হয়ে গেছে। পারের তাল, নারকেল, আম, জাম, জামরুল আর কৃষ্ণচূড়ার ডাল জড়াজড়ি করে পুকুরের ওপর ঝুঁকে আছে। পুকুরের কালো পানিকে আরো ঘন কালো করে তুলেছে। নিথর পানির বুক হঠাৎ কেঁপে ওঠে। এঁকে বেঁকে ঢেউ খেলে যায়। চমকে ওঠে পপলু। কী একটা এঁকে বেঁকে চলেছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখে সাপ! মিশমিশে কালো একটা সাপ!

www.pathagar.com

পপলুর ভেতরটা শিরশির করে ওঠে। কিলবিল করে এগিয়ে গিয়ে এক সময়ে একটা শাপলা ফুলের নিচে গিয়ে লুকায় সাপটা।

যাকগে! পপলু নিজের কাজে মন দেয় এবার। মাছের টোপ গেঁথে পানিতে বড়শি ফেলল।

কালো বেড়ালের ছদ্মবেশে ভূত

ছিপের দিকে চোখ রাখে পপলু। ফাতনাটা আবছা দেখা যাচ্ছে। মাকে বলে আসে নি বলে খারাপ লাগছে পপলুর। অথচ বললে কি আর তিনি আসতে দিতেন? আম্মা যে কেমন! সাড়ে আট বছর বয়স হলো পপলুর, তাও কেবল চোখে চোখে রাখা! টুকু, মতি, মঞ্জুরদের আম্মারা তো ওদের চোখে চোখে রাখেন না!

না কোনো মাছ তো ধরছে না বড়শিতে! ওদিকে কখন যে সন্ধ্যা নেমে এসেছে খেয়াল করাই হয় নি। তবু অপেক্ষা করে পপলু। কেমন যেন নেশায় পেয়েছে তাকে। গতকাল রহমত ভাই বলেছিল,এখানে এই শাপলা দিঘির ঘাটে বসেই ব্যথায় ছটফট করেছিল তার শফিক মামা!

www.pathagar.com

চকিতে সামনে তাকালো পপলু। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন ও জমাট হয়ে উঠেছে। পুকুর পারের সারি সারি গাছগুলোকে ঝাঁকড়াচুলো দত্যি দানবের মতো দেখাচ্ছে। পপলুর বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন জমে বরফ হয়ে যায়।

ঝাঁকড়া গাছের মাথার ওপর সাদা মতো ওটা কী?

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল পপলু। নিশ্চয় সেই শফিক মামার ভূতটা!

কী রকম দেখতে? কাঁপা বুকে পিট পিট করে তাকালো পপলু। কিন্তু, কোথায়? নেইতো! শূন্যে মিলিয়ে গেল যে ওটা! কারণটা বুঝতে দেরি হলো না পপলুর। তার পকেটে ভূত সরাবার যন্ত্র লোহা আছে না? সেজন্যেই তো ছুটে পালিয়ে গেল ভূতটা! মনে মনে খুব সাহস পেল পপলু। পেল বলেই পপলুর এবার আক্ষেপ হলো। যাঃ! কেন চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম? তা না হলে ভূতটা—দেখা যেত! দূর! কী বোকামিই না করেছি! যদিও বুকের ভেতরটা কেমন ঢিবির ঢিবির করছে, তবুও পপলু এবার চোখ দুটো ভালভাবে খুলে এদিক ওদিক তাকায়। না মিশমিশে অন্ধকার ছাড়া কিছুই তার নজরে পড়ে না। ভূতটা— সেই শফিক মামার ভূতটা। বিরাট মাথায়ালা, বিকট তার শরীর। এক নজর শুধু দেখেছে পপলু। ওহ কী ভয়ঙ্কর মুখ! রাত হয়ে গেছে। উঠতে গেল পপলু। রহমত ভাই বলেছিল সেই ভূতটার হাতের আঙুলগুলো ছিল সাঁড়াশির মতো বাঁকা ও শক্ত। শফিক মামার গলায়, কাঁধে, সারা শরীরে তা চেপে ধরেছিল।

পপলু অনুভব করে তার কাঁধ দুটো যেন পাথরের মতো ভারি হয়ে যাচ্ছে। দুটো শক্ত সাঁড়াশি হাত যেন তাকে চেপে ধরেছে। ব্যথা না পেলেও বুকের ভেতর অসহ্য একটা দাপাদাপি অনুভব করে পপলু।

তারই মতো নাকি দেখতে ছিল তার শফিক মামা। তাকে নিশ্চয় তার শফিক মামা মনে করেছে সে অদৃশ্য ভূতটা। ... তাইতো, ঠিক কাঁধের ওপরইতো সেই ভূতের হাত দুটো চেপে বসেছে। ঃ ও মাগো! ও আল্লাগো! পপলু পড়িমরি করে বাড়ির দিকে ছুটল প্রাণপণ বেগে।

এদিকে এতক্ষণ পপলুর আম্মা রাগে ফুলছিলেন। ছেলের খোঁজে পাড়াতে লোক পাঠিয়েছেন, নিজেও দু এক বাড়ি ঘুরে এসেছেন। মাঝে মাঝে ভাবনায় ও ভয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক এমনি সময় ঝড়ো হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকল পপলু। মায়ের সমস্ত রাগ মুহূর্তে গলে পানি হয়ে গেল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, কী হয়েছে বাবা অমন করে কোত্থেকে ছুটে এলি?

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথার জবাব দিতে পারে না পপলু। ...তারপর যখন প্রকৃতিস্থ হলো বলল, না! কিছু না। এই, না, এই মানে কিছু না আম্মা।

: কিছু না, কিছু না মানে কী?

পপলুর আম্মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবার তাকালেন তাঁর দিকে। কী হয়েছিল? কোথায় গিয়েছিলি খুলে বলো শিগগির!

এই সেরেছে! তাই কি কখনো বলা যায়? পপলু তাই মাথা নিচু করে বসে থাকে নীরবে। কিছুতেই মুখ খোলে না।

ঠাস করে তার গালে এক চড় মেরে বলেন আম্মা, ঃ আর কোনোদিন আমাকে না বলে বাড়ির বার হয়েছ কী মজা দেখাবো তোমায়। বাঁদর, দুষ্টু ছেলে কোথাকার! আম্মার মার খেয়ে মনটা খারাপ হলেও কাঁদে না পপলু। কাঁদবে কেন? সে কি বড় হয় নি? আর বড় হয়েছে বলেই না কেমন ভূতের খপ্পর থেকে অনায়াসেই বেঁচে এসেছে।

www.pathagar.com

পপলুর আম্মা ঘর থেকে চলে গেলে রহমত ভাইয়ের দিকে ফিরে ফিসফিসিয়ে বলে পপলু, বুঝলে কিনা রহমত ভাই, হ্যাঁ, আম্মাকে আবার বলো না যেন! আমি সেই শফিক মামার ভূতটার পাল্লায় পড়েছিলাম।

অ্যাঁ! কী সর্বনাশ! রহমত ভাইয়ের দু চোখ কপালে উঠে আসে। তাড়াতাড়ি দোয়া পড়ে পপলুর গায়ে ফুঁ দেয়। একলা তুমি শাপলা দিঘিত কুনদিন যাইও না বাই। শকশরা তুমার মতন কচি পোলাপানরে পাইলে ঘাড় না মটকাইয়া ছাড়ে না। তা, তুমার লগে লোহা আছিল তো? আর হেই দোয়াটা ইয়াদ আছিল নিশ্চয়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই ঠিক ছিল, সে জন্যেই তো আমার কিছুই হয় নি। মুখে বললেও সেই অদৃশ্য ভূতের সাঁড়াশির মতো আঙুলের ছোঁয়ার কথা ভুলে যেতে চাইলেও পারে না। রাত্রে ঘুমের মাঝে তাকে দেখল পপলু। দু তিনবার চেঁচিয়ে উঠল।

আট

পরদিন ভোরে পপলু ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখে বাইরের উঠানে মঞ্জুর, মতি, টুকু, টুনু সবাই এসে গেছে। কী করে যেন খবর পেয়েছে সবাই, বোধ হয় রহমত ভাইয়ের কাছ থেকে। সবাই খুব সম্মানের সাথে দেখছে পপলুকে। ভূতের খপ্পরে থেকে অনায়সে রেহাই পেয়ে আসা ছেলে। বাবা, সোজা নয়! সবাই প্রথমে মনে মনে ও পরে প্রকাশ্যে স্বীকার করল— হ্যাঁ, পপলু তাদের চেয়ে অনেক অনেক সাহসী! পপলুকে নিয়ে ওরা সেদিন নদীর তীরে সেই ফাঁকা মাঠে লুকোচুরি খেলছিল। কেউ লুকিয়েছে ঝোপের কাছে, কেউ বট গাছের পেছনে । হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে এলোমেলো বাতাস এল কোত্থেকে। ধুলা মাটি আর পাতা উড়িয়ে....

মঞ্জুরদের তীব্র চিৎকার শোনা গেল : ও বাবারে, নদীর মধ্যে ওটা কিরে! পপলু তাকিয়ে দেখে, পানির ওপর বিরাট এক পানির জ্বিন সোজা খাড়া হয়ে আছে। তার লম্বা জিবটা লকলক করছে। দেখে ভয়ে পপলুর বুক কেঁপে ওঠে। সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। মঞ্জুর, মতিরা যে কে কোন দিকে দৌড়াচ্ছে ঠিক বুঝতে পারে না পপলু।

সেই পানির জ্বিনটার নিঃশ্বাসের শব্দ হচ্ছে...শিঁ শিঁ... সোঁ সোঁ...! একটানাভাবে। হঠাৎ সে নিঃশ্বাসের শব্দ তলিয়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর বাজখাঁই একটা শব্দ প্রকট হয়ে ওঠে। : ওরে তোরা কই আছসরে! শিগগির আমার পিছনে পিছনে আয়!

কণ্ঠস্বর কাছে এগিয়ে এল। দেখা গেল জুম্মার দাদি। পপলুরা তো অবাক! দাদিকে দেখে ওদের ধড়ে যেন প্রাণ ফির এল।

ওর পেছনে পেছনে এবার ছুটছে সবাই। তার ঘর অবধি পৌঁছতে গিয়ে কতবার যে দাদি আছাড় খেল, ব্যথা পেল সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। ছুটতে, ছুটতে, পড়তে, পড়তে আঁকড়ে ধরছে কখনো কোনো গাছের ডাল, কখনো বা কোনো বাড়ির বেড়া।

হঠাৎ একটা ভাঙা টিনের টুকরা বিঁধে গেল দাদির পায়ে। উঃ বলে বসে পড়ল মাটিতে। ব্যথা পেয়েছে খুবই। কিন্তু ব্যথা চাপা দিয়ে টিনের টুকরাটা টান দিয়ে বের করে ফেলে দিয়ে আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল। তোদের দেহি আক্কেল পছন্দ একেবারেই নাইগা ! দিনকাল খারাপ! কাল বৈশাখ্যার সময়। জানস্ না তোরা? এমুন দিনে ঘর থাইক্যা বাইর হইতে হয়? কেমুন সব পোলাপান! বেকুব, ও বেবুজের দল! এই বুঝ আছিল না বইলাই না একজন পানিতে ডুব্যা মরল! পানির আইজর‍্যা জ্বিনে টাইন্যা নিল ওরে!

www.pathagar.com

বলতে বলতে গলার স্বর বুজে এল জুম্মার দাদির। কিছুক্ষণ নীরব থেকে চোখের পানি মুছে নিয়ে বলল, আইজ সব কয়টা একসাথে গেছলো পানির দেওয়ের হাতে জানটা দিতে। মরলে কী উপায়ডা হৈত!

ঘরে নিয়ে তাদের গা মাথা মুছে দিল নিজের হাতে, টিন থেকে মুড়ি নামিয়ে খেতে দিল গুড় দিয়ে।

দাপট দেখিয়ে সেই দৈত্যটা চলে গেলে ছেলেরা দাদির ঘর থেকে বের হয়ে যে যার ঘরের দিকে ছুটলো।

ঝড়ো কাকের মতো হয়ে বাড়ি ফিরে মা- বাবার কাছে সেদিন যথেষ্ট বকুনি খেল পপলু। পপলুর বলতে ইচ্ছে হলো ঝড় না, পানির জ্বিন এসেছিল। ইয়া লম্বা, মস্ত বড় তার জিব! কিন্তু তাঁদের কাছে তা বলা যাবে না। তাহলে বকুনির পরিমাণ যে আরো অনেক বেড়ে যাবে।

নয়

গ্রামের ছেলেরা পপলুকে শহুরে ছেলে বলে ভেবেছিল খুব অহঙ্কারী হবে। কিন্তু এখন দেখে, তা তো নয়! খুব মিশুক আর ভাল পপলু। সেদিন খেলা শেষে সবাই চলে গেলে মঞ্জুর আর পপলু কী যেন পরামর্শ করল। মঞ্জুর বলে: ঠিক মাঝরাতে দেখা যায় ওকে।

ঃ মাঝ রাতে! কিন্তু তখন তো কিছুতেই যাওয়া যেতে পারে না।

ঃ আমিও পারব না। ....না, না, ভয়ের জন্য নয়, আমার আব্বা আম্মা শুনলে আর রক্ষে থাকবে না! মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মঞ্জুর।

পপলুও জানালো তার মা বাবাকে না জানিয়ে সে এক পাও কোনোদিকে বাড়াতে পারবে না।

: তাহলে উপায়? প্রশ্ন করে মঞ্জুর।

: উপায় আর কী? শুনেছি ভরা দুপুর বেলাতেও আজকাল দেখা দেয় অনেক সময়। তবে ভেট কিছুটা বেশি দিতে দিতে হয়।

...কী ভেট দেবে ওরা?

দু জনে বসে অনেকক্ষণ যুক্তি করল। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত করল পপলু, সে তার প্রাইজ পাওয়া সুন্দর দুটো কাপ যা সে কোনো দিনই কাছ ছাড়া করে নি, তাই দিয়ে দেবে।

পরদিন সকালে পড়াশোনার পর দু বন্ধু কাউকে কিছু না বলে অভিযানে বের হয়ে গেল। আলের ওপর দিয়ে প্রায় মাইল চারেক হেঁটে পরীর জাংলার সীমানায় পৌঁছে গেল । ঢুকে পড়ল জঙ্গলে।

নানান রকম গাছ পালা। ছোট ছোট কাঁটা ঝোপ সরিয়ে পথ করে নিল ওরা। হাতে কাঁটা বিঁধল, হাত ও পায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেল কয়েকবার। পপলু তার পিঠে ঝুলানো ব্যাগ একটা ছুরি বের করে তা দিয়ে সামনের গাছ ও ঝোপের কিছু ডাল পাতা কেটে পথ করে নেয়। এমনিভাবে বেশ কিছুটা এগিয়ে ওরা একটা সরু পায়ে চলা পথ দেখতে পেল।

এরপর দু জনেই দৌড়াতে শুরু করে। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়। আবার ফিরতে হবে তো খাবারের সময়ের আগে! দৌড়াতে দৌড়াতে হয়রান হয়ে এক সময় বলে পপলুঃ চল্ মঞ্জুর, বসি কোথাও! বসে কিছু খেয়ে নেয়া যাক্! আমি ব্যাগে কিছু আটার রুটি ও গুড় এনেছি।

পপলু খেতে খেতে বলে, আম্মাকে বলে আসিনি। সেজন্যে খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু বললে কি আসতে দিতেন আম্মা? কখনও না !

: হ্যাঁ, জানলে আমার আম্মাও আমাকে আসতে দিতেন না।

www.pathagar.com

: ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তো আর মিথ্যে বলতে পারব না! তখন হয়তো মার খেতে হবে । তা খেলামই বা মার! কি বলিস ?

ঃ ঠিক বলছিস তুই! মঞ্জুর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চল, এবার ফের রওয়ানা দেয়া যাক্ ! ওরা হাঁটতে হাঁটতে একদম গহিন জঙ্গলে এসে পৌছালো। এই দুপুরেও, চারিদিকে আবছা অন্ধকার! সামনে বহু পুরানো বাড়ি। দালাল কোঠা ভেঙে ইট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। চারদিকে নীরব, নির্জন। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে অনবরত ! বাড়ির ভাঙা দেয়ালে গাছ লতায় ছেয়ে গেছে। ভাঙা ইঁটের ওপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সড়াৎ সরে করে গেল মঞ্জুর। একটা লিকলিকে সাপ বেরিয়ে আসছে ইটের নিচ থেকে। পপলু একটা ইট তুলে নিয়ে জোরে ছুড়ে মারল সাপটার দিকে। এক তাকেই সাপটা খতম হয়ে গেল।

মঞ্জুরের কিন্তু তাতে মন খারাপ হয়ে যায়। নাহরে পপলু, পুরোনো বাড়ির এ সাপটাকে মেরে ঠিক করিস নি! এরা বাস্তুসাপ, বাড়ি ঘরে থাকে। এদের মারলে নাকি ক্ষতি হয়।

: রাখ তোর ক্ষতি হয়! কামড়ে দিলে খুব লাভ হতো, না? পপলু রীতিমত চটে গেছে।

ঠিক এমনি সময়ে ওদের চমকে দিয়ে ফ্যাসফেসে গলার একটা বিদঘুটে স্বর তাদের কানে এসে পৌছে। মনে হয় কোনো শ্বাসনালি কাটা মানুষের স্বর ওটা। তোমরা কারা? কেন এসেছ?

ওরা সামনে তাকালো। বুকটা কেঁপে উঠল দু জনের। হাত শক্ত মুঠিতে ধরে রেখেছে। কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না, স্বরটা ভেসে আসছে ভাঙা দালানটার একটা কামরার ভেতর থেকে।

: কী চুপ কেন? কে তোমরা? কেন এসেছ? আবার শোনা যায় সে স্বর।

মঞ্জুর ঢোক গিলল। পপলু আমতা আমতা করে বলল, আ.....আমরা স্কুলে পড়ি, ক্লাস ফোরে পড়ি। রাজকুমারীকে দেখতে এসেছি।

: টাকা এনেছ?

: না, টাকা আনি নি। তবে আমার প্রাইজ পাওয়া দুটো কাপ এনেছি। কাঁপাঁ কাঁপাঁ কণ্ঠে বলল পপলু।

: আর আমি ক টা পেয়ারা এনেছি। মঞ্জুরের স্বরটাও ভীষণ কাঁপছে।

: তাহলে পুরো রাজকুমারীকে তোমরা দেখতে পাবে না কিন্তু!

ঃ হ্যাঁ, তাই দেখব আমরা।

ঃ তবে কাপগুলো বারান্দায় রাখ! রেখে, চোখ বন্ধ কর! ওরা সেই কণ্ঠস্বরের কথামতো কাজ করল।

আবার শোনা গেল সেই ফ্যাসফেলে স্বর।

'ঃ হ্যাঁ, চোখ বন্ধ কর !... হ্যাঁ, অমনি করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক, দুই, তিন! তাকাও ! তোমাদের পেছন দিকের গাছের ওপরে তাকাও! দু জনেই তাকিয়ে আঁতকে উঠল! গাছের ওপরে একটা ডালের ফাঁকে আটকে আছে রাজকুমারীর কাটা মুণ্ডুটা! চোখ বন্ধ! স্থির একটা মুণ্ডু! গলায় রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে বাদামি হয়ে আছে। মনে হলো বেশ কিছুদিন আগে রাজকুমারীর শরীর থেকে মাথাটা আলাদা করা হয়েছে।

ঃ বাস্ বাস্ ফের চোখ বন্ধ কর! করে যে পথে এসেছিলে ঠিক সেই পথে চলে যাও!

ওরা তখনই ছুটতে শুরু করে। বুকের ভেতর যে কাঁপুনি উঠেছে, তার শব্দ যেন বাইরে থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে!

ঃ থাম! হঠাৎ সেই কণ্ঠ রূঢ়-কঠোরভাবে আদেশ শোনা যাচ্ছে! শোনো যা দেখেছ, সাবধান! কাউকে তা বলতে পারবে না! বললে চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মনে থাকে যেন!

www.pathagar.com

ঃ না, বলব না, শুধু আম্মাকে বলব!

ঃ না, আম্মাকেও না! আজকের দেখা রাজকুমারীর কথা কাউকেই বলবে না।

ঃ আর শোনো! এরপর কোনোদিন যদি ফের রাজকুমারীকে দেখতে আস, তবে কম পক্ষে একশ টাকা নগদ নিয়ে এসো । ওসব পেয়ারা বা কাপটাপে হবে না। এবার যাও!

পপলু ও মঞ্জুর রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে কখন যে লম্বা পথ পার হয়ে এসেছে! এসে পপলুদের উঠানে ধপ করে বসেছে খেয়াল নেই। ওদের দেখে আম্মা ও হিরণমামা কাছে এলেন।

'আজব্যা পুকুর' ঘাটে ভূতের কবলে পপলু

ঃ এ্যাই বাঁদরেরা! কোথায় টো টো করে ঘোরা হচ্ছিল? এ্যাঁ?

ঃ কোথায়? মানে, বহুদূর!

পপলুর কথার ধরন দেখে মঞ্জুর ভয় পেয়ে যায়। যদি পপলু রাজকুমারীর কথা বলে ফেলে? তবে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে! তাই সে তাড়াতাড়ি কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলে,

ঃ আমরা পাখির বাচ্চা যোগাড় করতে গিয়েছিলাম, ওই দূরের জঙ্গল থেকে।

ঃ দূরের জঙ্গল থেকে!

www.pathagar.com

আম্মা রীতিমত ভয় পেলেন। জঙ্গলে গিয়েছিলি পপলু! তোকে না আমি মানা করেছি বন-জঙ্গলে কখনো যাবি না! সাপ খোপ থাকে! ঠিকই বলেছেন আম্মা। একটা সাপ তো পপলু মেরেই এসেছে! কিন্তু তা তো বলা যাবে না! তাই সবাইকে এড়াবার জন্য পপলু সহজতম পথ ধরে। : আর যাব না আম্মা! বিরক্তঝরা কণ্ঠে আম্মা বলেন, যাও এবার গোসল করে এসো! খেতে হবে না? নাকি পাখির বাচ্চা কাঁচাই খেয়ে এসেছ দু জনে? মঞ্জুর, তুমিও গোসল করে খেয়ে, তারপর বাড়ি যাও । খাবার পর মঞ্জুর তাদের নিজেদের বাসায় চলে গেল।

বিকেলে মতি ও টুকুরা এসে বলল : আজ সকাল থেকে তোদের পাত্তা নেই! কোথায় গিয়েছিলি রে তোরা? আমাদের কিছু বলে যাস নি যে!

পপলুদের তখন যা অবস্থা কিনা! ভরা কলসির পানির মতো উপছে পড়তে চাইছে ভেতরের সব কথা! নতুন অভিযানের নতুন এক অভিজ্ঞতা! অথচ বলবার উপায় নেই!

মঞ্জুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল ঃ ওই জঙ্গল থেকে পাখির বাচ্চা আনতে গিয়েছিলাম। পপলু কিছু বলে না। খেলা শেষে ওরা চলে গেলে পপলু মঞ্জুরকে বলে,

ঃ হ্যাঁরে, রাজকুমারীর মাথাটা কেমন মাটির তৈরি মনে হচ্ছিল না? ঠিক যেন প্রাণ নেই।

মঞ্জুরেরও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু শুনেছে, বিশ্বাস হারাতে নেই। তাতে নাকি ভীষণ বিপদ হয় ! তাই শুধু বলল,

ঃ মনে হলে কী হবে! আসলে ওটা রাজকুমারীরই কাটা মাথা ছিল। সে যাক গে! ও বিষয় নিয়ে আর কথা বলিসনে! কোথায় কার কানে যাবে, তখন ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের ! হয়ত চোখ নষ্ট হয়ে, নয়ত পা নুলো হয়ে যাবে! শুনেছি ওরকমই হয়! পপলু চুপ করে থাকে।

দশ

ঠিক পরের দিন রাতেই একটা ঘটনা ঘটে। আমাবস্যার গভীর রাত। চারদিক নীরব ও থমথমে। কোথাও এতটুকু আলো নেই। গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর, খেত-খামার সব যেন আলকাতরায় লেপটে রয়েছে। টুকুদের টিনের ঘরে জমাট বাঁধা ঘুটঘুটে অন্ধকার। টুকু হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। 'দাঁড়া আসি' বলে সোজা দরজার হুড়কো খুলে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করে। এদিকটায় জঙ্গল রয়েছে বলে টুকুর মা টুকু, টুনু বা তাদের বন্ধুদের যেতে দেন না। অথচ আজ এরকম অন্ধকারের মধ্যে টুকু একাই সেদিকে চলল। কিন্তু বেশিক্ষণ তার চলার ক্ষমতা রইল না। বাঁশঝাড়ের মোটা একটা গুঁড়ির সাথে ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। একটা তীব্র চিৎকার, খিঁচুনি আর গোঁ গোঁ শব্দের পরই অচেতন হলো টুকু।

চিৎকার শুনে টুকুর মা জেগে গেলেন, বিছানা হাতড়ে বুঝলেন টুকুর জায়গাটা খালি।

: টুকু! টুকু! কোথায় গেলিরে বাবা? বলে তাড়াতাড়ি কুপি জ্বালিয়ে ছোট ছেলে টুনুকে ডাকলেন। তারপর কুপি হাতে সেই তীব্র চিৎকার লক্ষ্য করে, বাঁশঝোপের দিকে ছুটে চললেন। সাথে সাথেই পাশের বাসার পপলু, তার আম্মা, রহমত ভাই, হিরণ মামা ও মামি চলে এসেছেন।

ছেলের এই হাল দেখে টুকুর মা জয়নাব বানু ডুকরে কেঁদে উঠলেন। পাঁজাকোলা করে তাকে ঘরে আনলেন, মাথায় অনেকক্ষণ ধরে পানি ঢালা হলো। পায়ে হাতে গরম তেল মালিশ করার পর টুকুর হাতপা ছোড়া বন্ধ হলো। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এল। পপলুর বুকে একটা ব্যথা ও ভয়ের ঢেউ

www.pathagar.com

ছলকে ওঠে। তার বার বার মনে হতে থাকে, গতকাল রাজকুমারীরকে মাটির পুতুল ভেবে বিশ্বাস হারিয়েছিল বলে আজ এই দুর্ঘটনাটা ঘটল। তাদের দলের সবচেয়ে নরম ও শান্ত ছেলেটার ক্ষতি হলো!

এদিকে সবাই উদগ্রীব। জানতে চায় টুকুকে ওখানে কে নিয়ে গিয়েছিল । টুকু বলল,

ঃ আমি ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমের মধ্যে শুনি ওপাড়ার আলী এসে আমাকে ডাকছে-টুকু! এ্যাই টুকু! ওঠ্-ওঠ্ উঠে চলে আয়! আমি ঝট্ করে উঠে দরজা খুলে হাঁটতে শুরু করি। আলী লাফিয়ে লাফিয়ে আমার চেয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমি-ওর পেছন পেছন ছুটতে থাকি। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই। আর কে যেন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে! তারপর আর আমার কিছুই মনে নেই।

টুকুর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। রহমত ভাই বিড়বিড় করে দোয়া পড়ে টুকুর গায়ে ও বুকে ফুঁ দেয়। তাকে পানি পড়াও এনে খাওয়ানো হলো।

ক দিন কেটে যায়। আবারও এক রাতে টুকু ঘুমের ঘোরে উঠে দরজার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। সেদিনের মতো খিঁচুনি হয়, গা কাঁপতে থাকে, তারপরেই অজ্ঞান হয় সে। আজো মা জেগে যান। টুকুর মাথায় পানি ঢালেন। অল্পকক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসে। খবর শুনেই পপলু ছুটে আসে। মতি, মঞ্জুর ওরাও এসেছে। পপলু টুকুর পায়ে হাতে গরম তেল মালিশ করে দেয়। মায়ের মনে দারুণ ভয়! নানান ভাবনা!

টুকুর বাবা মারা যাবার পর, মাত্র ছ মাস হলো তিনি টুকু ও টুনুকে নিয়ে গ্রামে এসেছেন। এসে বহু রকম অসুবিধায় পড়ে গেছেন। কিন্তু এ রকম ভয়ঙ্কর অবস্থায় যে পড়তে হবে, তার আদরের টুকুকে নিয়ে গাঁয়ের ভূত পেতনিরা যে টানাটানি শুরু করবে, তা ভাবেন নি কোনোদিন। রহমত ভাই বলে, নিশ্চয় কোনো জ্বিন বা পেতনি আইয়া টুকু ভাইরে ডাকে।

টুকুদের বাসার কাজের বড় ছেলেটা ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। পাশের দু বাড়ির পুরুষেরা আগেই কোনো কাজে শহরে গেছেন। হিরণ মামা তাই একজন ভাল ডাক্তার ডেকে আনার জন্য সেদিন সকালেই শহরের দিকে রওয়ানা দিলেন।

এদিকে কোত্থেকে এক ভূতের ওঝা এসে হাজির! এসে বলে, এইতা কাম হইল আমরার। আমরা ভূত পেতনি খেদাই। আমরারে লোকে ওঝা কয়। ডাক্তার ডাইক্যা টেকা দিলে কী হৈব?

ওঝা অল্প বয়সের। ঝাঁকড়া লম্বা চুল, ঘন দাড়ি। পাকানো গোঁফ। টকটকে লাল রঙের আলখাল্লাতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সে এসে গোবর পানি ছিটিয়ে টুকুদের উঠোনটা লেপিয়ে নিল। লেপা জায়গায় গোল করে রেখা টানলো। মধ্যে বড় একটা মাটির পাতিল রেখে, তাতে আগুন জ্বালিয়ে ধূপ ছিটিয়ে দিল। টুকুকে আগুনের খুব কাছে এনে বসানো। ভয়ে টুকুর মুখটা শুকিয়ে গেছে। তার ওপর যখন ওঝা ওর হাত দুটো পেছন দিকে নিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল, ভয়ে ও ব্যথায় টুকু চিৎকার করে ওঠে।

ঃ অ আম্মা, আম্মাগো! আমাকে বাঁধছে কেন? উহুঁ হু, বড্ড লাগছে! ব্যথা পাচ্ছি!

এতে ওঝার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। ঝাঁকড়া চুল নেড়ে বলল,: চুব অ ব্যাটা! র, তরে শায়েস্তা করতাছি! জ্বালানো আগুনের মধ্যে ওঝা সরষে ছিটাতে থাকে। সরষে পোড়ার একটা ছিটছিটে শব্দ হয়। এক এক মুঠো সরষে সে আবার টুকুর গায়েও ছিটাতে থাকে। ছিটায় আর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে।

"ভূত-পেতনি, শাঁখচুন্নি
দত্যি দানোর ছা,

www.pathagar.com

বাপ্ বাপ্ বাপ্ কইরা ইবার
ছুইট্যা চইল্যা যা!"

ওঝা মন্ত্র পড়ে, আর 'যা, যা, যা!'বলে চেঁচিয়ে ওঠে, সাথে সাথে তার বড় থ্যাবড়া হাত দিয়ে মাথায় চাঁটি মারে। টুকু যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে।

রাজকুমারীর কাটা মুণ্ডু

টুকুর মা দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। কী করবেন ঠিক বঝে উঠতে পারেন না। ব্যথায় মুখটা তার করুণ দেখাচ্ছে।

গাঁয়ের লোক উঠোনের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ভূত তাড়ানো দৃশ্য দেখবার জন্য তাদের চোখ চকচক করছে। ওঝা টুকুর মাকে উদ্দেশ্য করে বলে, আপনে একটুও চিন্তা করবাইন না। অহনি

www.pathagar.com

আমি টুকু মিয়ার উপর থাইক্যা জ্বিনের আছর ছাড়াইয়া দিতাছি। আছরের ওক্তের আজানের আগেই দিতাছি। এই বলে টুকুর পিঠে খুব জোরে আঘাত করে। প্রথমে হাত দিয়ে, পরে ঝাঁটা দিয়ে। সেই সাথে ভীষণ গলাফাটা গর্জন।

ঃ ক, ক , হারামি! টুকু মিয়ার কান্ধ থাইক্যা নামবি কিনা ক! টুকু চেঁচাতে থাকে। ঃ অ আম্মা, আম্মাগো! তুমি দেখছো না গো! আমাকে যে মেরে শেষ করে ফেলল!

ভিড়ের মধ্যে থেকে দু চারজন লোক সরে যায়। টুকুর কান্না তাদের সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু কয়েকজন আবার ওঝাকে উৎসাহিত করে, দেইন ভাই, আচ্ছা কইরা দেইন শয়তানডারে। আমরার মমিনসিংয়ের গই গেরামে আর যাই হুউক, শকশরার আছর নাই। কাজেই এরে যেভাবে হউক, খেদানি লাগব।

ঃ হ, তা করণ লাগব। বেতমিজডা কিল, চড় ও হাছুনের বাড়ি খায়্যাও নামতাছে না। এইবার লোহার শিক পুইড়া ছেঁকা দেওন লাগব। লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল ওঝা, ঃ আমার মনে হইতাছে এইডা জ্বিন না। একটা খবিছ পেতনি, টুকু মিয়ারে ভর করছে। হেই পেতনিডার মনে অয় পুলাপান নাই। হের লাইগ্যাই—

ঃ হ মিয়া, খেদাইন! খেদাইন! শীগরি পেতনিডারে খেদাইন! অনেকেই একসাথে বলে ওঠে। পপলু ভাবে ওদের কি একটুও মায়া মমতা নেই? হঠাৎ পপলু সাহস করে ভিড় ঠেলে ওঝার কাছে চলে এল। বলল, ওভাবে টুকুকে কষ্ট না দিয়ে খুব জোরে জোরে মন্ত্র পড়ে পেতনিটাকে তাড়ানো যায় না?

ওঝা তাচ্ছিল্যভরে একবার পপলুর দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত নেড়ে বলল, তফাত যাও! পেতনি তুমারে শুদ্ধা ভর কইরা বইব! এরারে তুমি অতই সিধা মনে করছ ?

ওঝা লোহার একটা শিক গরম করতে থাকে । শিকের সামনের অনেকটা অংশ লাল হয়ে উঠেছে। লোকদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। কী হয়! গরম শিকের ছেঁকা খেয়ে পেতনিটা না জানি কেমন করে টুকুকে ছেড়ে যাবে! ছাড়ার সময় নাকি ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজ হবে।

ওঝা লাল গনগনে শিকটা নিয়ে যেই না এগিয়ে গিয়ে টুকুর পিঠের শার্ট তুলেছে, টুকু ভয়ে গলাফাটা চিৎকার করে। অ আম্মা, আমার আম্মাগো ! তুমি আমাকে বাঁচালে না গো!

আর থাকতে পারেন না জয়নাব বানু। পাগলের মতো ছুটে এলেন। ছেঁকা দেবার আগেই চিলের মতো ছোঁ মেরে টুকুকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, থাক, এভাবে ভূত তাড়াবার দরকার নেই!

পপলু ছুটে এসে টুকুর পাশে দাঁড়ালো। বলল, ও খাল্লাম্মা, আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন! অন্যদিকে লোকেরা হা হা করে।

ঃ করে কী! করে কী! এ্যা! পেতনিটারে ছাড়াইতে হইব না? কোনো কথা না বলে জয়নাব বানু ছেলেকে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। পপলুও ভেতরে গেল। যারা সেখানে ছিল, তারা টুকুর আম্মাকে ঠাট্টা করল, ভয় দেখালো। মুরব্বি ক জন আবার ধমকাধমকিও করল। কামডা বালা অইল না খাঁয়ের বেডি! তুমার পুলার পেতনি অহন হারা গেরামের পুলাপানের কান্ধে ভর করব। এইডারে এহেবারে খেদানির কাম আছিল।

ওঝা ভয়ানক রেগে গেছে। তার লাল চোখ যেন ঠিকরে বের হতে চায়। অদৃশ্য কারো কাছে যেন মাফ চাচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে দু হাত জোড় করে সে বিড়বিড় করতে থাকে.

"দুষ না নিও দোহাই তুমার
ভূত পেতনির ঝি!
পুলার মায়ে বেবুঝ হইলে
করমু আমি কী?"

www.pathagar.com

ওঝা চলে গেল। নিজের জন্য ওঝা কোনো টাকা-পয়সা নিল না। কিন্তু ভূত পেতনি ও জ্বিনদের কিছু কিনে দেবে বলে পঞ্চাশটা টাকা নিল জয়নাব বানুর কাছ থেকে।

যাবার সময় তাকে বলে গেল যে, সে পেতনিটাকে তাড়াবার জন্য 'শিক চালান' দেবে। টুকু ভাল হয়ে গেলে সেই পেতনির নামে আরো এক শ টাকা দিতে হবে।

দেউড়ির কাছে গিয়ে ওঝা ফের ফিরে এসে জানিয়ে যায় যে, যেদিন পেতনিটা টুকুকে একেবারে ছেড়ে যাবে, সেদিন দেখা যাবে ওদের বাড়ির কোনো একটা আস্ত কলাগাছ মাটিতে পড়ে আছে। নয়তো ঘরের কোনো মাটির কলসি আপনা আপনিই ভেঙে পড়ে থাকবে।

সবার রাগ, বিরক্তি ও বদ দোয়া কুড়িয়ে ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে অমঙ্গলের ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে বসে থাকেন টুকুর মা। তাঁর দু গাল বেয়ে পানি ঝরছে। মনে মনে কেবল আল্লাহকে ডাকছেন। দু চারজন পড়শি ছাড়া সবাই চলে গেছে।

পেতনির ভর করা বাড়িতে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা উচিত না। ওদের ভয়, কে জানে আবার কী হয়ে যায়! প্রত্যেকের ঘরে ছোট ছেলেমেয়ে আছে। এমন সময় হিরণ মামা শহর থেকে ডাক্তার সাথে নিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। ডাক্তার সাহেব টুকুর বুক, পিঠ,জিভ, গলা সব পরীক্ষা করলেন। রোগের লক্ষণ দেখে বললেন, এর এপিলেপসি অর্থাৎ মৃগীরোগ হয়েছে।

ঃ এ আবার কোন ধরনের অসুখ ডাক্তার সাহেব? টুকুর মায়ের প্রশ্নর জবাবে ডাক্তার সাহেব বললেন,: এ এক রকম ব্রেনের অসুখ। এটা হলে রোগীর হাত পা কাঁপতে থাকে, খিঁচনি হয়, এক সময় রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। শরীর শক্ত হয়ে যায়। কোনো কোনো রোগী আবার ঘুমের ঘোরে বিছানা ছেড়ে হাঁটতে শুরু করে। তারপর কোনো কিছুতে ধাক্কা খেয়ে এমনিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

ঃ হ্যাঁ, টুকুরও তাই হয়েছিল। বলেন টুকুর আম্মা।

ঃ এই যে ঘুমের ঘোরে উঠে হাঁটা, একে দেশী মতে বলে, নিশি পাওয়া। ডাক্তার সাহেব এবার জয়নাব বানুর দিকে ফিরলেন।

ঃ যাহোক, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আপনার ছেলের অসুখ হয়েছে, ইনশাল্লাহ ভাল হয়ে যাবে। আপনি আমার প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী ঠিক মতো ওষুধ খাইয়ে যাবেন, আর খুব যত্ন নেবেন।

ঃ ছেলে আমার সম্পূর্ণ সেরে উঠবে তো ডাক্তার সাহেব?

ঃ হ্যাঁ সারবে। তবে সম্পূর্ণ সেরে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। ইতিমধ্যে তার পড়াশোনা ও খেলাধুলা সাধারণ ভাবেই চলবে। তবে হ্যাঁ, সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। অজ্ঞান হলেই তাড়াতাড়ি যাতে জ্ঞান ফিরে আসে, সে চেষ্টা করবেন। দেখবেন দাঁতে দাঁত লেগে যেন জিভ কেটে না যায়। আর রাতে ঘুমের ঘোরে কোনো পুকুর বা ডোবাতে গিয়ে না পড়ে। খুব সাবধান! ডাক্তার সাহেব সব ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে শহরে ফিরে গেলেন।

ডাক্তার সাহেবের নির্দেশ মতো ওষুধ খেয়ে সে বেশ ভাল হয়ে উঠেছে। ঘুমের ঘোরে বাইরে যায় না। ঘন ঘন ফিটও হয় না।

এগারো

পপলুর আব্বা শহর থেকে ফিরে এসেছেন।

একদিন পপলু ঘরে ফিরে দেখে তার আব্বা-আম্মা, হিরণ মামা-মামি সবাই হাসি হাসি চোখে কী যেন বলাবলি করছেন। সে এক খুশির খবর! পপলুর আব্বার চাচাতো ভাই মকবুল আহমেদের বড়

www.pathagar.com

ছেলে ওয়ারেস এবার এস. এস. সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ওই আমলিপুরা গ্রামের স্কুল থেকে তৃতীয় স্থান পাওয়া একটা সহজ ব্যাপার নয়!

ওঝার খপ্পরে টুকু

মকবুল আহমেদ খুশি হয়ে গাঁয়ের আত্মীয়- অনাত্মীয় অনেকই দাওয়াত করেছেন।

সবারই যাবার ইচ্ছে। কিন্তু মুশকিল, তাদের কলতাপাড়া গ্রাম থেকে আমলিপুরা গাঁ বেশ কয়েক মাইল দূরে। আর সেখানে যাবার রিকশা বা অন্য কোনো রকম যানবাহনের বন্দোবস্তও নেই। পথঘাটও খুব খারাপ। সে জন্যে মহিলারা কেউ যেতে পারবে না। শহর ও গ্রামে যাতায়াত করে পপলুর আব্বাও ক্লান্ত। শেষ পর্যন্ত রহমত ভাই, হিরণ মামা, মঞ্জুরের কাদের চাচা, পপলু, মঞ্জুর, মতি ও টুনু রওয়ানা দেয়।

এসে দেখে বিরাট অনুষ্ঠান! দুপুর থেকে শুরু হয়েছে খানা। শেষ হলো সন্ধ্যার ঠিক আগে । পপলুদের খেতে বেশ দেরি হয়ে গেল।

www.pathagar.com

রওয়ানা দেবার সাথে সাথেই যেন কালো পর্দা গায়ে জড়িয়ে ঝপ করে সন্ধ্যা নামে। সামনে পরীর জাংলা। তার ঠিক পাশ ঘেঁষে ফিরতে হবে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। রাতের শুরুতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাশের ঝোপঝাপ আর বাড়িগুলো কালো আঁধারে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

ওরা চলছে। লম্বা পথ। রাতও বাড়ছে। অন্ধকার পৃথিবীতে গা ছমছম করা একটা আবহাওয়া।

ঃ না, ভুল হইছে! মারাত্মক ভুল! তাড়াতাড়িতে সাথে একটা টর্চ বা হারিকেন আনা হয় নাই! আক্ষেপ করে বলে রহমত ভাই। হিরণ মামার সাথে একটা টর্চ আছে। কিন্তু তার ব্যাটারির আয়ু যে প্রায় শেষ হয়ে গেছে, তা আগে খেয়াল করে নি।

অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে রহমত ভাই বার বার হোঁচট খায়। পকেটে একটা দেশলাই ছিল। সেটা জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ পথ দেখে চলেছে। দেশলাইয়ের কাঠিও প্রায় শেষ!

: আর কিছুডা আগাইতে পারলে আচারগাঁও করিম শেখের বাড়ি। সেইখান থাইক্যা একটা বাততি লইতে পারতাম।

করিম শেখের বাড়ি লক্ষ্য করে চলেছে ওরা। বাঁ পাশে পরীর জাংলা। পপলুর সেই রাজকুমারীর কথা মনে পড়ে যায়। গলাকাটা রাজকুমারীটা যদি হঠাৎ এসে হাজির হয়! পপলু মনে মনে দোয়াটা আওড়ায়।

ভূত পেতনি দৈত্য- দানো
শাঁখচুন্নির ঝি,
সঙ্গে আছে আল্লাহ রসূল
করবি আমায় কী!

ঠিক সে সময়ে দূরে জ্বলন্ত ভাঁটার মতো দুটো চোখ ধক করে জ্বলে উঠল।

ঃ ও আল্লাগো! ওগুলো কী! ভয়ে ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে। কাদের চাচা ও হিরণ মামাও ভয় পেয়ে গেছেন। সেই আগুনের মতো চোখ দুটো একবার এ পাশ, আর একবার ওপাশে নড়তে থাকে। ঠিক যেন গলা টিপে ধরা মানুষের ঠিকরে বেরিয়ে আসা বড় বড় দুটো চোখ।

রহমত ভাই চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে। আর অনর্গল সূরা পড়ছে। হঠাৎ ভূতের সেই ভয়ঙ্কর চোখ দুটো শূন্যে মিলিয়ে গেল।

কাদের চাচার কাঁপা গলা শোনা যায়, ঃ অ রহমত চাচা, কাছে পচাগড়ের মজা পুকুরটা আছে না?

ঃ হ, তাই হৈব। নাকে বদগন্ধ ঠেকতাছে। এই মজা পুষ্কুণীটা বহুত বছর ধইরা পরিষ্কার করা হয় না।

ঃ গত বছর আমি ঠিক এখানেই এমনি ভূতের দুটো চোখ দেখেছিলাম। প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে কাদের চাচা। রহমত ভাইয়ের স্বরও নেমে গেছে।

ঃ বুজছ, এই পুষ্কুণীডা হৈল তেনাদের রান্ধনের ঘর। এইখানে তেনারা পাকশাক কইরা খায়! পেরায়ই এহানে আগুন জ্বলতে দেহা যায়। রহমত ভাইয়ের অস্ফুট স্বরটা কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেছে।

ভয়ে সবাই এ ওর হাত ধরে জটলা বেঁধে এগোচ্ছে। পপলুর বুকের ভেতরটা দুরদুর করছে। সে চোখের সামনে যেন দেখছে বিরাট এক আগুনের কুণ্ডলী। তার চারপাশ ঘিরে বসে আছে ইয়া বড় বড় দাঁতয়ালা, কপালে ভুরুর ওপর গনগনে আগুনের চোখয়ালা, লোমশ ভূত আর বিচ্ছিরি পেতনিরা। আগুনে বড় বড় মোষ, পাঁঠা, গরু-ভেড়া সব ঝলসানো হচ্ছে। আর লম্বা লম্বা জিব বেয়ে ওদের লালা

www.pathagar.com

গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ দূরে ক্ষীণ একটা আলো দেখা গেল। আলোর আশেপাশে কতকগুলো অস্পষ্ট মূর্তি। মূর্তিগুলোর মুখ দেখে ওদের বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। সর্বনাশ ! কী ওগুলো? ভূত, পেতনি, ডাইনি, না ডাকাত?

এক সময় রহমত ভাইয়ের গলার স্বর শোনা যায়, তুমরা ডরাইও না! আল্লাহ্‌র কালাম পড়তাছি। দেও জ্বিনে কুনরকম ক্ষেতি করতে পারব না।

বিশেষ ধরনের শব্দটা কাছে এগিয়ে আসছে। ওদের সাথের আলোটাও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। .... তাহলে এরা ভূত, পেতনি বা শাঁখচুন্নি নয়? ওরা শুনেছে ভূতেরা অন্যের জ্বালানো আলো সহ্য করতে পারে না। তবে?

দলটা এবার একদম কাছে এসে পড়েছে। ওদের সাথে চারটা হারিকেন। সেগুলোর আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল সব। শব্দের কথাগুলোও এবার বোঝা গেল।

ঃ হরিবল! বলহরি!

সে এক খুশির খবর

ঃ অ! মরা লৈয়া যাইতাছে শ্মশানে! আহারে! কারার লোক না জানি মরছে! রহমত ভাইয়ের স্বরটা ভিজে ওঠে।

হরিবল! বলহরি! স্বরটা ওদের পাশ ঘেঁষে চলে গেল।

পাল বাড়ির এক মাস বয়সের ছোট খোকনটা মরেছে। ওরা জানালো, পেঁচোয়া 'পেয়েছিল' বাচ্চাটাকে অর্থাৎ ভূতে ধরেছিল। ওঝা এসে কিছুই করতে পারে নি। পরে শহরের ডাক্তার ডাকা

www.pathagar.com

হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার আসবার আগেই শরীরটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে, চোখ উলটে মরে গেল বাচ্চাটা! বাচ্চাটার জন্য পপলুর খুব কষ্ট হয়। ...আগে ডাক্তার ডাকলে ও দাদির মতো লোকের সেবাযত্ন পেলে মরত না বাচ্চাটা।

দু পাশের ঝোপঝাড় ঘন হয়ে আছে। পরীর জাংলার বহু পুরনো আকাশ ছোঁয়া গাছগুলোকে অন্ধকারে বিরাট আকারের পেতনির মতো লাগছে। কোনো রকমে ওই ভূতুড়ে জাংলাটা পার হয়ে গেলে হয়! হঠাৎ সবাই থমকে দাঁড়ায়। একটা কচি বাচ্চা কাঁদছে। কান্নার স্বরটা মনে হচ্ছে ওই জঙ্গলের ভেতর থেকে ভেসে আসছে!

ঃ আল্লাহরে! এমন ঘন জঙ্গলের মধ্যে বাচ্চা কাঁদে কার? পরীর জাংলায় মানুষের বাচ্চা! তাও ঘোর অমাবস্যার এই রাত দুপুরে! ভয়ে সবার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কান খাড়া রেখে সবাই বুঝতে চেষ্টা করে কচি বাচ্চার কান্নাটা কোন দিক থেকে ভেসে আসছে। না, সন্দেহের আর কিছু বাকি নেই । কান্নাটা পরীর জাংলার কোনো উঁচু গাছের ওপর থেকে ভেসে আসছে ।

ও সব্বোনাশ! কী ভয়ঙ্কর কথা! পপলু মঞ্জুরের কানে ফিসফিসিয়ে বলে, ঃ বাচ্চাটাকে নিশ্চয়ই কোনো ছেলেধরার দল চুরি করে নিয়ে এসেছে। বাসায় পৌঁছেই আমরা থানায় খবর দেব; বুঝলি?

ঃ অবশ্যই! বড়দের মতো করে বলে মঞ্জুর ।

রহমত ভাই বলে, ঃ এইডা হেই পাল বাড়ির বাচ্চাটাই হইব! নিচ্চয় শ্মশান থাইক্যা হেরা থাবা মাইরা লইয়া গেছে।

কাদের চাচা প্রশ্ন করে: কিন্তু রহমত চাচা, পালবাড়ির বাচ্চাটা তো ছিল মরা। সে মরা বাচ্চা এখন জ্যান্ত হলো কী করে?

জবাবে রহমত ভাই বলে, নিচ্চয় মরে নাই, বাঁইচ্যা আছিল বাচ্চাটা। হিন্দুরা করে কী, শ্বাসের টান উঠলেই রুগীরে ঘর থাইক্যা বাইর কইরা ফালায়। হের লাইগ্যাই তো শকশরা শ্মশানে ভিড় জমাইয়া থাকে। আধা মরা মানুষ পাইলেই হেরা পুড়াইবার আগেই নিয়া নেয়। আর কচি বাচ্চা পাইলে তো কথাই নাই!

ঃ বাচ্চাটাকে আমরা কোনো রকম বাঁচাতে পারি না রহমত ভাই? পপলুর আকুল আগ্রহের জবাবে রহমত ভাই বলে,: বাঁচানি? নাহ্ ! বাঁচানি মনে হয় অসম্ভব!

ঃ তাহলে চলো, আমরা পা চালিয়ে থানায় গিয়ে পুলিশকে খবর দেই! ওরা এসে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করুক!

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চলো। সবাই চলার গতি অনেক বাড়িয়ে দেয়। শীঘ্র ওরা নিজেদের গ্রামে এসে পৌঁছে।

বারো

সামনে টুকুদের বাসা। পাছে ফিট হয়ে যায় এই ভয়ে টুকুকে আনা হয়নি। টুনু এসেছে। ছেলের ফিরতে দেরি হচ্ছিল দেখে টুনুদের মা, বার বার দরজা খুলে পথের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ... এক সময় বিছানায় গেলেন। সবেমাত্র একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছে, হঠাৎ একটা শব্দে তা ভেঙে যায়। তাঁর মনে হলো উঠানে কী একটা যেন ধপাস করে পড়ে গেছে। তাড়তাড়ি দরজা খুললেন। দেখলেন উঠানের পশ্চিম দিকে যে দুটো কলাগাছ ছিল, এর মধ্যে ছোটটা মাটিতে পড়ে আছে। তার বুকটা ঢিবঢিব করতে থাকে; কিন্তু পরক্ষণেই মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। ওঝার কথাগুলো মনে পড়ে। ওঝা বলেছিল যে পেতনি বা শাঁখচুন্নি যেদিন টুকুকে একেবারে ছেড়ে যাবে, সেদিন এমনটি হবে।

www.pathagar.com

তিনি হারিকেল জ্বালালেন। দূর থেকে কলাগাছটা ভাল করে দেখলেন। একা কাছে যেতে ভয় পেলেন। ওঝা বলেছিল, ওই উপড়ে পড়া গাছ বা ভাঙা কলসি হলো শাঁখচুন্নি বা পেতনির খোলস। খোলসটা মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে বলেছিল। আর পুঁতে ফেলে তার দু দিনের মধ্যেই শাঁখচুন্নি বা পেতনির নামে মানত করা এক শ টাকা ওঝার জন্য রেখে দিতে বলেছিল। 'শিক চালানো'র গুণে অসুখ ভাল হলে তার মন আপনিই বুঝতে পারবে। সে নিজে এসে একদিন টাকাটা নিয়ে যাবে।

এখন কী করা যায়, তাই ভাবছেন টুকুর আম্মা, এমন সময় বাড়ির কাছে রাস্তায় ভয়ানক একটা চিৎকার শোনা যায়, চোর! চোর! চোর! লোকেরা এই মুহূর্তে একটা চোর ধরেছে। চোরটা নাকি টুকুদের বাসা থেকেই বের হচ্ছিল । হারিকেন হাতে এগিয়ে গেলন টুকুর মা। আরে কী অদ্ভুত কাণ্ড! চোরটাকে তার ছেলে, পপলু, রহমত চাচা, হিরণ মিয়া ওরাই ধরেছে। ওরা এইমাত্র ফিরেছে। জয়নাব বানু ওদের দেখে খুশি হলেন। ওদিকে পাড়ার অনেকেই জেগে উঠে ছুটে এসেছে। কয়েকজনে চোরটাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিল।

গোঁফ নেই, দাড়ি নেই, বেলের মত ন্যাড়া মাথা; কালো হাফ প্যান্ট পরা, খালি গায়ে তেল মাখা চোরটা চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে ঃ ও মাইয়া, বাজান গো, মাইরের চোটে আমি মইরা যায়্যাম গো!

তাতে অনেকেই হেসে ওঠে। পপলুর কষ্ট হয়, বলে, ঃ ওকে আপনারা মারবেন না। দোহাই লাগে ওরকম করে মারবেন না। চোর হলেও ওতো মানুষ!

হিরণ মামাও বলেন, হ্যাঁ, ওকে মারধর করাটা ঠিক না। ওকে তো পুলিশের কাছেই দেয়া হচ্ছে!

ডুকরে কেঁদে উঠে বলে চোরটা, দোআই, আল্লার! চুরির লাইগ্যা না, খালি একটা কলাগাছ কাটতে আইছিলাম।

ঃ অ! এটা তাহলে তোমারই কারসাজি ! বলেন জয়নাব বানু ।

ঃ জ্বি, মানে না! মানে হ! কলাগাছে কলা ধরছিল না। হাছা কথা কইতাছি। থোড়া ও ধরছিল না। চোরের কথার ধরন দেখে সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

ঃ তবে তুমি অকারণে কলাগাছ কাটতে গিয়েছিলে কেন? একজনের প্রশ্নে মাথা নিচু করে, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে চোরটা। হিরণ মামা এগিয়ে এসে চোরের মুখের ওপর টর্চ ধরলেন।

ঃ একে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!

ঃ হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। বলল টুকু।

চোরটা দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

ঃ থাউক, থাউক! আর শরম করন লাগত না!

টিটকারি দিয়ে একজন বলল। আসলে কিন্তু সত্যি চোরটার লজ্জিত হবার কারণ ঘটেছে। কেননা, একটু পরেই সবাই তাকে চিনে ফেলল। কী তাজ্জব কাণ্ড! ন্যাড়া, বেলমাথা, হাফপ্যান্ট পরা চোরটা আর কেউ নয়, সেদিনের ঝাঁকড়াচুলো, চাপ দাড়িওয়ালা, লম্বা আলখাল্লা পরা ভূতের সেই ওঝাটা! জ্বিনের খপ্পরে পড়েছে, এই মিথ্যা কথা বলে টুকুকে যে শিক গরম করে ছ্যাঁকা দিতে গিয়েছিল।

ওঝাকে চেনার পর নতুন করে ফের শুরু হল হৈ চৈ! ওরে বেটা ভূতের বাচ্চা! হেইদিন তুমিই আইছলা ভূত ছাড়াইতে? রও, আইজ তোমার ভূত আমরা ছাড়ায়্যা দিতাছি! অনেকেই ওঝার দিকে ছুটে যায়।

রহমত ভাই ও হিরণ মামা তাদের বাধা দেয়। চোর- ওঝা সবার পায়ে ধরে মাফ চাইতে থাকে।

ঃ আর করতাম না! কুনদিন আর শয়তানি করতাম না! এইবারের মত মাফ কইরা দেইন আমারে!

লোকেরা কিন্তু তার কথা শুনতে রাজি নয় । যে লোক বহুদিন ধরে শয়তানি করছে, ভাঁওতা দিয়ে মানুষকে ঠকাচ্ছে, তার শাস্তি হওয়াই উচিত!

পপলুর লোকটার জন্য মায়া হয়। সবার দিকে তাকিয়ে মিনতি করে বলে,

www.pathagar.com

ঃ আহা! বেচারা মাফ চাচ্ছে! দয়া করে আপনারা ওকে মাফ করে দিন! ভবিষ্যতে সে ভাল হয়ে যেতে পারে।

তের

এরপর পপলুরা বাসায় ফিরে আসে। ফিরেই পপলু ও মঞ্জুর থানার দিকে ছুটল। সাথে হিরণ মামা।

ওসি সাহেব কয়েকজন কনস্টেবল সাথে নিয়ে তখনই পরীর জাংলার দিকে রওয়ানা দিলেন। বেলা এগারটার দিকে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। ঝকঝকে রোদ। কিন্তু পরীর জাংলা অন্ধকার! ওরা সবাই সাবধানে পথ করে ভেতরে ঢুকতে থাকে।

হঠাৎ সেই বাচ্চটা কেঁদে ওঠে। সবারই কান খাড়া হয়। কচি বাচ্চারই কান্না!

পপলু বলে, শুনছেন, ওসি চাচা, বাচ্চার কান্না?

ঃ হ্যাঁ, তাই তো শুনছি! আশ্চর্য! এতঘন জঙ্গলের ভেতর কে বাচ্চা এনে রেখেছে? নিশ্চয়ই এটা একটা ছেলে ধরা বড় গ্যাঙ্গের কাজ! পুলিশদের অর্ডার দিলেন, হারি আপ! ঝোপঝাড়, ডাল কেটে পথ করা শুরু কর। খুব সাবধান! বন্দুক-রিভলবার প্রয়োজন হলে কাজে লাগাবে। ওরা কাজে নেমে যায়। পথ তৈরি করছে আর কান্নার স্বরটা লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে।

কয়েকটা চামচিকে তাদের কাঁধ ও মাথায় ডানা ঝাপটা মেরে উড়ে যায়। পপলু ও মঞ্জুর বাসায় ফিরে খুব অল্প সময়ের মধ্যে জঙ্গলে আসবে বলে সেভাবে ড্রেস করে নিয়েছিল। মোটা ফুলপ্যান্ট ও ফুলশার্ট, পায়ে বুট, মাথায় কানঢাকা টুপি। পিঠে ঝোলানো ব্যাগে শক্ত ছুরি, শক্ত লাঠি ও ফার্স্ট এইডের কিছু সরঞ্জাম।

সবাই এগোতে থাকে। ...এখন বাচ্চাটা আর কাঁদছে না। চারদিকে গুমোট আবহাওয়া। ছমছমে নীরবতা!... পথ করে সবাই একটু আগে কান্নাটা যেখানে গুমরে মরছিল, ঠিক সেখানে এসে হাজির হলো। কিন্তু কোথায় ছেলে ধরার দল! দেও-ভূতের মতো সব শূন্যে মিলিয়ে গেছে। ভূতদের খপ্পরে যে বাচ্চাটা পড়েছে। ওসি সাহেব আক্ষেপ করলেন, কিন্তু এছাড়া যে কোনো উপায়ও ছিল না! ঘন জঙ্গল ! না কাটলে ভেতরে ঢুকতো কী করে?

বড় টর্চের আলো ফেলে ওরা চারদিক দেখে নেয়। যদি ডাকাত বা ছেলে ধরা দলের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়! কোনো চিহ্নই নেই। এদিক-ওদিক গর্ত আছে অনেক। শেয়াল, বেজি বা সাপের বাসা। কাছে যাওয়াও বিপদ। চারদিকে খুব উঁচু গাছপালা। সামনের একটা গাছের আগার দিকে পাখির বাসা। শুকনো ডালপালা দিয়ে তৈরি। মস্তবড় চ্যাপটা-গোল একটা বাসা।

ওটা শকুনের বাসা। বলল পপলু, সেদিন আমির চাচা বলছিলেন শকুনেরা উঁচু গাছের আগায় বিরাট বাসা তৈরি করে।

বাসাটা উঁচুতে। তাই নিচ থেকে দেখা যায় না। ওখানে কী আছে! ওরা এবার ফিরে যাচ্ছে। নাঃ! অভিযানটা ব্যর্থ হলো! হঠাৎ বাচ্চাটার কান্না শোনা যায়—চিৎকার করে কান্না! আশ্চর্য! ওই শকুনের বাসা থেকেই ভেসে আসছে কান্নাটা!! তবে কি ছেলে ধরার দল তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে ওখানেই রেখে গেছে? পরে সুবিধামত এক সময় এসে নিয়ে যাবে বলে? হয়ত তাই!

ওসি চাচা, বাচ্চটাকে ওই শকুনের বাসা থেকে উদ্ধার করা যায় না?

পপলুর প্রস্তাবের আগেই ওসি সাহেব হেড কনস্টেবল যাকির হোসেনকে গাছ বেয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে অর্ডার দিয়েছেন।

www.pathagar.com

বেশ কষ্ট করে যাকির হোসেন গাছে উঠতে থাকে। নিচ থেকে পপলুরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আল্লাহ তুমি রহম কর!

যাকির এবার গাছের মগডালে উঠে গেছে। সেখানে গিয়ে সে তো ভীষণ অবাক! বাচ্চাটা কাঁদছে— চেঁচিয়ে কাঁদছে! কিন্তু কী তাজ্জব কাণ্ড! ওটা বাচ্চা! মানুষের বাচ্চা নয়! সে ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলে, স্যার! অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড! যে বাচ্চাটা মানুষের কচি বাচ্চার মতো কাঁদছে, ওটা আসলে শকুনের বাচ্চা!

কী বলছ যাকির? এটা কি একটা বিশ্বাস করার মতো কথা!! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস করতেই হলো, হ্যাঁ, অদ্ভুত কথা হলেও , ওটা শকুনের বাচ্চারই কান্না!

চৌদ্দ

পপলু সেদিন তার আম্মা ও মামির কাছে সেই রাত্রিতে দেখা ভূতের ভয়ঙ্কর চোখগুলোর কথা বলছিল, জান আম্মা, ভূতের চোখগুলো না, দব করে জ্বলে উঠছিল। অন্ধকারে শুধু চোখগুলোই দেখা যাচ্ছিল, মুখ-হাত-পা, শরীর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। গোল গোল আগুনের মতো চোখগুলো একবার এদিকে, একবার ওদিকে নড়ছিল। নড়তে নড়তে আবার হঠাৎ করে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

আম্মা ও মামি সাথে সাথেই "লা হাওয়া, ওয়ালা কুয়্যাতা" পড়ে পপলুর বুকে ফুঁ দেন । এমন সময় পাশের ঘর থেকে হো হো করে হেসে বেরিয়ে আসেন, সালাউদ্দিন মামা। পপলুর বড় মামা। আজ সকালেই মাত্র তিনি গ্রামে এসেছেন।

ঃ ও কি ভাইজান? তুমি অমন করে হাসছ কেন?

পপলুর আম্মার প্রশ্নের জবাবে মামা বলেন, হাসছি- ভূতের ওই ভয়ঙ্ককর চোখের কথা শুনে।

ঃ তা, ভয়ঙ্কর কথার শুনে কেউ হাসে ভাইজান?

মামার কথা সূত্র ধরে বলে পপলু, হ্যাঁ, জানেন! ভূত-পেতনিদের নিয়ে কখনো হাসতে হয় না। তাহলে ওরা ভীষণ চটে যায়! তাই নাকি? তা, আমি তো ওই ভূত মশাইদের নিয়ে হাসছি না! হাসছি ওদের চোখগুলো নিয়ে।

ঃ ওই হলো! একই কথা!

হাসি হাসি চোখে বড়মামা বলেন, জান পপলু বাবু, ভূত-পেতনি ও শাঁখচুন্নির চোখের কিন্তু গালভরা একটা ইংরেজি নাম আছে!

ঃ যান, আপনি কেবলি ঠাট্টা করেন। চোখের আবার আলাদা নাম থাকে নাকি?

ঃ মানুষের চোখের নাম থাকে না - ভূতে-পেতনিদের থাকে।

ঃ কী নাম?

ঃ মর্শগ্যাস।

ঃ মর্শগ্যাস? দূর!

ঃ হ্যাঁ, ওটাই ভূতের চোখের ইংরেজি নাম।

ঃ পচা নাম! পপলু ঠোঁট উলটায়।

ঃ কী হেঁয়ালিপনা করছ, আসলে ব্যাপার যদি কিছু থাকে তো খুলে বল না কেন? আম্মার কথার সাথে যোগ দেয় পপলু, হ্যাঁ, বলুন না বড় মামা!

ঃ আচ্ছা, তোমরা যেখানে ভূতের চোখগুলো শূন্যে ভাসতে দেখেছিলে সেখানে বা তার কাছাকাছি একটা পচা পুকুর ছিল না?

ঃ হ্যাঁ, রহমত ভাই বলছিল একটা পচা, খুব খারাপ গন্ধওয়ালা পুকুর সেখানে ছিল।

www.pathagar.com

ঃ তাহলে আমার অনুমান একেবারেই ঠিক! ওই রকম পচা পুকুর বা ডোবা নালাতে এক রকম গ্যাসের জন্ম হয়। জন্মেই ওগুলো দব করে জ্বলে ওঠে যাকে বলা হয় মর্শগ্যাস। কথাগুলো অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এই মামা বিজ্ঞানের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। লন্ডন থেকে পি-এইচ-ডি করেছেন। মামার কথা মেনে নিয়েও পপলুর মনটা কিন্তু খুঁতখুঁত করতে থাকে।

পনেরো

সেই দিনের পানির জ্বিনের হাত থেকে পপলুদের বাঁচাতে গিয়ে জুম্মার দাদির বাঁ পায়ে একটা জং ধরা টিন লেগে কেটে গিয়েছিল। সেটা ফুলে ঢোলের মতো হয়েছে। খুব জ্বরও হয়েছে দাদির। মঞ্জুরের মুখে কথাটা শুনে পপলু খুবই ব্যথা পেল মনে।

ঃ আহারে ! বেচারি বুড়ো মানুষ! সেদিন আমাদের জন্যই তার এই দুর্দশা! নিজেদের অপরাধী বলে মনে হয় পপলুর।

দাদির বাড়িতে এসে দেখে, তিনি ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। তার মাথার কাছে বসে ময়নার মা বুড়ি হাওয়া করছে। ফোলা পা-টা লতা পাতার ওপর ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ব্যথায় তার মুখটা নীল হয়ে গেছে। সেই নীল মুখে এক ঝলক হাসি দেখা দিল।

ঃ আমার সোনা বাইয়েরা আইছে রে! বও, বও তুমরা! ঐ পাটিটা বিছাইয়া বও। পপলু গিয়ে ওর মাথার কাছে বসল। বলল, দাদি, তোমার জ্বর হয়েছে, আমাদের খবর দাওনি কেন?

পপলুর আন্তরিকতায় দাদির ব্যথা যেন অনেকটা কমে যায়। বলে, খবর দিয়া কী হৈত?

ঃ কেন, আমরা তোমার জন্যে ডাক্তার ডাকতাম!

কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না দাদি। তাই প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে বলেন,

ঃ খামাকা তুমরার এক সৈন্ধ্যার খেলনের আনন্দই মাটি হৈত!

এই বুড়িতো আইজ হউক, কাইল হউক শিগরিই মরব।

ঃ থাক, তোমাকে আর বাজে বকতে হবে না! তুমি কক্‌খনো ওরকম কথা মুখে আনবে না!

পপলুর দরদ দাদির সব ব্যথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ দাদিকে হাওয়া করে ওরা যে যার বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে পপলু তার বাবাকে ধরল, ঃ আব্বা, দাদিকে ডাক্তার দেখাতে হবে, ওষুধ কিনতে হবে! নইলে দাদি খোঁড়া হয়ে যাবে! আমাদের জন্যই খোঁড়া হবে আব্বা!

জব্বার আহমদ স্থির দৃষ্টিতে অনেক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার এই ছোট দুরন্ত ছেলেটির ভেতর এতটা মমতা লুকিয়ে আছে!

নিজের বহু অসুবিধা সত্ত্বেও সেদিনই তিনি আবারও শহরে গেলেন। বেশি টাকার ভিজিট দিয়ে একজন নামকরা ডাক্তার আনলেন। ডাক্তার সাহেব রোগিণীকে পরীক্ষা করে বললেন, পায়ে সেপটিক হয়ে গেছে। অবিলম্বে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। নইলে রোগিণীর অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাবে। শেষে পা কাটাতে না হয়!

শুনে পপলুর দু চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। মঞ্জুর ও মতির চোখও ছলছল করছে। তাদের জন্য দাদি সেদিন বাইরে না বেরুলে তো পায়ের অমন হাল হতো না! রহমত ভাই এগিয়ে এল, বুবুরে আমি শহরে হাসপাতালে লৈয়া যাইতাছি। তুমরা কুন চিন্তা কইরো না! জুম্মার দাদির অবস্থা পরের দিন আরো খারাপ হলো। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। পায়ে দারুণ যন্ত্রণা! ব্যথায় কাতরাচ্ছে দাদি।

www.pathagar.com

সেদিনই একটা গরুর গাড়ি ভাড়া করা হলো, দাদিকে শহরে নিয়ে যাওয়া হবে। সাথে যাচ্ছেন রহমত ভাই ও পপলুর আব্বা। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, হাসপাতাল যাবার পথেই দাদির মৃত্যু হলো। চিরদিনের জন্য তিনি এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর প্রাণহীন দেহটা নিয়ে জব্বার সাহেব ও রহমত ভাই যখন চোখ মুছতে মুছতে গ্রামে ফিরে এলেন, পপলু প্রথমে যেন তা বিশ্বাসই করতে পারে নি সে পলকহীন চোখে দাদির মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওই হাড় জিরজিরে শরীরের ভেতর যে স্নেহ ও মায়ায় ভরা একটা বড় মন ছিল, তার পরিমাপ করতে পারে না পপলুর শিশু মন। তার বুকটা ব্যথায় ভেঙে যেতে চায়; কেবলি মনে হতে থাকে তাদের জন্যই মরল দাদি। তাদের দেও জ্বিনের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে মারা পড়ল।

ঃ ও দাদি, দাদি গো! তুমি সত্যি মরে গেলে গো! দাদির প্রাণহীর দেহের পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে পপলু। মঞ্জুর, টুকু, টুনু, মতি, আদুরাও কেঁদে ভাসায়।

কবরে নিয়ে যাবার সময় পপলু তার আব্বার কাছে এসে দাঁড়ালো। ছোট দুটি হাতে তাঁর একটা হাত আঁকড়ে ধরল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আব্বা, দাদির কবরটা কিন্তু বাঁধিয়ে দিতে হবে! বার্থডেতে আমি যে টাকা পেয়েছি, তাই দিয়ে বাঁধিয়ে দিও আব্বা!

আব্বার বুকের ভেতরটা ব্যথায় টন টন করতে তাকে। চোখের কোণ মুছে তিনি শুধু বললেন, আচ্ছা সোনা, তাই হবে!

ষোল

দাদির 'কুলখানি' হয়ে গেছে। ময়মনসিংহ ফিরে যাবার সময়ও ঘনিয়ে এল। কয়েকদিনের মধ্যে পপলুর স্কুল খুলে যাবে। রহমত ভাই, হিরণ মামা, কাদের চাচা, মঞ্জু, টুকু, টুনু, আদু, মামি ও পাড়া-পড়শিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পপলুরা রিকশায় ওঠে। ওদের চোখ ছলছল করছে।

পপলুদের চোখও সজল হয়ে উঠেছে। পপলু বলল, আমরা শিগগিরই আবার আসব। দাদির কবরটা যখন বাঁধানো হবে, তখন! কবরের জন্য তার নেমপ্লেটটা নিয়ে আসব আমরা। তাই না, আব্বু?

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই তা নিয়ে আসব। বললেন পপলুর আব্বা।

শহরে ফিরে এলে পাশের বাসার বন্ধু টিংকু খুশি হয়ে ছুটে এল। কিন্তু পপলু আগের মতো খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে না। দাদির জন্য তার মনটা খুবই খারাপ। না দেখা দাদির কথা শুনে টিংকুও খুব আক্ষেপ করে।

পরদিন দুপুর বেলা। বুড়ো বুয়াকে সাথে নিয়ে আম্মা ঘর দোর পরিষ্কার করছেন, জিনিসপত্র গুছাচ্ছেন। পপলু খাবার পর নিজের ঘরে এল।

বিছানায় শুয়ে সেই বইটা পড়তে শুরু করে- 'ভূতের খপ্পরে'। সবুজের জন্মদিনে দুপুরে খেয়ে দেয়ে এ বইটা সে সাথে নিয়ে এসেছিল। কিছুটা পড়েছিল। পড়তে গিয়ে কী হয়েছিল মনে নেই। শুধু মনে আছে মা, বাবা, বুয়া কেউ বাড়িতে ছিল না। ছিল শুধু নতুন এক বুয়া। ও বাবাগো! ভাবতেই পপলুর বুকের ভেতরটা ভীষণভাবে কেঁপে ওঠে। এতোদিন গ্রামে ছিল। তাই ভয়ঙ্কর বুয়া শাঁখচুন্নির কথা ভুলেই গিয়েছিল। কিছু দিন আগে সে যে গ্রামে চমৎকার কাটিয়ে এসেছে সেসব কথা ভাবতে চেষ্টা করে। শঙ্কিত মনটাকে ঘুরাতে চাইল। কতো ভাল ছিল তার গাঁয়ের বন্ধুরা! আর বুড়ো রহমত ভাই, সত্যি তার তুলনা হয় না।

www.pathagar.com

পপলুর মনে পড়ে যায় পরীর জাংলায় গলা কাটা রাজকুমারীর কথা। বাচ্চার কান্নাও তো ওরা নিজেদের কানেই শুনেছে। শকুনের বাচ্চার কান্না কি অবিকল মানুষের বাচ্চার কান্নার মতো হতে পারে? দূর! যাকির চাচা গাছের আগায় উঠে কী দেখতে কী দেখেছে কে জানে?

পপলু নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করে না! আর রাতে পচাগড়ের পুকুরের কাছে ঠিকরে বেরিয়ে আসা ভূতের চোখগুলো? কী যে বলেন বড় মামা ! মর্শগ্যাস! আসলে পপলুরা যাতে ভয় না পায়, সে জন্যেই মামা ওই ইংরেজি নামটা বের করেছেন। ... সেই ভীষণ ভর সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। এই দিনের আলোয় দুপুর বেলাতেও তার ছোট মামার ভূতটা নখয়ালা আঙুলগুলো দিয়ে কী ভীষণ শক্ত করে তার কাঁধ দুটো চেপে ধরেছিল! প্রাণপণ বেগে ছুটে পালিয়ে না এলে ভূতটা তো তাকে মেরেই ফেলত!

যে যাই বলুক, পপলু নিজেরই তো কাঁধ দুটো অনেকক্ষণ ধরে ব্যথায় কী রকম টনটন করছিল!

পপলু এবার বইটা খোলে । আসল দৈত্য-দানব, ভূত, পেতনি ডাইনিদের নিয়ে লেখা ভয়ঙ্কর সব কাহিনী! প্রথম গল্পটাতে আছে পপলুর চেয়ে ছোট, সাত বছরের ফরসা, সুন্দর, গোলগাল চেহারার একটি ছেলে গোপালকে একটি খুব খারাপ পেতনি ঝাঁকড়া একটা শ্যাওড়া গাছের মগডালে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। নিয়ে তাকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল! ই বেশিক্ষণ ওভাবে থাকলে চোখ উলটে মরেই যেত গোপাল! তার মা-বাবা তখন কালী মন্দিরে গিয়ে ধরনা দিল! পেতনিটার জন্য জোড়া পাঁঠা বলি দিয়ে তাকে খুশি করল! তারপর না তাদের ছেলেটাকে ফিরে পেল!

পরের গল্পটার নাম 'লম্বা হাতয়ালা শাঁখচুন্নি। এক নিঃশ্বাসে পপলু গল্পটা পড়ে ফেলল। আরে এ গল্পটাই তো সবুজ চোখ বড় বড় করে তার জন্মদিনে তাদের শুনিয়েছিল! আর পপলু বাড়ি ফিরলে সেই শাঁখচুন্নিটা কোত্থেকে নতুন এক বুয়ার বেশ ধরে তাদের বাসায় চলে এসেছিল। পপলু তার কাছে পানি চেয়েছিল। তার কথা ভাবতেই তার গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়! একটা দমকা হাওয়া খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকে। পপলু পেছন ফিরে তাকায়। তাকিয়ে দেখে ও বাবা বাবাগো! ঘাড়ের কাছে গ্লাস ধরা কঙ্কালের একটা হাত! হাতটা জানালার গ্রীলের ফাঁক দিয়ে ঢোকানো! ভয়ে চোখ বন্ধ করে! চেঁচিয়ে ওঠে পপলু। ও আব্বা ! ও আম্মাগো! ...শাঁখচুন্নিটা ঘরের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে গো!

যখন চোখ খুলল পপলু, দেখে মা পাশে বসে কাঁদছেন। বাবার চোখে পানিতে ভরা। বেশ চিন্তিত মুখে তার হাত ধরে পালস্ দেখছেন ডাঃ রশিদ, বাবার বন্ধু, তার ডাক্তার চাচা। পপলুকে তাকাতে দেখে ডাক্তার চাচা মৃদু হাসলেন, বললেন, কী পপলু বাবু, ভূতের স্বপ্ন দেখা শেষ হলো? পপলু বিছানায় উঠে বসল । একবার মা, একবার বাবা, বুড়ো বুয়া ও ডাক্তার চাচার দিকে তাকিয়ে সে জানালাটার দিকে ফিরল। ভয়ে বলল, তাহলে কি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম?

ঃ হ্যাঁ স্বপ্ন, তবে ঘুমিয়ে নয়, জেগে তুমি ভয়ঙ্কর একটা স্বপ্ন দেখছিলে। রহস্য করে বললেন ডাক্তার চাচা। তারপর বললেন, আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলছি, আগে এক গ্লাস গরম দুধ ও এ ওষুধটা খেয়ে নাও!

ওষুধ ও দুধ খাবার পর ডাক্তার চাচা পপলুর পাশে বসলেন! কাছে বসেছেন তার বাবা ও মা। ডাক্তার চাচা পপলুর ভূতের গল্প পড়ার ভীষণ নেশার কথা আগেই জানতেন। মিষ্টি করে বললেন এবার বলতো চাচু তোমার কাছে আজ কোন ভূতটা এসেছিল?

ভূত না চাচা! একটা পেতনি এসেছিল! সেই যে বুয়া পেতনিটা যে তার ল-ম-বা-হাতটা দিয়ে টিউবঅয়েল থেকে গ্লাসে পানি ভরছিল!

ঃ সে পেতনিটা কখন এসেছিল? তখন তুমি কী করছিলে?

ঃ তখন? পপলু মনে করে বলল, হ্যাঁ, তখন আমি শুয়েছিলাম। শুয়ে শুয়ে খুব ভয়ের একটা ভূতের গল্প পড়ছিলাম।

www.pathagar.com

ঃ অ, সেই লম্বা হাতায়ালা শাঁখচুন্নির গল্পটা পড়ছিলে বুঝি? চাচা এসেই এক ফাঁকে ওই গল্পটা পড়ে নিয়েছেন।

ঃ তা, ওই শাঁখচুন্নি তোমার কাছে কেন এসেছিল ?

ঃ পানি দিতে।

ডাক্তার চাচা পপলুর আব্বার দিকে ফিরলেন, বুঝলে জব্বার! আমাদের পপলু ভূত পেতনির গল্প পড়তে পড়তে কল্পনায় একেবারে তাদের রাজ্যে চলে গিয়েছিল! ছোট ছেলে মেয়েরা অনেকেই সেরকম যায়। তারা বিভ্রান্তি যাকে ইংরেজিতে বলে ইলিউশান তার ঘোরে পড়ে। তখন সেই শোনা বা পড়া ভূত, পেতনি শাঁখচুন্নিদের একবারে চোখের সামনে দেখতে পায়! এক কথায় তারা তখন ভূতের খপ্পরে পড়ে যায়। চাচা পপলুকে কোলের কাছে টেনে নিলেন, বললেন,

ডাক্তার চাচা পপলুকে পরীক্ষা করছেন

ঃ আসলে কী জান চাচু! ভূত, পেতনি ডাইনি, শাঁখচুন্নি, দৈত্য দানব পৃথিবীতে এসব কিছুই নেই।

ঃ তাহলে ওরা কোথায় আছে? আকাশে?

ঃ না বাবু, আকাশ, পাতাল কোথাও ওরা নেই!

ঃ তবে যে বইয়ে লেখা আছে!

ঃ হ্যাঁ, বইয়ে তা লেখা আছে একথা সত্যি। তোমরা ছোটরা ভূতের গল্প পড়ে খুব মজা পাও কিনা, তাই যাঁরা গল্প লেখেন, বানিয়ে বানিয়ে ওসব গল্প তৈরি করেন তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য। কিন্তু

www.pathagar.com

তোমরা যে ভয় পেয়ে যাও, ওটাইতো মুশকিল! চাচার কথাগুলো পপলুর বিশাস হয় না। সে বলে, তবে ভূত পেতনি, শাঁখচুন্নি ওসব নামগুলো এল কোত্থেকে?

পপলুর এ প্রশ্নে ডাক্তার চাচা মনে মনে তার বুদ্ধির তারিফ করেন। ছোট পপলু কিন্তু প্রশ্নটা করেছে বড়দের মতো। বললেন,

ঃ কোত্থেকে? নিশ্চয়ই প্রথমে কোনো একজন লেখক লিখেছিলেন, ভূত হলো ভয়ঙ্কর এক রকম প্রাণী! তাদের থাকে ইয়া বড় বড় দাঁত, লকলকে জিব, কপালের ওপরে থাকে গোল গোল আগুনের কুণ্ডলীর মতো চোখ! তাদের নাক নেই, আছে শুধু দুটো ফুটো! মুখ বা শরীরে মাংস চামড়া কিছুই নেই। মাংস ছাড়া চোয়ালে আছে শুধু বত্রিশপাটি দাঁত। তারা শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে, যে কোনো মূর্তির রূপও ধরতে পারে। মেয়ে ভূতদের নাম দেয়া হয়েছে পেতনি, ডাইনি শাঁখচুন্নি এইসব। পপলুর মুখ দেখে মনে হলো সে কথা মোটেই বিশ্বাস করছে না। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সত্যিকারের ভূত পেতনিই যদি না থাকল তবে তাদের ওই সব গল্প পড়ে মজাটা কী!

ডাক্তার চাচা তার ব্যাগ থেকে একটা ছড়ার বই বের করলেন, নাম ডাইনি। পপলুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন, এই যে নাও চাচ্চু, এ বইটা নতুন বেরিয়েছে, মজার মজার সব ভূত, পেতনি, ডাইনিদের ছড়ায় ভরা।

পপলু খুব খুশি হলো। ডাক্তার চাচা মুখে যাই বলেন না কেন, ভূত পেতনিদের নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন ও পছন্দ করেন। নইলে ডাইনির বইটা তাকে দিতেন না। পপলু তখনই বইয়ের পাতা উলটায়। ও বাবা! বিকট চেহারার একটা ডাইনি বুড়ির ছবি! দেখলেই পিলে চমকে ওঠে। প্রথম ছড়াটার নাম ডাইনি। পপলু এক নিঃশ্বাসে তা পড়ে ফেলে।

ওরে ও ডাইনি!
দেখা তোর পাই নি!
কোথা তোর ঘর?
ওই বালু-চর?
আর বন-বাদাড়ে?
ঘুটঘুটে আঁধারে?
খাস কিরে তুই?
বলি পাঁঠা? রুই?
মানুষের বাচ্চা?
তাজা খাস কাঁচ্চা?
ও বাবা! চাচারে!
কে আছিস বাঁচারে।
চুপ কর্! রামহাঁদা!
তেড়ে এসে বলে দাদা!
ডাইনি ও প্রেতিনি
কোনো দিন দেখি নি!
ওই সব কিছু নেই,
থাকে শুধু গল্পেই।

ঝকঝকে অক্ষরে বইয়ের মধ্যে স্পষ্ট ছাপা একটা ছড়া! ছড়াটা পড়ে পপলু বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। হ্যাঁ ডাক্তার চাচা ও অন্যদের কথাগুলো তার কিছু কিছু বিশ্বাস হচ্ছে!

www.pathagar.com

ঝিলিমিলি (ছড়া ও কবিতা)

হেলেনা খান

প্রকাশক : জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা।
প্রচ্ছদ : মাহজাবিন মাহফুজ
প্রথম প্রকাশ : ২০১০ সন।

www.pathagar.com

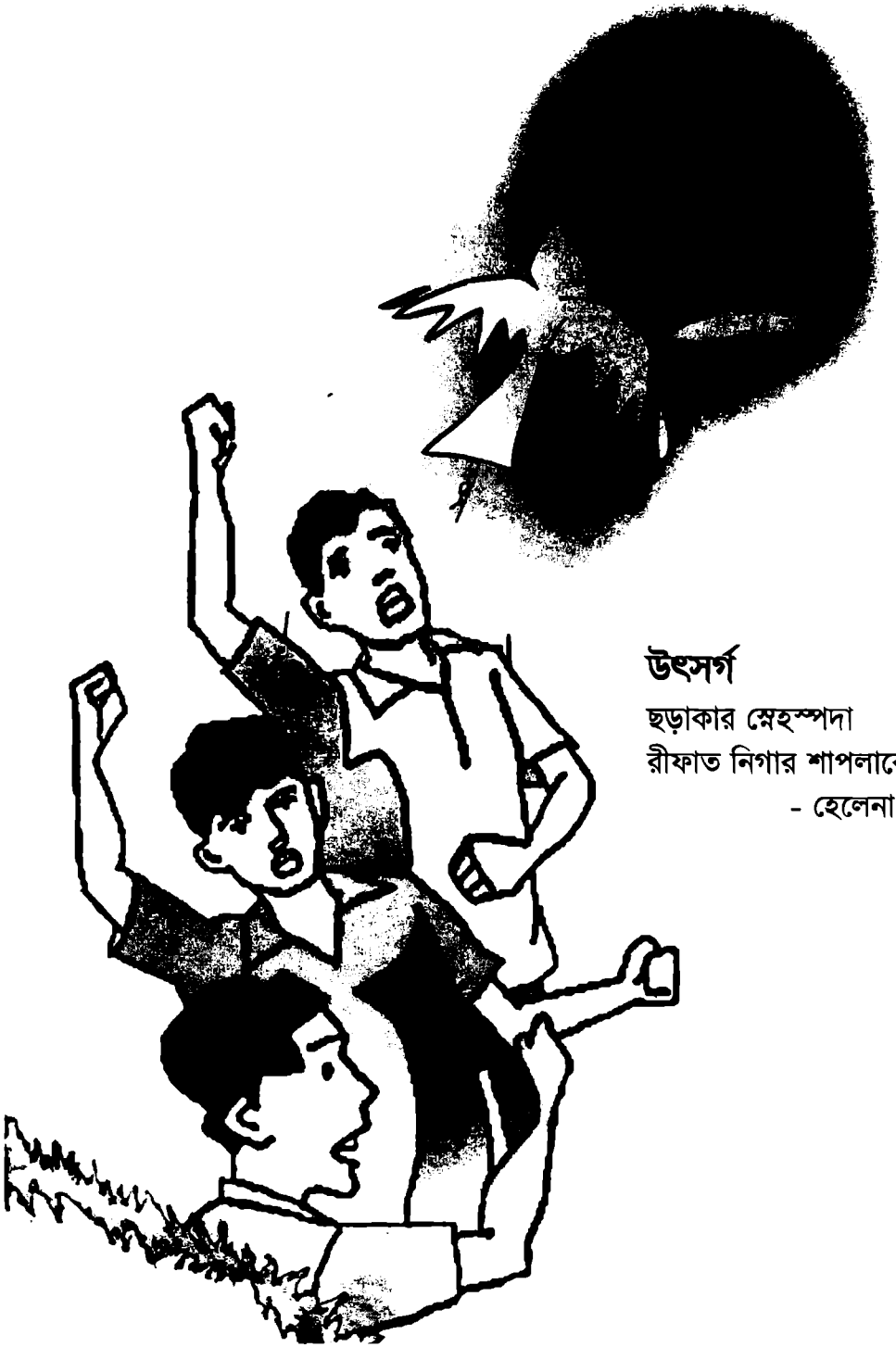

উৎসর্গ

ছড়াকার স্নেহস্পদা
রীফাত নিগার শাপলাকে
- হেলেনা খান

www.pathagar.com

হিংসুটে খোকা

ঝড় উঠেছে ভীষণ বেগে!
দুলছে বাড়ি-ঘর,
ছোট্ট খোকার বুকটা ভয়ে
কাঁপছে থরথর।

ভাবছে খোকা ঝড়ে যদি
ঘরটা ভেঙেই যায়,
খেলনাগুলো ভাঙুক আগে
কেউ যেন না পায়!

www.pathagar.com

হাভাতের দেশে

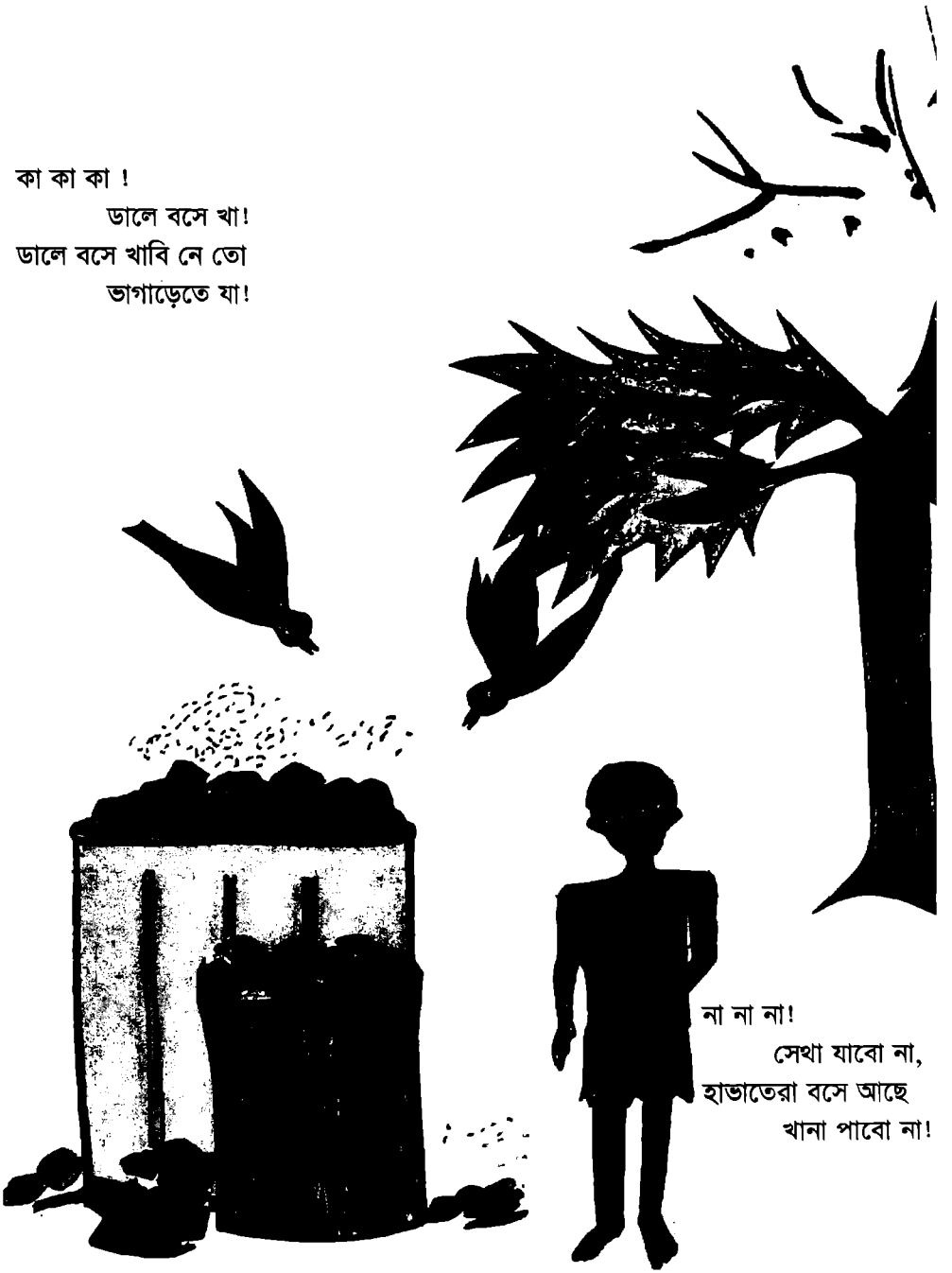

কা কা কা !
ডালে বসে খা!
ডালে বসে খাবি নে তো
ভাগাড়েতে যা!

না না না!
সেথা যাবো না,
হাভাতেরা বসে আছে
খানা পাবো না!

www.pathagar.com

ধিকধিক

ট্রেন চলে ঝিকঝিক,
রোদে বালু চিকচিক।
হীরে মোতি ঝিকমিক,
খুকি হাসে ফিকফিক।
ঘড়ি বাজে টিকটিক,
রাজা সাজে ঠিকঠিক।
দেহ তার লিকলিক,
পেট মোটা ধিকধিক!

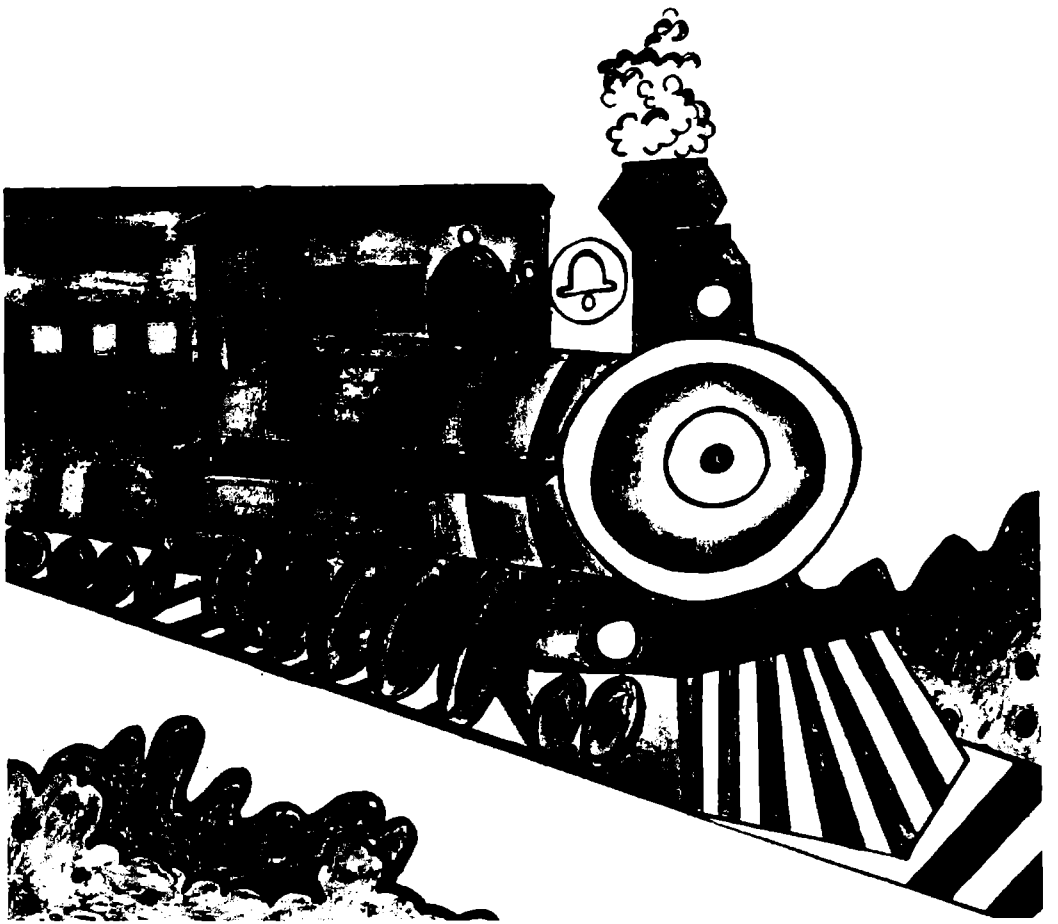

www.pathagar.com

বায়না

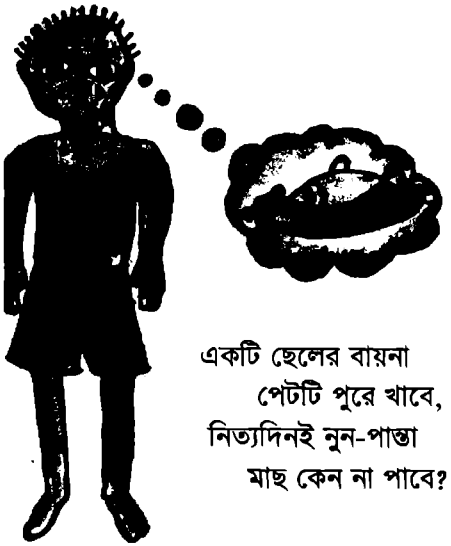

একটি ছেলের বায়না
পেটটি পুরে খাবে,
নিত্যদিনই নুন-পান্তা
মাছ কেন না পাবে?

অপর ছেলের বায়না
চপ-কাটলেট চাই,
মাংস-কারি মাছ ভাজাতে
স্বাদ নাহি আর পাই!

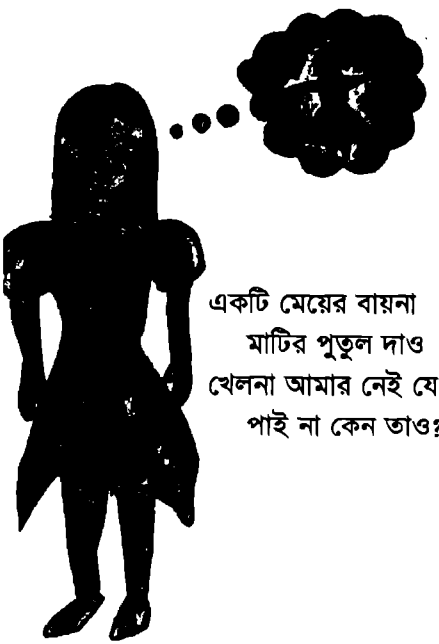

একটি মেয়ের বায়না
মাটির পুতুল দাও
খেলনা আমার নেই যে কোনো
পাই না কেন তাও?

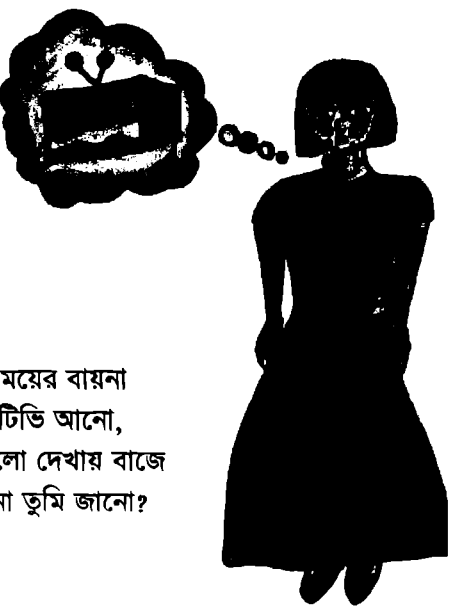

অন্য মেয়ের বায়না
রঙিন টিভি আনো,
সাদা-কালো দেখায় বাজে
তাও না তুমি জানো?

www.pathagar.com

ডাইনিবুড়ির মন্তর

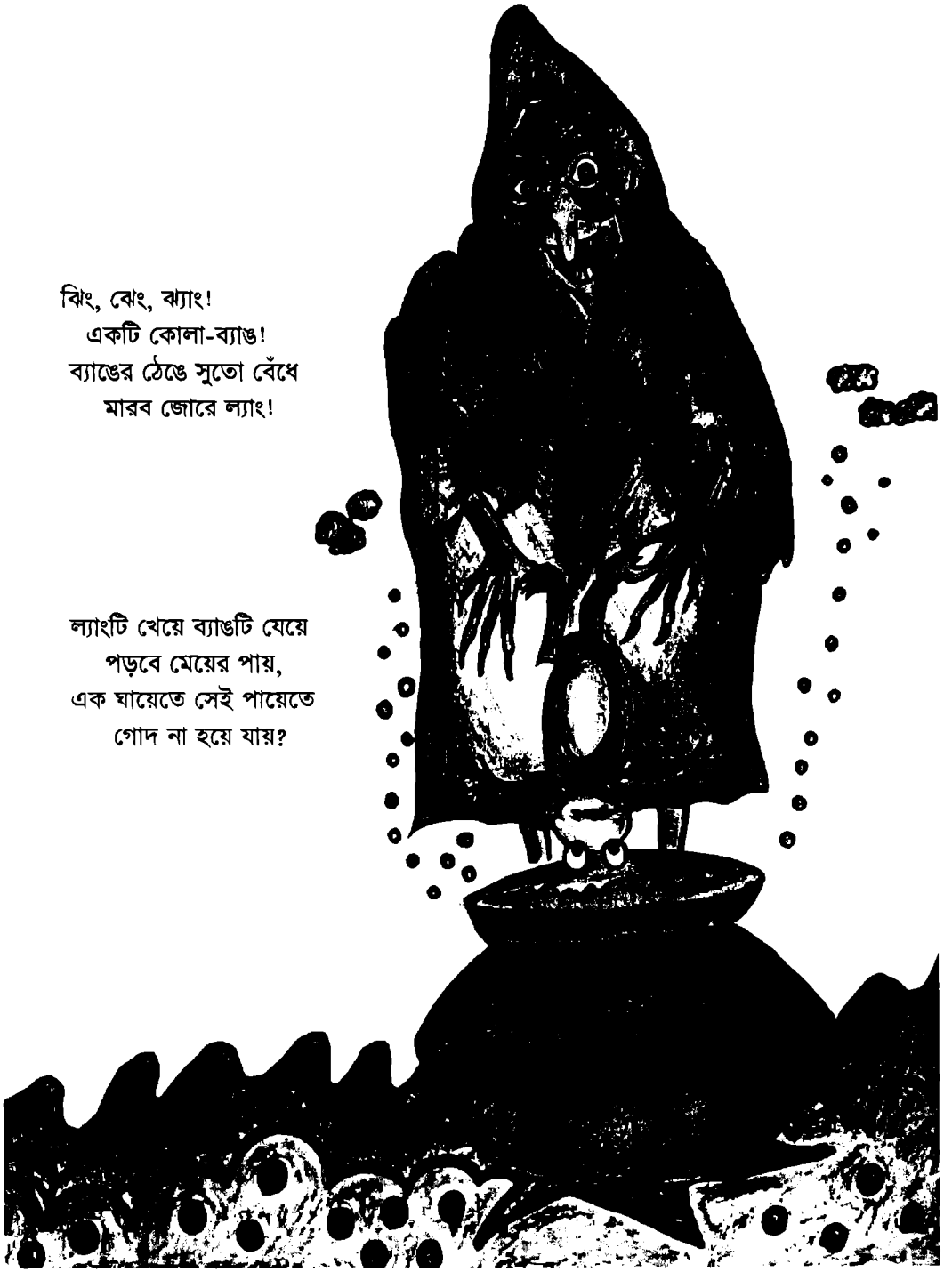

ঝিং, ঝেং, ঝ্যাং!
একটি কোলা-ব্যাঙ!
ব্যাঙের ঠেঙে সুতো বেঁধে
মারব জোরে ল্যাং!

ল্যাংটি খেয়ে ব্যাঙটি যেয়ে
পড়বে মেয়ের পায়,
এক ঘায়েতে সেই পায়েতে
গোদ না হয়ে যায়?

www.pathagar.com

শাস্তি

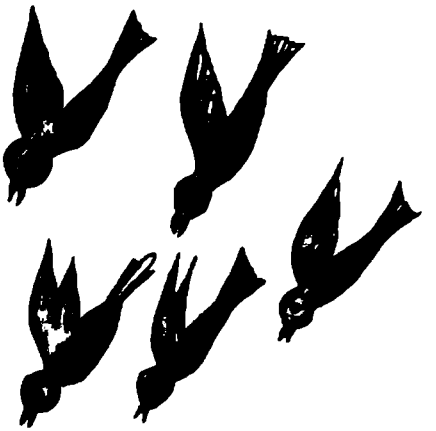

বাঁদরগুলো নাচে
লাফিয়ে উঠে গাছে ।
একটা কারণ আছে,
কেউ বাধা দেয় পাছে ।

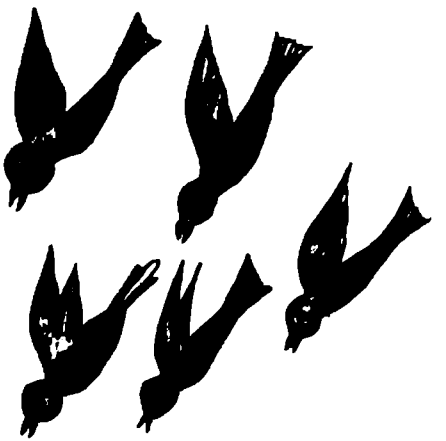

দু হাত ভরা চোরাইমাল
যাবে ওরা ধোলাইখাল!
বিকি দেবে আগামীকাল
অঢেল টাকায় হবে যে লাল!

ছুটে এল এক ঝাঁক কাক,
বলল তারা ছেড়ে যে হাঁক,
শাস্তি তোরা পাবিরে রাখ!
ঠোকর খাবি দু কুড়ি লাখ!

www.pathagar.com

প্রতিশোধ

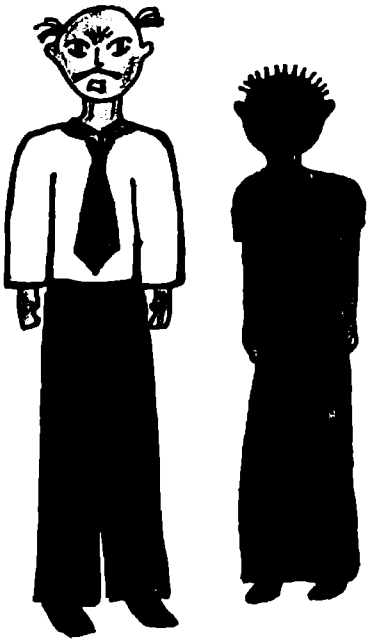

বড় সাহেবের গরম মাথা
ছোট সাহেব খান বকুনি,
বেয়ারা শোনে 'ছোটর' গালি
তুই তো একটা শকুনি!

বেয়ারা এসে শোধটা তোলে
বৌয়ের পিঠে মেরে কিল,
তেজের সাথে বৌটা তখন
বেড়ালটারে মারে ঢিল!

বেড়াল রেগে ইঁদুর ধরে,
ইঁদুর কাটে বস্তাটাই,
ভ্যাবলা ছেলে খাপ্পা হলে
বই পুড়িয়ে করে ছাই!

www.pathagar.com

বাংলা ভুলে গেছে

আমেরিকার রেস্তোরাঁতে
দুই বন্ধু এল,
বাঙালি এক লোককে তারা
পাশের 'সিটে' পেল।
"এই যে ব্যাটা দেখছ তুমি"
বলল একজন,
"কুকুর, গাধা, উল্লুক সে
খুবই ছোট মন!"
"ছি, ছি! কী সব বলছ তুমি!'
বলল সাথি তার,
"শুনে তিনি খাপ্পা হবেন,
মন হবে যে ভার!"
"খাপ্পা তিনি হবেন নাকো
যতই গালি দেই,
বাংলা কথা বোঝেন না যে
কিছ্ছু মনে নেই!"
গালি শুনে সেই লোকটার
মুখটা হলো লাল,
বাংলা ভাষা ভুলেই গেছে,
বলছিল সে কাল!

(একটি সত্য ঘটনা)

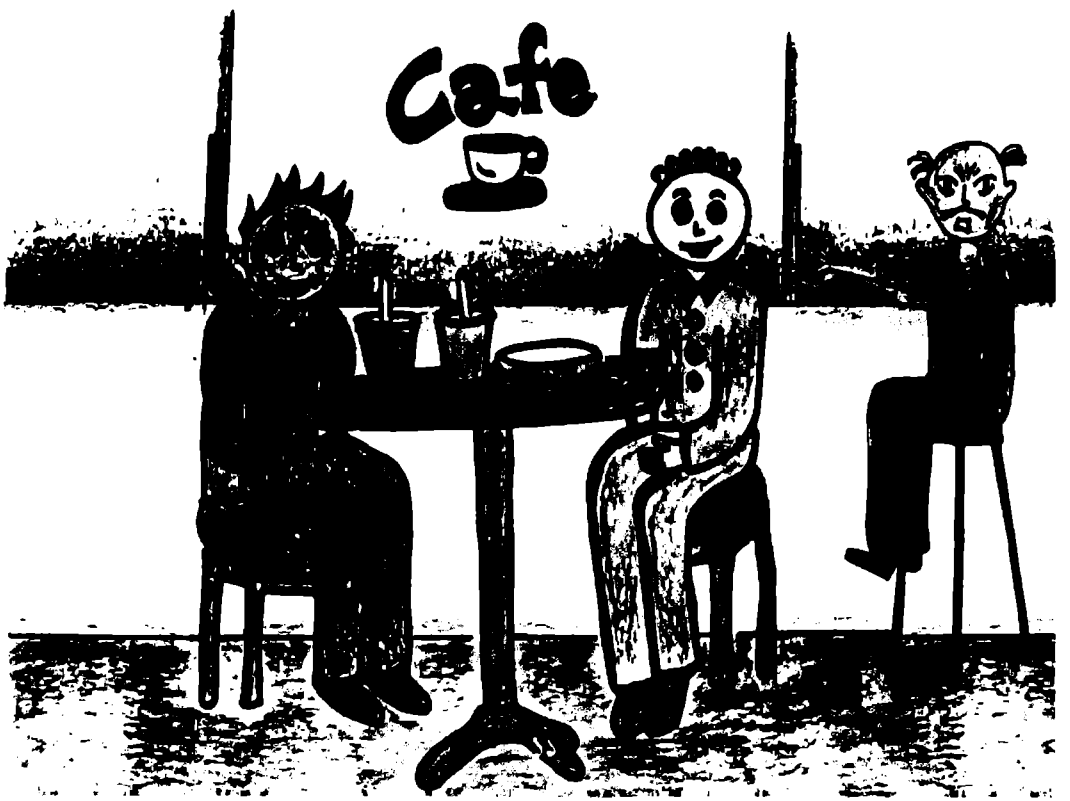

www.pathagar.com

সাদা পেঁচা

"পেঁচা কয়, পেঁচানি,
খাসা তোর চেঁচানি!"

মিছে কথা তবু মানি,
পাখি ওরা কালো জানি।

সাদা পেঁচা ধবধবে
কে দেখেছে আগে কবে?

সিয়াটেলে গিয়ে তবে,
উড্‌ল্যান্ড যেতে হবে।

দেখো সেথা বসে আছে
সাদা পেঁচা গাছে গাছে ।

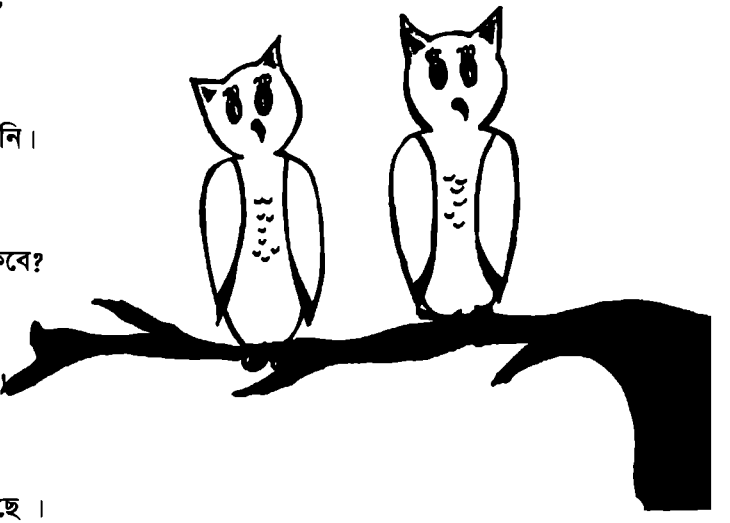

কট্‌মট্‌ পাখি

নীল ঝুঁটি কালো পাখি
লম্বাটে লেজ,
দেখে যেন মনে হয়
খুব আছে তেজ!

ফল-পোকা খেয়ে বাঁচে
মেক্সিকো দেশ,
মট্‌মট্‌ নাম তার
শোনায় না বেশ?

আসলে যে নয় তাহা
চুপচাপ খুব,
সুন্দর ও সুশ্রী
তেলরঙা বুক ।

www.pathagar.com

চালাকির সাজা

[ঈশপের গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

একদিন এক বেপারি ভাই,
লবণ কিনে নিয়ে,
ফিরছিল সে বাড়ির পথে
গাধার পিঠে দিয়ে।

পথেই পড়ে ছোট্ট নদী
হঠাৎ হোঁচট খেয়ে,
পড়ল গাধা এক্কেবারে
তার ভেতরে যেয়ে।

তীরে উঠে দেখল গাধা
লবণ গেছে গলে,
বোঝাটা বেশ হালকা এখন
জলে ভেজার ফলে ।

আর একদিন ফিরছে গাধা
পিঠে লবণ বোঝা,
পড়বে পথে সেই নদীটা
এগিয়ে গেলে সোজা।

আজকে গাধা ইচ্ছে করেই
পড়ল নদীর ধার,
চালাকিটা ফেলল বুঝে
বেপারি আজ তার।

বেপারিও আচ্ছা চালাক,
বুদ্ধি গিঁটে গিঁটে,

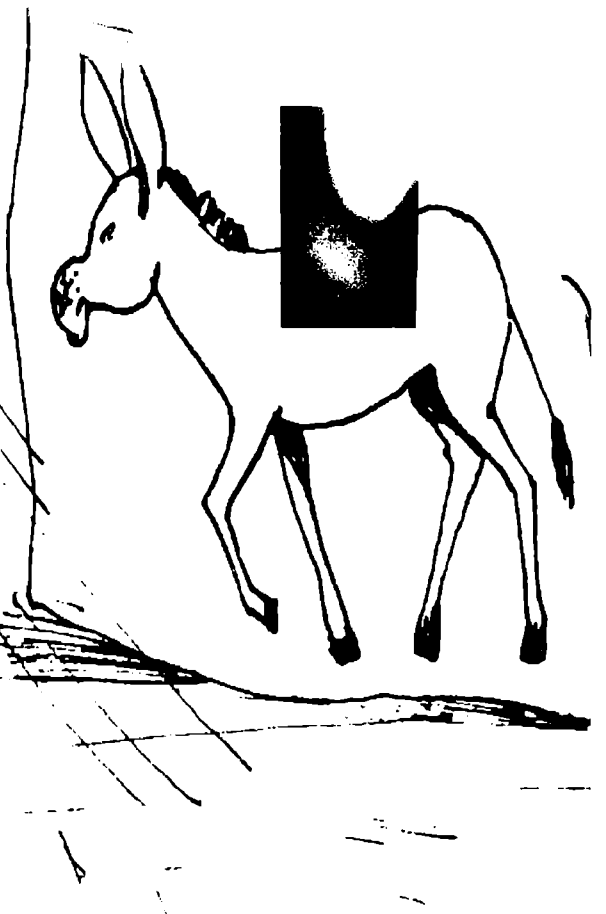

www.pathagar.com

পরদিন সে তুলো কিনে
তুলল গাধার পিঠে।

সুযোগ বুঝে যেই না গাধা
পড়ল নদীর পর,
তুলো ভিজে ওজন কী ভার!
এখন ডুবে মর্!

শেষ অবধি কষ্টে বহু
উঠল নদীর তীরে
ভারি বোঝা নিয়ে এখন
হাঁটছে ধীরে ধীরে ।

সারাটা পথ এবার গাধা
চলল ধুঁকে ধুঁকে,
চালাকিটা বৃথাই গেল,
লাগছে ব্যথা বুকে।

www.pathagar.com

চতুর শেয়ালের জবাব

ময়রা বাড়ি এসে শেয়াল
দেখল দইয়ের হাঁড়ি,
"কী মজারে! খাবরে আজ
যত্‌তোটা দই পারি!

এরপরেতে শেয়াল মামা
পেটটি পুরে খায়,
খেতে গিয়ে মাথাটা তার
পাত্রে ঢুকে যায়!

এমনি সময় ময়রা এসে
মারল ছুড়ে লাঠি,
ভাঙা হাঁড়ির মুখটা মামার
রইল গলায় আঁটি!

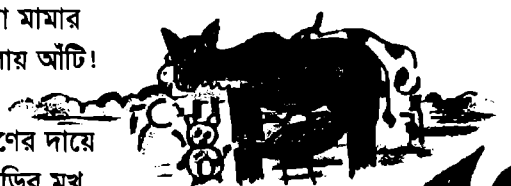

ছুটছে শেয়াল প্রাণের দায়ে
গলায় হাঁড়ির মুখ,
"যাচ্ছে তাই দুনিয়াটা
নেইকো কোথাও সুখ!"

পথের ধ[illegible]
[illegible] করে বল[illegible]
"কী হয়েছে শেয়ালমা[illegible]
ঝুলছে কী[illegible]

দেঁতো-হা[illegible] হেসে শেয়াল
বলল সেদিক চেয়ে,
"মহা দামি একটা জিনিস
গেছি আমি পেয়ে!"

"হেঁয়ালিটি রেখে মামা
তাড়াতাড়ি বলো,
ডাকছে মামি ঐ শোনা যায়
শীগরি ঘরে চলো!"
"শালগ্রাম নামটি ইহার
বিষ্ণুদেবের দানে,
হঠাৎ পেয়ে, গলায় পরে
চলছি তাঁরই পানে!
সর্ব রকম কুকাজ ছেড়ে
ধর্মে দিছি মন,
গলায় বেঁধে শালগ্রামটি
চলছি বৃন্দাবন!"

টীকা : বিষ্ণুদেব - হিন্দুদের একজন দেবতা।
শালগ্রাম - যে পাথরকে বিষ্ণুর প্রতীকরূপে হিন্দুরা পূজা করে ।
বৃন্দাবন - হিন্দুদের তীর্থস্থান।

www.pathagar.com

ডলার বনাম টাকা

"বর এসেছে! বর এসেছে!
'গেট-ধরতে' হবে,
অনেক টাকা করব দাবি
ছাড়ব দিলে তবে!"

"এক কথার মানুষ আমি"
বলল হেসে বর,
" যা চাইবে, ঠিক তা পাবে,
হবে না নড়চড়!"

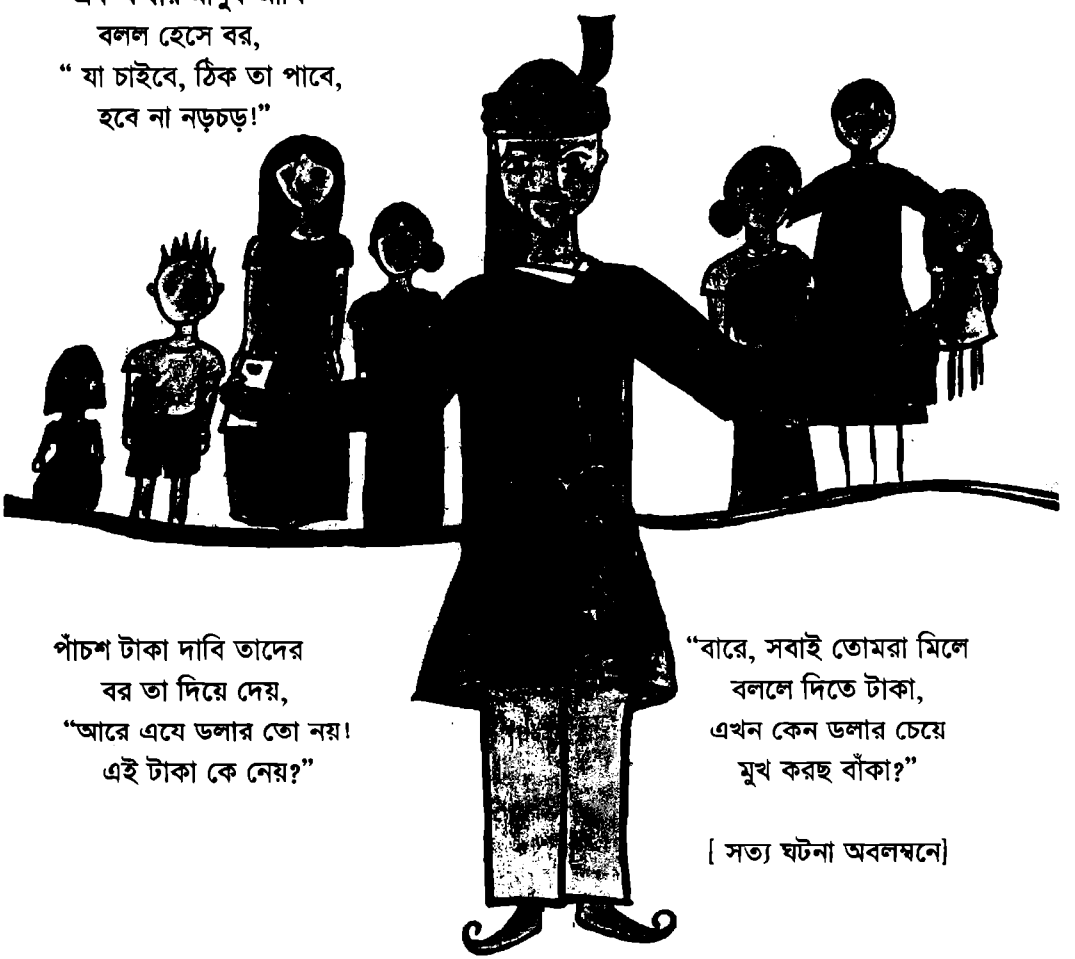

পাঁচশ টাকা দাবি তাদের
বর তা দিয়ে দেয়,
"আরে এযে ডলার তো নয়!
এই টাকা কে নেয়?"

"বারে, সবাই তোমরা মিলে
বললে দিতে টাকা,
এখন কেন ডলার চেয়ে
মুখ করছ বাঁকা?"

[সত্য ঘটনা অবলম্বনে]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গৌতমবুদ্ধের দেশে (ভ্রমণকাহিনী)

হেলেনা খান

উৎসর্গ

আমার অতি আদরের তিন
নাতনি ইষিতা ডারলেন, ফারিয়া
নওরীন ও ফায়েযা ফাহসীকে
- হেলেনা খান

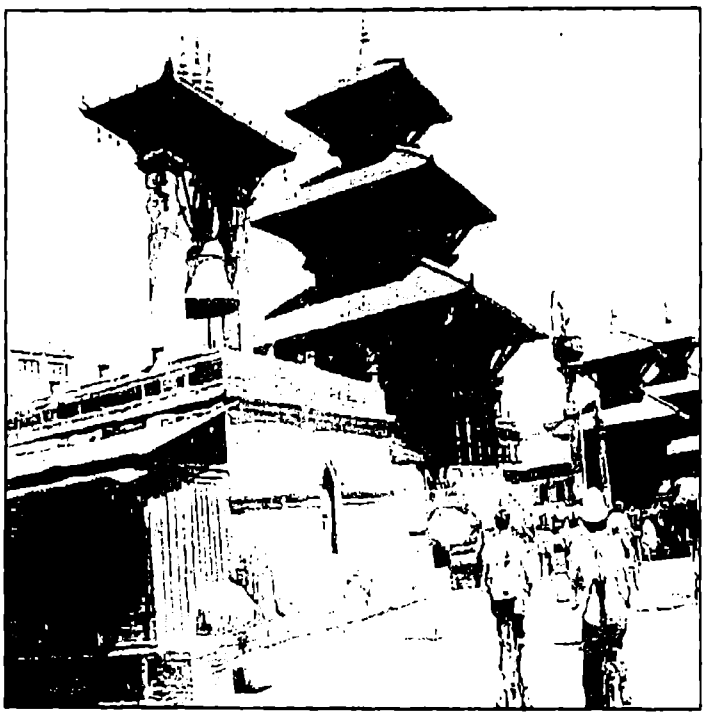

প্রথম প্রকাশ : চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা
১ম সংস্করণ : মাঘ ১৩৯৬
ভ্রমণকাল : এপ্রিল, ১৯৭৬
প্রচ্ছদ শিল্পী : সরদার জয়নুল আবেদীন

www.pathagar.com

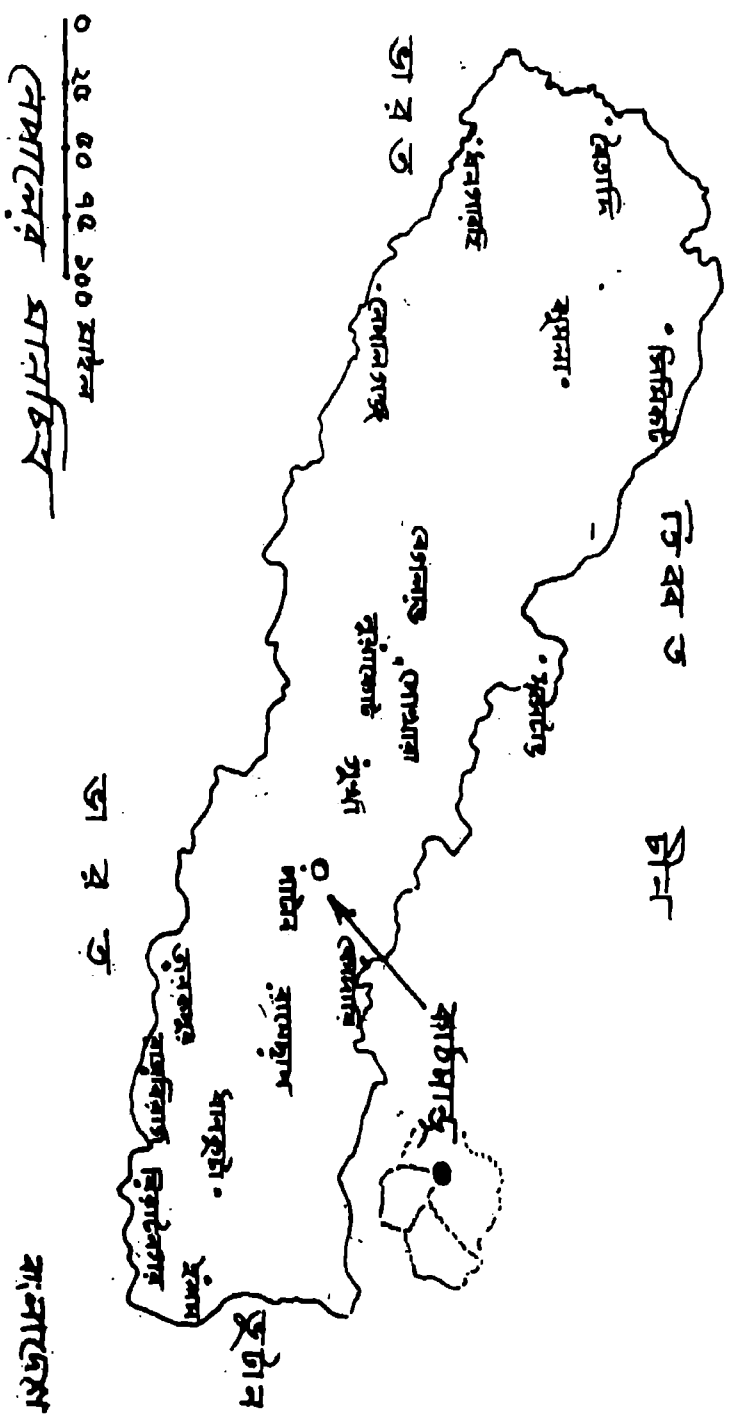

www.pathagar.com

এক

কাঠমণ্ডু বিমান বন্দরে

প্লেনের জানালা দিয়ে বিশাল পাহাড়টা নজরে পড়ে শেফার। খুব উঁচু। প্রায় আকাশ ছোঁয়া তার চূড়া। সূর্য তখন মাথার ওপরে। পাহাড়ের গায়ে ও চূড়ার ওপরে প্রখর রোদ ছড়াচ্ছে।

ঃ দেখ, দেখ আম্মু, পাহাড়টা কী ভীষণ ঝলমল করছে! ওটা কোন পাহাড় আম্মু?

শেফার খুশি ও উচ্ছ্বাস যেন ওই পাহাড়ের চূড়া ছুঁয়ে যায়।

ঃ ওটাই তো হিমালয়, আর তার সবচেয়ে উঁচু চূড়া মাউন্ট এভারেস্ট! দেশী নাম সাগরমাথা।

শেফার বইয়েতে পড়া এভারেস্ট বিজয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

ঃ নেপালের শেরপা তেনজিংই তো এই মাউন্ড এভারেস্টে উঠেছিলেন তাই না?

ঃ হ্যাঁ, তাঁর সাথে নিউজিল্যান্ডের এডমন্ড হিলারীও ছিলেন। তারিখটা মনে আছে তো? ১৯৫৩ সনের ২৯শে মে। সামনের সিটে বসা শেফার আব্বা। তিনি সেখান থেকে ঘাড়ে ফিরিয়ে বললেন,

ঃ সাগরমাথার আশে পাশে দেখ শেফা; তার সঙ্গীরা যেন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গীদেরও নাম আছে।

ঃ কী নাম আব্বু?

ঃ যে কটা জানি তা হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাকালু, অন্নপূর্ণা, ধৌলাগিরি ও মানাসলু।

বাংলাদেশ বিমান উড়ছে। শেফার মন তার চেয়েও দ্রুত গতিতে উড়ে চলেছে না দেখা রাজ্যটির দিকে। এক সময় বিমানবালার স্বর শোনা যায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কাঠমণ্ডু বিমান বন্দরে অবতরণ করছি। আপনার নিজ নিজ 'সেফ্‌টি বেল্ট' কোমরে বেঁধে নিন! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বড়দের মতো করে বলে শেফা,

ঃ মাত্র এক ঘণ্টায় আমরা ঢাকা থেকে কাঠমণ্ডুতে পৌঁছে গেলাম!

ঃ হ্যাঁ, নেপাল তো আমাদের থেকে খুব দূরের দেশ নয়! আম্মা শেফার কোমরে সেফ্‌টি বেল্টটি বেঁধে দিতে দিতে বললেন।

বাংলাদেশ বিমান আস্তে আস্তে কাঠমণ্ডু বা কান্তিপুর বিমান বন্দরে নামল। দিনটি ১৯৭৬ সালের ৭ই এপ্রিল।

শেফার আব্বা রেজা শাহেদ ঢাকার একজন রোটারিয়ান। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে এবার রোটারি ইন্‌টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৫ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তিনদিন ধরে চলবে সম্মেলন। বাংলাদেশের রোটারিয়ানদের মধ্যে শেফার আব্বা একজন। সাথে এনেছেন শেফার আম্মা 'এ্যান' (রোটারিয়ানের স্ত্রীকে রোটারিএ্যান, সংক্ষেপে 'এ্যান' বলা হয়) শায়লা শাহেদকে।

আর-কী মজা শেফার! তাকেও তাঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। নেপালের মাটিতে পা দিয়ে আম্মা বললেন, গৌতমবুদ্ধের দেশ যে নেপাল সে তো তোমাকে আমি আগেই বলেছি। রামায়ণের সীতা দেবীর জন্মস্থানও কিন্তু এই নেপালেই।

কথা বলতে বলতে তারা বিমান বন্দরের কাস্টম্‌স্ চেকিং এর দিকে চলে যান। বাইরে এসে দেখা গেল কাঠমণ্ডু রোটারি ক্লাবের ক জন কর্মকর্তা তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের রোটারি গভর্নর ইফতেখারুল আলমও রয়েছেন। তিনি আগেই গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

www.pathagar.com

বিমান বন্দরের গেটে দু টি বড় কোচ তাঁদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কোচে করে তাঁর 'প্রথমে থাপাথলিতে যাবেন। থাপাথলিতে কাঠমণ্ডু রোটারি ক্লাব অবস্থিত।

শেফাদের সাথে আম্মার বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রয়েছেন। নীলুফার চাচি, মাল্‌কা পারভীন চাচি, রোকেয়া খালা, মলি খালা, রাজিয়া ফুফু, লুৎফুন্নেসা চাচি, হেলেন খালা ও কবরী আন্টি। তাঁরা সবাই রোটারিএ্যান।

দুই

হিন্দুরাষ্ট্রের অধিবাসী, আবহাওয়া, প্রাণী প্রকৃতি ইত্যাদি

আসবার আগে আব্বা আম্মা শেফাকে নেপালের ইতিহাস, ভূগোল, লোক সংখ্যা ইত্যাদি ভালভাবে বলে একেবারে মনে গেঁথে দিয়েছেন। নেপাল একটি স্বাধীন, সার্বভৌম হিন্দুরাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে নেপালই সরকারিভাবে একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত। হিন্দুধর্মের অধিবাসী এখানে শতকরা ৯০ ভাগ ও বৌদ্ধ ৭ ভাগ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকও রয়েছে, তবে সংখ্যায় খুব কম। বর্তমানে এখানে লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ। মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের মত হবে । যদিও নেপাল একটি হিন্দুরাজ্য, কিন্তু পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মকেও সমান মর্যাদা দেয়া হয়। নেপালের আদিবাসীরা ছাড়া অধিকাংশই মধ্য এশিয়া, ভারত ও তিব্বত থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছে।

এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গোত্রের লোকের বাস। তাদের ভাষা, উপভাষা, ভিন্ন ধরনের। কমপক্ষে গোটা চল্লিশেক ভাষা রয়েছে। পোশাক পরিচ্ছদও নানা রকমের। নিম্ন সমতল ভূমিতে যারা থাকে, তাদের সামাজিক জীবনধারা, প্রথা এমনকি চাষ-পদ্ধতিও সুউচ্চ পর্বতমালার অধিবাসীদের থেকে ভিন্ন ধরনের। নেপালের শেরপা গোত্রের লোকদের 'বরফদেশের বাঘ' বলা হয়, কেননা তাদের অনেকেই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পনেরো হাজার ফুট উঁচুতেও বাস করে থাকে। সুউচ্চ হিমালয়ে যারা বসবাস করে, তারা স্বভাবতই খুব পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু।

রইস, লিম্বু, তামাঙ্গ, মাগার, গুরাঙ্গ, থাকালি গোত্রের লোকদের সাধারণত মধ্য পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করতে দেখা যায়। ডান উপত্যকা ও নিম্নভূমি তরাই অঞ্চলে সাধারণত ব্রাহ্মণ, রাজপুত, থারু, মাঝি, রাজবংশী, ধীমল গোত্রের লোকদের বাসস্থান।

নেপালে বহু রকমের বিচিত্র মানুষের বাস অথচ সকলেই তারা শান্তি, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় একসূত্রে বাঁধা।

নেপালকে বলা হয় হিমালয়ের দেশ। কেননা, হিমালয় পর্বতমালা উত্তর দিকে থেকে নেপালকে ঘিরে রেখেছে। নেপালের উত্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের তিব্বত অঞ্চল, দক্ষিণে ও পশ্চিমে ভারত এবং পূর্বে ভুটান।

আয়তন ৫৪,৩৬২ বর্গমাইল। আমাদের বাংলাদেশের চেয়ে সামান্য কিছুটা ছোট! দের্ঘ্যে পূর্ব-পশ্চিমে রাজ্যটি আনুমানিক ৫৫০ মাইল, আর প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে ৯০ থেকে ১৫০ মাইল।

নেপালের জলবায়ু ও আবহাওয়া স্থান বিশেষে ভিন্ন রকমের। নেপাল চার ঋতুর দেশ। মার্চ থেকে মে বসন্তকাল। জুন থেকে আগস্ট গ্রীষ্মকাল। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত শরৎকাল। কী শীত, কী গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই জলবায়ু ও আবহাওয়া বিস্ময়করভাবে সহনীয় ও আরামপ্রদ।

প্রকৃতি এই দেশটিকে সব ঋতুতেই মনোহর করে রেখেছে।

www.pathagar.com

নেপালের শ্রমজীবীদের মধ্যে ৯৩ ভাগ কৃষক। আমদানি জিনিসের মধ্যে রয়েছে কাপড়, সিগারেট, পেট্রল, কেরোসিন, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, কাগজ, ইস্পাত, চা, চিনি, ও লবণ। নেপাল রপ্তানি করে চাল, শস্য, চামড়া গবাদি পশু, পাট, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি।

নেপালের শহরগুলোতে ডলার, পাউন্ডের পাশাপাশি ভারতীয় মুদ্রাতেও বেচাকেনা চলে। নেপালের মুদ্রা রূপী। এগারো রূপীতে এক ইউ. এস. এ. ডলার।

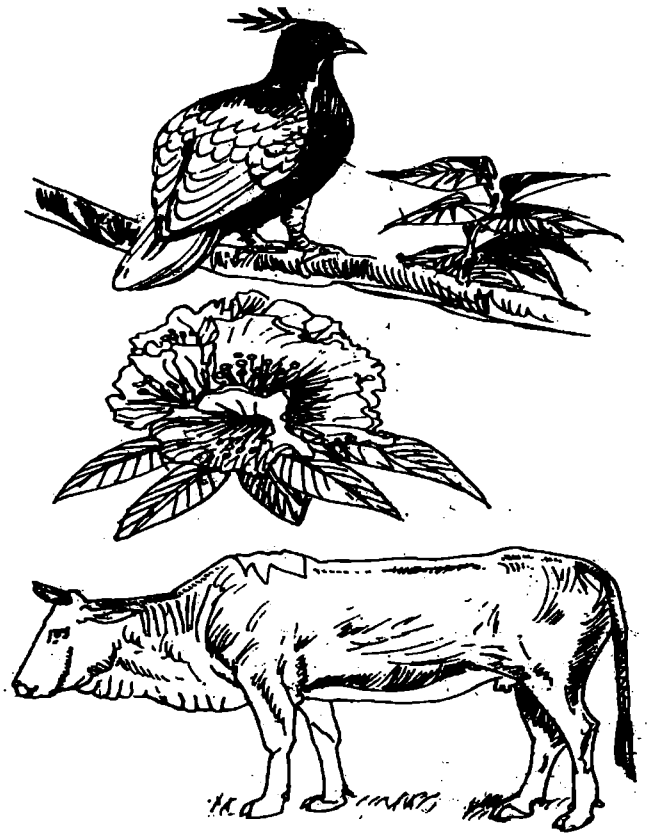

নেপালের জাতীয় পাখি 'ডানফে', জাতীয় ফুল 'রোডোডেনড্রন' ও জাতীয় পশু 'গরু'।

কোনো কোনো বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও ভারত ও নেপালোর মধ্যে বিশেষ একটি সুসম্পর্ক রয়েছে। তাদের রাষ্ট্রভাষা দুটিও (হিন্দিও নেপালি) একই দেবনাগরী হরফ দিয়ে লেখা হয়। নেপালি ভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে এবং হিন্দির সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে।

অফিসের কাজকর্ম অধিকাংশ নেপালি ভাষাতেই সম্পন্ন করা হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার মাধ্যম নেপালি। ভাষা হিসাবে নেপালে ইংরেজির অবস্থা বাংলদেশের মতোই। এখানেও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি শেখা বাধ্যতামূলক। তবে বাস্তবে ইংরেজির চর্চা নগণ্য। অবশ্য উচ্চ শিক্ষিত নেপালিরা ইংরেজি ভাল বলতে ও লিখতে পারে।

সমগ্র এশিয়াতে নেপালের বন-জঙ্গলে যত রকমের উদ্ভিদ ও জীবজন্তু দেখা যায়, তা অন্যত্র সচরাচর চোখে পড়ে না। বনে শাল, শিশু, ওক, পাইন ও বিচিত্র সুন্দর সুন্দর ফুল গাছে ভরা। জাতীয় ফুল রোডোডেনড্রোন।

www.pathagar.com

অঞ্চল ভেদে জন্তু জানোয়ারও ভিন্ন রকমের। গরু নেপালের জাতীয় পশু। তাছাড়া মহিষ, চিতাবাঘ, বরফ চিতাবাঘ, এক শিংঅলা গন্ডার, হাতি, বুনো ষাড়, শূকর, চার শিংঅলা হরিণ, গর্জনকারী হরিণ, ঘোরাল, লাল প্যাণ্ডা, হিমালয়ী কাঠ বিড়ালী, ইঁদুর, খরগোশ, নীল ভেড়া, নীল গাই, বুনো চমরী গাই, বিরাটাকার তিব্বতীয় মেষ—এ ধরনের কত যে জন্তু জানোয়ার আর কত যে আর বিচিত্র ধরনের পাখি! অদ্ভুত পাখির মধ্যে দাঁড়িয়ালা শকুন, বরফ মোরগ, সাদা কাক, চউফ, বাণ্টিঙ্গ, ময়ূর জাতীয় খেলোয়াড় পাখি ফেজ্যাণ্ট, ক্ষুদে সুশ্রী গায়ক পাখি রডস্টারটস্ আরো কত কী ! জাতীয় পাখি হলো ড্যান্‌ফে। ভারি সুন্দর পাখি! সুন্দর চোখ, মাথায় ছোট সবুজ পাতার মতো ঝুঁটি, গলা ও লেজের রং লাল, পালক হলদে ও নীল রঙের।

নদীতে রয়েছে কুমির ও ডলফিন।

রাজধানী ও প্রধান শহর কাঠমণ্ডু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক ৪৪২৩ ফুট উঁচুতে বাগমতি ও বিষ্ণুমতি নামক দুটি নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত।

তিন

ইতিহাস কথা কয়

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী শেফা নেপালের ইতিহাসও মোটামুটিভাবে মনে রেখেছে।

নেপালের সুপ্রাচীন ইতিহাস হলো কাঠমণ্ডু উপত্যকার ইতিহাস। কাঠমণ্ডু, পাতান ও ভক্তপুর বা ভাদগাঁও এ তিনটি প্রধান শহর নিয়ে কাঠমণ্ডু উপত্যকা।

যীশুখ্রিস্টের জন্মেরও বহু বছর আগে নেপালি সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। প্রাচীন হাতে লেখা বই হতে জানা যায় যে এই উপত্যকায় প্রথম বিদেশী শাসক ছিলেন কিরন্তিসরা এবং তাঁরা বহু বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৭ অব্দে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধ হিমালয়ের পাদদেশ কপিলাবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে তিনি যখন কাঠমণ্ডু উপত্যকায় ভ্রমণ করতে এসেছিলেন, তখন সেখানে কিরন্তিস্ রাজারা রাজ্য শাসন করছিলেন।

কিরন্তিসদের পর আসেন লিচ্ছবিরা। বলা হয়, লিচ্ছবিরা ২৫০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারত থেকে নেপালে বসবাস করতে আসেন।

কাঠমণ্ডু শহরটিকে বর্তমান আকারে রূপ দেন রাজা গুণকমা দেব। সে ৭২৩ সনের কথা।

এরপর রাঘবদেবের সময় ৮৮০ খ্রিস্টাব্দে লিচ্ছবি রাজত্বের অবসান ঘটে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা অরিমল্লের সময়ে মল্ল রাজত্বের শুরু এবং পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে নেপালে তাদের বিশাল এক রাজত্ব গড়ে ওঠে। এ সময়ে কান্তিপুর (যা পরবর্তী সময়ে কাঠমণ্ডু নামে রূপান্তরিত হয়েছিল)

শহরের গোড়াপত্তন হয়। এই মল্ল রাজাদের আমলেই নেপালে অসংখ্য মন্দির ও বড় বড় দালান-কোঠা গড়ে ওঠে। সেগুলো খুবই সুন্দর ও কারুকার্যখচিত।

১৩৮৬ খ্রিস্টাব্দে নেপালের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম জয়স্থিতি মল্ল। এরপর যক্ষমল্ল নামে এক রাজা সুদীর্ঘ তিপ্পান্ন বছর ধরে সুচারুরূপে রাজত্ব করেন। ১৪৮০ সালে তিনি নেপালকে চার ভাগে ভাগ করেন এবং সেগুলো পৃথক পৃথকভাবে তাঁর চার পুত্রের হাতে তুলে দেন। শুরু হলো ভাঙ্গন। নেপালে রাজতন্ত্র ভালভাবে কায়েম হয়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে শাহের আমল থেকে পৃথ্বিনারায়ণ রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। সেজন্য তাঁকে নেপালের 'সুসংঘবদ্ধ একতার জনক' বলা হয়।

১৮৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল, সুদীর্ঘ এই একশত পাঁচ বছর সময়কে নেপালের ইতিহাসকে 'অন্ধকার যুগ' বলে গণ্য করা হয়।

www.pathagar.com

এ সময়ে বংশানুক্রমে রানা প্রধান মন্ত্রীরা যার যেভাবে খুশি রাজত্ব পরিচালনা করেন। ফলে ১৯৫০- ৫১ সালে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজা ত্রিভুবন শাহ্। এই বিপ্লবের মাধ্যমেই রানা প্রশাসনের অবসান ঘটে।

রাজা ত্রিভুবন এক জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এজন্যে তাঁকে নেপালের 'জাতির পিতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

১৯৫৫ সালে তিনি মারা গেলে তাঁর পুত্র রাজা মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। নেপালে প্রকৃত রাজতন্ত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি ১৯৫৯ সালে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়ে ১৯৬০ সনের ১৫ই ডিসেম্বর থেকে নেপালে নির্দলীয় গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজা মহেন্দ্র মৃত্যুবরণ করেন এবং বর্তমানের মহমান্য রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব সিংহাসনে বসেন।

চার

এগিয়ে চলার পথে

নেপালে গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত প্রথার মাধ্যমে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। রাজা ও রাণী ঐশ্বর্য রাজ্য লক্ষ্মী দেবীকে প্রজারা খুব সম্মানের চোখে দেখে। তাঁদের স্থান রাজ্যে সবার ওপরে। তাঁরাও প্রজাদের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

তিনি গরিব কৃষকদের কৃষিকার্যের উন্নতমানের প্রকল্প নেয়, তাদের ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রির ব্যবস্থা করেন।

তিনি দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য ১৯৪৭ সনে সরকারিভাবে নূতন শিল্পসংক্রান্ত কার্যধারা গ্রহণ করেছেন। পরে জাতীয় বন উন্নয়ন পরিকল্পনা করে, তা কার্যকরীও করেছেন।

সকল প্রকার জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি 'পনের বছরের স্বাস্থ্য প্রকল্প' (১৯৭৫-১৯৯০) কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণ পুরোপুরিভাবে শুরু হয়ে গেছে। এই প্রকল্পের কাজ অনুযায়ী বসন্ত, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, গলগণ্ড ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গরিব লোকেরা যাতে চিকিৎসার যথার্থ সুযোগ সুবিধা পেতে পারে,

সেজন্য দেশের দূর দূরান্ত অঞ্চলেও হেলথ্ সেন্টার তৈরি করা হয়।

পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃমঙ্গল ও শিশু চিকিৎসার প্রকল্পগুলো ইতোমধ্যেই কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করেছে এবং সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে।

পাঁচ

হনুমান ধোকায়

কোচ চলছে।

শেফার ব্যগ্র চোখের তারা দুপাশের বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট হোটেল-রেস্তোরাঁ, মন্দির-প্যাগোডা, ফুল-ফলে শোভিত গাছ-পালা ও পাহাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা থাপাথলিতে এসে পৌঁছে। সেখানে রেজিস্ট্রেশন পর্বের পর রোটারিয়ানরা যে যার পছন্দমত হোটেলে চলে যান।

পথে আসতে শেফা লক্ষ্য করে পুরুষেরা অধিকাংশই পরেছে সাদা চোস্ত-পাজামা, গায়ে শেরওয়ানির মতো সাদা জামা। কলারের অংশটা একদিকে টানা দেয়া। তাদের মাথায় নেপালি টুপি। টুপিটা ওপরের দিকে চ্যাপ্টা ধরনের। এটাই নেপালি পুরুষদের জাতীয় পোশাক। তবে ফুল প্যান্ট ও শার্টও অনেকে পরেছে। তাছাড়া ধুতি ও লুঙ্গি পরা লোকও দেখা গেল।

www.pathagar.com

মহিলারা রংচঙে কাপড় কোমরে জড়িয়ে পরেছে। গায়ে ফুল হাতা ঢোলা ব্লাউজ। শাড়ি পরা মহিলাও দেখা গেল অনেক। শাড়ি পরার ধরনটি ঠিক বাংলাদেশের শহরের মেয়েরা যেভাবে পরে, সেরকম। অবশ্য ফুল প্যান্ট শার্ট বা মিডি ম্যাকসি পরা মেয়েও যথেষ্ট নজরে পড়ে।

লোকজনদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। বেশির ভাগ মেয়ে-পুরুষের রং ফরসা, চোখ ছোট ও টানা।

মোটামুটি একটি ভালো হোটেল 'সেন্ট্রাল হোটেল'। অন্যান্য খালা-খালু, চাচা-চাচিরা এখানে এসে উঠেছেন। তাঁরা হলেন ডাঃ ওয়ালিউল্লাহ্ খালু, রোকেয়া খালা, এ. বি. ভূঁইয়া চাচা, নীলুফার চাচি, ডাঃ এ. আর. খান খালু, হেলেন খালা, ডাঃ মীর্জা চাচা, শামসুজ্জোহা খালু-মলি খালা ও নানি অর্থাৎ মলি খালার আম্মা বেগম খালেদা হাবীব।

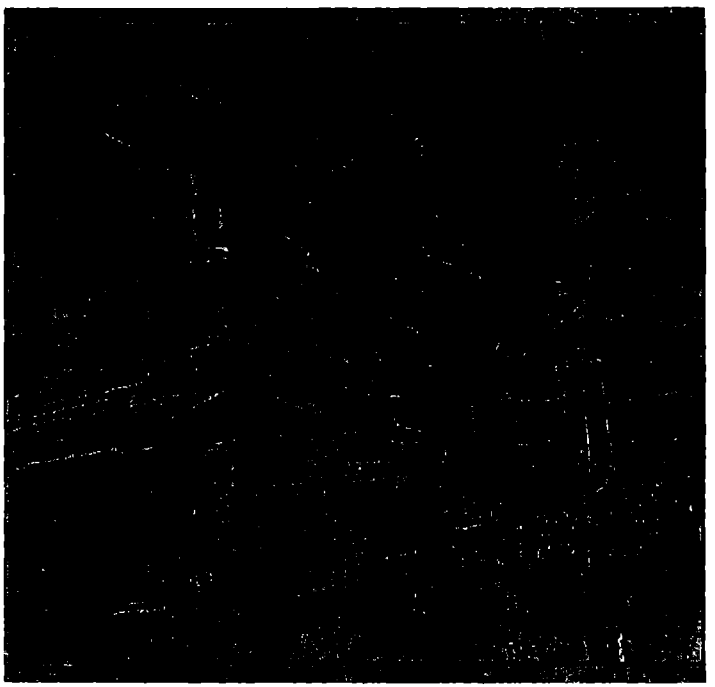

দরবার স্কেয়ার (নেপাল)

দুপুরে খাওয়া দাওয়াসেরেই শেফা তার আব্বা আম্মা, খালা খালুদের সাথে বের হয়ে পড়ে। কাছে যা যা দেখবার আছে, পায়ে হেঁটেই তারা দেখে নেবে।

থাপাথলিতে ইফতেখারুল চাচা কথা প্রসঙ্গে আব্বাকে বলছিলেন যে, নেপালের জাতীয় আয়ের শতকরা ১৭ ভাগই পর্যটন খাত থেকে এসে থাকে।

খুব কাছে দরবার স্কোয়ার বা হনুমান ধোকা। এককালে নেপালের রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল।

হনুমান ধোকায় এসে একজন গাইড পাওয়া গেল। নাম রাহুল। হনুমান ধোকায় ঢুকতে গিয়েই শেফারা দেখে বিরাট আকারের একটি হনুমানের মূর্তি । লাল রঙের।

রাহুল দু হাত জোড় করে মূর্তিটিকে প্রণাম করে।

ঃ হনুমানজী আমাদের দেবতা! বলল রাহুল।

ঃ এটি রাজা প্রতাপমল্ল ১৬৭২ সনে তৈরি করেছিলেন।

www.pathagar.com

হনুমান মূর্তিটির ডান দিকে দরবার স্কোয়ারের স্বর্ণতোরণ। এটিই প্রধান দরজা। দু দিকে দুটি মূর্তি সিংহ ও সিংহীর।

সোনার দরজার ওপরে খোদাই করা লিপি থেকে জানা যায়, এটি ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে রাজা গ্রিবণযুদ্ধা বিক্রমের সময় তৈরি করা হয়েছিল। দরজার খুঁটি ও কপাটের খোপগুলো সোনা দিয়ে তৈরি। ওগুলোর ওপরে নানান রকম দেব-দেবীর মূর্তি। অনুমান করা হয়, এখানকার সব ক টি মূর্তি রাজা প্রতাপমল্লের সময়েই তৈরি করা হয়েছিল সেই ১৬৪১ থেকে ১৬৪৭ সনের মধ্যে।

স্বর্ণ তোরণের মধ্য দিয়ে শেফারা বিরাট বিরাট এক একটি চত্বরে ঢোকে।

দরবার স্কোয়ারের বড় বড় দালানগুলোর ছাদ সব প্যাগোডার মত তৈরি। কাঠ খুবই দামি, আর তাতে সূক্ষ্ম কাজ করা।

একটি অত্যন্ত উঁচু প্যাগোডা ডিজাইনের সুন্দর মন্দিরের কাছে এসে বলল রাহুল,

ঃ এটি তালেজু মন্দির! ১৫৬৪ সনে রাজা মহেন্দ্র মল্ল তৈরি করেছিলেন।

এরপর বিরাট একটা দোতলা ছাদের প্যাগোডা মন্দিরের কাছে পৌঁছেছেন। রাহুল শুরু করে,

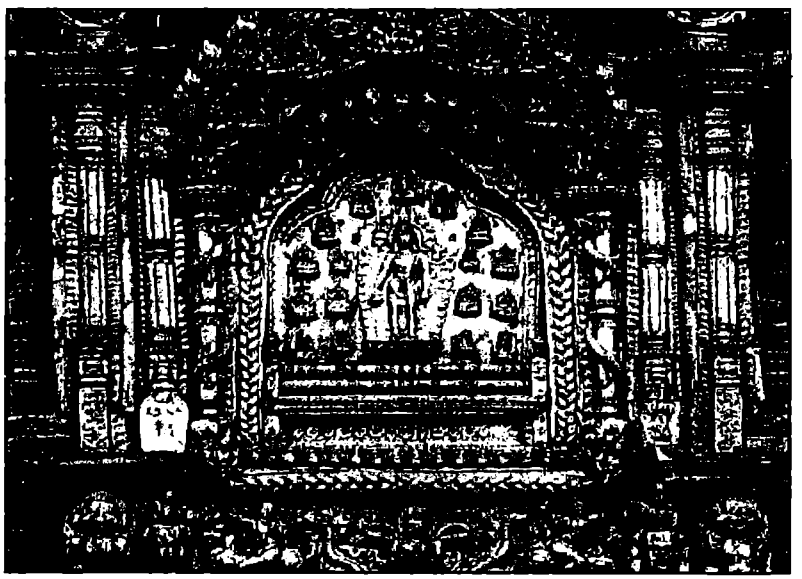

সোনার জানালা, দরবার স্কোয়ার (নেপাল)

ঃ এ মন্দিরের নাম কাষ্ঠমণ্ডপ। এটি নির্মাণ করা হয়েছিল ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন নেপালের সিংহাসনে ছিলেন রাজা লক্ষ্মী নরসিংহ মল্ল।

দরবার স্কোয়ারের কাছে মাচ্ছেন্দ্রনাথ মন্দিরের পাশে বিশাল একটা শাল গাছ গজিয়ে উঠেছিল। মন্দিরের পুরোহিত রাজার অনুমতি নিয়ে ঐ একটি মাত্র গাছের কাঠ দিয়ে একটি মন্দির তৈরি করলেন এবং নাম দিলেন কাষ্ঠমণ্ডপ। এই কাষ্ঠমণ্ডপ নাম থেকেই নেপালের পুরনো রাজধানী কান্তিপুরের নাম বদলে গিয়ে কাঠমণ্ডু রাখা হয়েছিল। মন্দিরটির নিচতলা খোলা। চার কোণে চারটি হাতির মুখওয়ালা গণেশের মূর্তি।

এরপর রাজা প্রতাপমল্ল ও তাঁর চার ছেলের মূর্তি দেখল শেফারা। মূতিগুলো একটা গোটা প্রস্তর স্তম্ভের ওপর স্থাপিত।

www.pathagar.com

ছয়

কুমারী-জীবন্ত দেবী দর্শনে

পরদিন সকাল। আগের ব্যবস্থা অনুযায়ী রাহুল ঠিক সময়েই হোটেলে এসে গেছে। তার সাথে শেফারা হেঁটে দরবার স্কোয়ারের কাছেই কুমারী বা জীবন্ত দেবীর বাসস্থান বা মন্দিরে আসে। প্যাগোডা স্টাইলের মন্দিরটি তিনতলা বিশিষ্ট। বারান্দা ও জানালা কাঠের তৈরি। চমৎকার খোদাই করা কাজ। এই জীবন্ত কুমারীকে দেবী তালেজুর অবতার বলে গণ্য করা হয়।

কুমারী দেবী ওপরের বারান্দায় জানালার কাছে এসে দাঁড়ান। নিচের উঠানে থাকে ভক্ত দর্শকদের ভিড়। দেবী বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করেন । তাঁর পাশে থাকেন একজন বয়স্কা মহিলা। দর্শকদের ওপরে ওঠা বারণ।

প্রতি বছর জাঁকজমকের সাথে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। স্বয়ং রাজা এসে সে পূজাতে যোগদান করেন।
শেফারা বহু ভক্ত দর্শকের সাথে দেবীর মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

একজন পুরোহিত ও একজন বৃদ্ধা মহিলা খুব সাজগোজ করা একটি ছোট্ট মেয়েকে ধরে জানালার ধারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন।

এই ছোট মেয়েটিই জীবন্ত কুমারী দেবী । দেবীর গায়ে সোনালি রঙের কাপড়ে সূক্ষ্ম কাজ করা।

দেবীর সারা কপাল জুড়ে লাল রং । মধ্যে সোনালি বর্ডারের মধ্যে নীল রঙের টিপ।
গলায় ঝুলছে চেশ কয়েক লহর মূল্যবান মোটা হার।
মাথায় মূল্যবান মুকুট।

রাহুল জানায় যে পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একটি ছোট মেয়েকে কুমারী দেবী নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচন পদ্ধতি রহস্যজনক ও গোপনীয়।

রোকেয়া খালা তাঁর ব্যাগ ছোট একটা ক্যামেরা বের করলেন।

দেবীর একটা ফটো তুলবেন।
রাহুল বিনীতভাবে জানায় যে, এখানে ফটো তোলা নিষেধ।

সাত

রাজধানীর এদিকে সেদিকে

জীবন্ত কুমারী দেবী দর্শনের নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে শেফারা শহরের সদর রাস্তায় নামল। ইন্দ্রচকের তিনতলা আকাশ ভৈরব মন্দিরটি দেখে সবাই টাণ্ডিখেলের বিরাট ময়দানে এসে দাঁড়ায়।

এটি তৈরি করেছিলেন মল্লরাজ বংশের কোশচন্দ্র। এ মাঠে জাতীয় ও ধর্মের উৎসবগুলো, বিশেষ করে সামরিক কুচকাওয়াজ, খেলাধুলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এক সময় এই বিরাট প্রান্তর এশিয়ার বৃহত্তম প্যারেড ময়দানগুলোর অন্যতম ছিল।

টাণ্ডিখেলের উত্তরে চমৎকার একটি দীঘি। নাম রানি পোখারী। পশ্চিম তীর থেকে পুকুরের ঠিক মাঝাখানে একটি সরু রাস্তা চলে গেছে। পুকুরের মধ্যস্থলে একটি শিবমন্দির।

www.pathagar.com

রাস্তা ধরে সবাই মন্দিরের কাছে এলো। পুরোহিতের কাছ থেকে জানা গেল যে এটি রাজা প্রতাপমল্লের স্ত্রী খনন করিয়েছিলেন। রাজার সবচেয়ে ছোট ছেলের মৃত্যু হলে রানি ছেলের স্মৃতি রক্ষার জন্য এটি খনন করিয়ে তার মধ্যে এই ছোট মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন। ঘটনাটি ষোড়শ শতাব্দীর।
আবার সবাই হাঁটতে শুরু করে।

'সিংহ দরবার' নামে পুরনো এক রাজপ্রসাদ দেখতে যাচ্ছে। পথে পড়লো শহীদ স্মৃতিসৌধ। স্মৃতি ফলকে শহীদদের নাম লেখা। একজন রাজার মূর্তির কাছে এসে রাহুল হাত জোড় করে প্রণাম করল।

ঃ এটি কি কোনো দেবতার মূর্তি?
শেফার প্রশ্নে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বলল রাহুল,

ঃ হ্যাঁ, দেবতা বৈকি! ইনিই তো আমাদের দেশে প্রথমে খুব ভাল এক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন!

ঃ অ, এটি তাহলে রাজা ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহের মূর্তি?
আম্মার কথায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করে রাহুল,

ঃ জ্বি হ্যাঁ, ইনিই আমাদের ত্রিভুবনজী!

এরপর সবাই নারায়ণহিতি নামক বর্তমানের রাজপ্রসাদের কাছে এল।

কাছেই একটি পাঠাগার। নাম কেশের লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে অজস্র বই।

বিকেল নামার আগেই শেফারা ট্যাক্সিতে নেপালের যাদুঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

যাদুঘরে ঢুকে নেপালের প্রাচীন কারুশিল্প ও প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন দেখে ওরা মুগ্ধ! সহজে মেলে না এমন সব পাণ্ডুলিপি, চিত্র, খোদাই করা নকশা, অসংখ্য মূর্তি ও আরো অনেক কিছুতে যাদুঘরটি বোঝাই।

আট

রোটারী সম্মেলনে

৯ এপ্রিল। সকাল দশটা। রাষ্ট্রীয় সভাগৃহে রোটারী সম্মেলন শুরু হবে। রোটারিয়ানরা ছাড়াও অনেক আমন্ত্রিত অতিথি এসেছেন। নেপাল সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী প্রফেসর কৃষ্ণরাজ আড়িয়াল আজ প্রধান অতিথি।

আব্বা আম্মার সাথে শেফাও উপস্থিত হয়েছে। তার মতো আরো ছেলে-মেয়ে আছে বেশ ক জন। সভাগৃহের সামনে বর্তমানে রাজা-রানির বিরাট আকারের রঙিন ছবি টাঙানো। ছবিতে মালা পরানো। ওরা জানতে পারলেন, শুধু এখানেই নয়, দেশের ছোটবড় যে কোনো সভা সমিতি বা অনুষ্ঠনে রাজা-রানীর ছবি টাঙ্গানো হয়, বিশেষভাবে সম্মান দেখানো হয়।
রাষ্ট্রীয় সভাগৃহে প্রবেশ করে সবাই মুগ্ধ। কী চমৎকার সাজানো সভাগৃহটি! বিরাট মঞ্চ। মঞ্চের পেছনে দেয়ালে কাপড়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা। রোটারী ইনটারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৫ সম্মেলন, কাঠমণ্ডু, ১৯৭৬ খ্রিঃ।

এবার সম্মেলন শুরু। সম্মেলনে যোগদানকারী দেশগুলোর জাতীয় পতাকা তোলা হয়। জাতীয় সঙ্গীতও গাওয়া হলো। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতও পরিবেশন করলেন মাল্‌ফা পারভীন চাচি,

www.pathagar.com

খুরশিদী খালা, আসমা খালা, রওশন আরা চাচি ও আরো কয়েকজনে। যোগদানকারী দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের বাণী পড়ে শোনানো হলো।

এক পর্যায়ে বহুক্ষণ ধরে নিজ নিজ পরিচয় দেয়া পর্ব চলে। রোটারিয়ানরা যথারীতি নিজেদের, নিজেদের উপস্থিত 'এ্যান', ছেলেমেয়ে ও সাথে আনা মেহমানদের পরিচয় করিয়ে দেন। আব্বা যখন শেফাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন-

ঃ আমাদের একমাত্র কন্যা, সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী শেফা শাহেদ, - শেফার যে কী খুশিই লাগল!

এরপর অনেক বক্তৃতা হলো। শেফা সে সব বক্তৃতার কিছুই ধরতে পারে নি। আম্মা অবশ্য মাঝে মাঝে খুব নিচু স্বরে দু চারটা কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

মন্ত্রী মহোদয় তাঁর মূল্যবান ভাষণ শেষে সকল রোটারিয়ান, 'এ্যান',

তাদের ছেলেমেয়ে ও মেহমানসহ প্রায় পাঁচ শ অতিথিকে চায়ের দাওয়াত দিয়ে গেলেন। আর সবাইকে ডিনারে দাওয়াত করলেন রোটারী কনফারেন্সের চেয়ারম্যান রোটারিয়ান মণিহর্ষজ্যোতি ও তাঁর স্ত্রী এ্যান কেশরী।

নয়

বৌদ্ধনাথ স্তূপে

অন্যান্য দিনের মতো পরের দিন- ১০ এপ্রিলও আসে সূর্যের ঝলমলে আলো নিয়ে।

দুটো ট্যাক্সি ভাড়া করা হলো। শেফারা তিন জন ছাড়া আর যাচ্ছেন রাজিয়া ফুফু, মনিরুজ্জামান ফুপা, মলি খালা-খালু ও হেলেন খালা-খালু। মাঠমণ্ডু থেকে খুব বেশি দূরে নয়, মাইল চারেক দূরে অবস্থিত বৌদ্ধনাথ স্তূপে এসে পৌঁছি। পৃথিবীর বিশালতম স্তূপের মধ্যে এটি একটি। বিরাট গম্বুজাকৃতি স্তূপের সবচেয়ে উঁচু ধাপের ওপর সোনার পাতে মোড়া গোলাকার চূড়া। গম্বুজের ওপর প্রথম ধাপে চারদিকে চার জোড়া চোখ আঁকা।

মন্দিরের একজন সেবক জানালেন যে কথিত আছে, আড়াই হাজার বছর আগে মনাদেব নামে নেপালের এক রাজা নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্তূপটি নির্মাণ করেছিলেন। এর মাঝে প্রায় আশিটা ছোট ছোট কুলুঙ্গী। প্রত্যেকটিতে একটি করে বুদ্ধ দেবের প্রতিমা রয়েছে।

নিচের অংশে চারদিকে রয়েছে ধাতব পদার্থে তৈরি অসংখ্য 'প্রার্থনা চক্র'। বলা হয়, এগুলোর মধ্যে প্রার্থনা পুস্তক সংরক্ষিত আছে। বৌদ্ধদের বিশ্বাস চক্রগুলো একটা একটা করে ঘুরিয়ে দিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়।

মন্দিরের চারপাশে দেখা যায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী লামাদের জন্য তৈরি বাড়ি ঘর।

শেফা এখানে এসে দেখে অবাক হয়ে গেল! বুদ্ধ দেবের মূর্তির পাশেই রয়েছে হিন্দুদের দেব-দেবীর মূর্তি। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই উভয় রকম দেবতাকে প্রণাম করছে, শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

মন্দিরের সেবক বললেন, নেপালের লোকেরা প্রধানত হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও, হিন্দু ও বৌদ্ধ এ দু টি জাতি এখানে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনে একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। উভয়ে উভয়ের পূজা-পার্বণ ও ভোজ উৎসবেও সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। অথচ মজাটা কী জানেন, এই নেপালেই কিন্তু প্রথমে গোঁড়া ও সংকীর্ণতায় ভরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধরা রুখে দাঁড়িয়েছিল।

নেপাল মন্দির ও প্যাগোডার দেশ। সারা দেশ জুড়ে কেবল মন্দির আর প্যাগোডা, প্যাগোডা আর মন্দির।

www.pathagar.com

দশ

পশুপতিনাথ মন্দিরে

এরপর কাঠমণ্ডু থেকে তিন কী সাড়ে তিন মাইল দূরে এসে যেখানে সবাই নামলো, সেটি হিন্দুদের একটি শিব মন্দির। সারা পৃথিবীর মধ্যেই এই পশুপাতিনাথ মন্দিরটি হিন্দুদের একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান। ফেব্রুয়ারি-মার্চে শিব রাত্রি পূজার সময় এখানে ভারত থেকে হাজার হাজার হিন্দু তীর্থযাত্রী এসে ভিড় জমায়।

মন্দিরটি প্যাগোডা পদ্ধতিতে নির্মিত। ভেতরের ছাদ সোনার গিলটি করা। দরজা-জানালা রূপার। ভেতরে শিব মূর্তি স্থাপিত। ভীষণ ভিড়!

কেউ জুতা পরে বা চামড়ার ব্যাগ সাথে নিয়ে মন্দিরের ভেতর তো দূরের কথা, প্রাঙ্গণেও ঢুকতে পারবে না। হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মের লোকদের জন্য মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করা নিষেধ। তবে ভ্রমণকারীরা বাগমতি নদীর পূর্ব তীর থেকে মন্দিরের ভেতরের সব কিছু স্পষ্টই দেখতে পারেন।

মন্দিরের এক পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে হিন্দুদের পবিত্র বাগমতি নদী।

এখানে সেখানে অনেক বানর ঘুরে বেড়াচ্ছে!

চিলানকো স্তুপা

বানরগুলো যা ধাড়ি ধাড়ি কি না! ভয়ই লাগে। দেবতার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেয়া কলা ও অন্যান্য ফল-মূল মজাসে খাচ্ছে ওরা। ওদের না খোঁচালে কিছু করে না। তবে কারো হাতে ব্যাগ বা বোচকা ধরনের কিছু দেখলে হঠাৎ কেড়ে নিয়ে দেয় ছুট। ছুটে একেবারে বসে গিয়ে কোনো গাছের মগডালে।

আম্মা তাঁর চামড়ার ব্যাগটা মন্দিরে ঢুকবার আগেই গেটে জমা দিয়ে এসেছেন।

মন্দিরের উঠানে রয়েছে অসংখ্য কবুতর। এরাও নিশ্চিন্তে দেবতার উদ্দেশ্যে দেয়া আতপচালের সদ্ব্যবহার করছে।

মন্দিরা ও ঢোলের বাজনার সাথে মধুর সুরের কীর্তন শোনা যায়। মেয়ে-পুরুষ উভয়ে মিলে গাইছে সে কীর্তন।

www.pathagar.com

স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপে

এরপর ফের ভাড়া করা ট্যাক্সিতে।

এবার যাচ্ছে স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপে।

গ্রাম ও পাহাড়ি অঞ্চলের কিছু সংখ্যক মেয়ে ও মহিলা নজরে পড়ে। তাদের কোমরে লুঙ্গির মতো করে পেঁচানো শাড়ি। ওপরে ফুলহাতা ঢিলে ব্লাউজ। অনেকের পরনে আবার লাল পেড়ে কালো শাড়ি। ফুলহাতা কালো ব্লাউজ। নাকে বড় নাকফুল ও অলঙ্কার।

গ্রামাঞ্চলের ভারি অলঙ্কার সজ্জিতা একজন নেপালী মহিল

পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলে লম্বা বেণি বাঁধা। শীগগিরই স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপ পৌঁছে গেল সবাই। বেশ কাছে। কাঠমণ্ডু থেকে মাত্র দু মাইল দূর। একটি ছোট পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। নেপালি ড্রাইভার খুব গর্বের সাথে বলল, জানেন, আমাদের এ স্তূপটি প্রায় দু হাজার বছর আগের তৈরি। পৃথিবীর মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি পুরনো ও গৌরবের।

ওপরে উঠবার পাথরের সিঁড়ি রয়েছে। অনেকগুলো সিঁড়ি, প্রায় পৌনে চার শর কাছাকাছি হবে।

শেফাসহ সবাই আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে থাকেন।

কয়েক ধাপ ওপরে উঠে দেখা গেল গৌতমবুদ্ধের বিরাট এক মূর্তি! দু ধারে সামঞ্জস্য রেখে সাজিয়ে রাখা হয়েছে জোড়ায় জোড়ায় সিংহ, হাতি, ঘোড়া, ময়ূর ও গরুর পাখির মূর্তি।

পাথর ও মাটি মিশিয়ে তৈরি এই স্তূপটি অর্ধগোলাকৃতি। চূড়ার আকার মোচার মতো। তামায় মোড়া। সব মিলিয়ে দেখতে অনেকটা বৌদ্ধনাথ স্তূপের মতো। চারদিকে সেই বৌদ্ধনাথ স্তূপের মতো 'প্রভুবুদ্ধের' চোখ আঁকা । ঘুরে ঘুরে সবাই দেখে স্তূপের মধ্যে তেরটি বিভাগ।

স্তূপের বাইরে সারি সারি সাজানো দোকান । কত কী যে রয়েছে! পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি বুদ্ধ-মূর্তি, নেপালের পুরনো আমলের নানান রকম নিদর্শন, পাথরের মালা ও দুল, কাঠ, ব্রোঞ্জ বা হাতির দাঁতের তৈরি প্রার্থনাচক্র, যাদুমন্ত্রের তাবিজ, দেব-দেবীর ছবি ও প্রতিকৃতি।

www.pathagar.com

স্বয়ম্ভুনাথ থেকে ফিরে, আব্বা, চাচা, খালুরা চলে গেলেন রাষ্ট্রীয় সভাগৃহে। শেফারা চলে আসে হোটেলে।

বারো

কাঠমণ্ডুর দোকানে

হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আম্মা কিছু কেনাকাটা করবেন বলে তৈরি হলেন। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল রাজিয়া ফুফু, মলিখালা, নানী (খালেদা হাবীব) নীলুফার চাচি, রোকেয়া খালা, হেলেনা খালা সবাই একসাথে কেনাকাটা করতে যাবেন। শেফা সাথে থাকবে।

কবরী আন্টি ও লুৎফুন্নেসা চাচি আগেই বেশ কিছু শপিং করে নিয়েছেন।

কাঠমণ্ডুর মধ্যস্থলে অবস্থিত নিউ রোডের দিকে সবাই হেঁটেই রওনা দিলেন। হোটেল থেকে বেশ কাছে।

নিউরোড কাঠমণ্ডু বিখ্যাত বেচাকেনার স্থান।

এখানকার বেশ কয়েকটি দোকান নেপালীদের নিজস্ব তৈরি জিনিসপত্র, কুটির শিল্পের দ্রব্য সম্ভারে বোঝাই।

তা ছাড়াও রয়েছে দামি পাথর ও মণিমুক্তার দোকান। নেপাল এসবের জন্য বিখ্যাত। পান্না, হীরা, পোখরাজ, পদ্মরাগ-মণি, রুবী, স্ফটিকমর্ণি, টুরমালিন, গার্ণেট, সবই এখানে রয়েছে।

সাধারণত এসব পাথর পাহাড় থেকে যোগাড় করা হয়।

পাথরের প্রকারভেদে দামেরও পার্থক্য অনেক।

আম্মা শেফার জন্য কয়েকটা আধা কৃত্রিম পান্না ও নিজের জন্য কিনলেন চারটি পদ্মরাগমণি।

কয়েকটি দোকান বাটিকের কাজ ও তৈল চিত্র দিয়ে সাজানো।

কুটির শিল্পের মধ্যে মোটা উলের তৈরি সোয়েটার, কার্ডিগান, কার্পেট ও কম্বল প্রধান। স্টেনলেস স্টীলের তৈরি অত্যন্ত মজবুত ও সুন্দর বিভিন্ন পাত্র, ফুলদানি, ছাইদানি ও গৃহসজ্জার জিনিসগুলো তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

মলিখালার শাড়ি বোঝাই বাক্সটা তেজগাঁ বিমান বন্দর থেকে কাঠমণ্ডুতে এসে আর পৌঁছে নি।

আজ দু তিনটে না কিনলেই নয়। অথচ নেপালে শাড়ির যথেষ্ট দাম। শাড়ি কাপড় সাধারণত ভারত থেকে আমদানি করা হয়। বেশ একটু দাম দিয়েই তিনটে শাড়ি কিনলেন মলি খালা। একটা 'গার্ডেন শাড়ি'।

স্মারকগুলোর মধ্যে প্রথম ও প্রধান হলো 'থ্যঙ্গকাস' অর্থাৎ দেশীয় চিত্রশিল্পীদের আঁকা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর ছবি। এর পরই হলো হস্ত নির্মিত কার্পেট।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দূর থেকে আজানের মিষ্টি স্বর ভেসে আসে ডাঃ এ. আর. খান খালু ও মীর্জা চাচা এখানে এসেই খোঁজ নিয়েছেন যে কাঠমণ্ডুতে দুটো মসজিদ আছে।

সবাই এবার হোটেলের দিকে পা বাড়ায়! আজানের স্বরটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে।

তের

নেপালে মুসলমান

শেফারা নেপালে এসে অবধি কোনো মুসলমানের দেখা পায় নি। শেফার আম্মা তো জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, আচ্ছা, এখানে তো কোনো মুসলমান দেখছি না!

www.pathagar.com

ঃ দেখবে কী করে? বললেন হেলেন খালা, এখানে যে অল্প সংখ্যক মুসলমান আছে তারা তো প্রায় সবাই গ্রামে বাস করে।

এ বিষয়ে হেলেন খালা বেশ কিছুটা তথ্য জেনে এসেছেন। হোটেলে ফেরার পথে তা পরিবেশন করেন। নেপালের ৭৫টি জেলার মধ্যে কপিলাবাস্তু জেলায় সবচেয়ে বেশি মুসলমান বাস করে। এরপরেই অধিক মুসলমান দেখা যায় তরাই জেলায়। তারা অধিকাংশই থাকে গ্রামে এবং কৃষক। কিছু মুসলমান একেবারেই ভূমিহীন, দিনমজুর শ্রমিক। তাছাড়া, রয়েছে রিক্সাওয়ালা, ধোপা, শাকসবজি বিক্রেতা ও এ ধরনের জীবিকা যাদের তারা। এরা গবির। গরিব বলেই কিশোর বয়স থেকেই ছেলেরা পিতামাতাকে আর্থিক সাহায্য করে থাকে। সেজন্য খুব কম মুসলমান ছেলেরা হাইস্কুল পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পায়। ১৯৪০ সনের আগে মুসলমানের কোনো নেপালী স্কুলে ভর্তি হতে পারত না।

মাদরাসাও তৈরি করতে পারত না। ১৯৪০ সালে অবশ্য এসব বাধা উঠে গেছে, অনেক মাদরাসাও তৈরি হয়েছে। কিন্তু হলে কী হবে! সেগুলোর অবস্থা মোটেও ভাল নয়। উপযুক্ত শিক্ষক নেই, শিক্ষকের বেতনও কম। মাদরাসায় যে কুরআন মাজীদ পড়ানো হয়, তার অর্থও কেউ বোঝে না।

১৯৬৭ সন পর্যন্ত নেপালে মাত্র ৫২ জন মুসলমান গ্র্যাজুয়েটের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে।

এখানে সরকারি ও বেসরকারি উল্লেখযোগ্য পদগুলোতে একজন কী দু জনের বেশি মুসলমান চাকুরে নেই।

স্বল্প সংখ্যক সচ্ছল মুসলমান যাঁরা আছেন, তাঁদের বাস কেবল রাজধানীতেই। রাজধানীতে মুসলমান মেয়েরাও স্কুলে যায়। অবশ্য অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমান মেয়েদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

কবে, কখন মুসলমানরা নেপালে এসেছিল, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন উত্তর ভারতে মুসলমানরা রাজত্ব করছিল, তখন সেখানে থেকে বহু হিন্দু পণ্ডিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষু নেপালে আসে।

এ সময়ে নেপালে মুসলমানদের প্রভাবের কথা জানা যায়।

১৩৬৭ সালে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক ও নেপালের তরাই অঞ্চলের এক রাজার সাথে যুদ্ধ বেঁধেছিল ।

এর পাঁচ বছর পর বাংলার মুসলিম শাসক সুলতান উদ্দীন নেপালের বর্তমান রাজধানী কাঠমণ্ডু আক্রমণ করেছিলেন।

এরপর আকবর যখন ভারতের সম্রাট, তখন নেপালে মুসলমানদের প্রভাব বেড়ে যায়। দালান কোঠা তৈরি ও পোশাক পরিচ্ছদে মুসলমানদের নিয়ম পদ্ধতি ও ধারা প্রচলিত হতে দেখা যায়। ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মুসলিম প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

পনের শতকে রাজা রত্ন মল্লের আমলে নেপালে সর্ব প্রথম মুসলমানরা বাস করতে শুধু করে। এসময়ের অনেক মুসলিম ব্যবসায়ী, ফকির-দরবেশ, কারিগর, কাঠমিস্ত্রী নেপালে এসে বসবাস করতে থাকে।

এরপর সতের শতাব্দীতে রাজা ভাস্কর মল্লের আমলে কিছু সংখ্যক মুসলমান অত্যন্ত সম্মানজনক আসনে একেবারে রাজদরবারে ঠাঁই পায় কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, এতে ঈর্ষার কারণে তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং তাদেরকে শুধু রাজদরবারই নয়, নেপালই ছাড়তে হয়।

নেপালে ধর্ম-কর্ম করা বা মসজিদ তৈরিতে কোনো বাধা নেই। তবে ভারতের মতো নেপালেও মুসলমানদের গরু কোরবানি করতে দেয়া হয় না ।

হিন্দুদের ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ-বিচার যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এখানে সাম্প্রদায়িক সংঘাত একেবারেই নেই।

www.pathagar.com

হিন্দুদের সাথে দীর্ঘদিন একসাথে বসবাসের ফলে অনেক হিন্দুয়ানি রীতি-নীতি নেপালি মুসলমানদের প্রভাবান্বিত করেছে। শিক্ষাদীক্ষা না থাকায় পার্বত্য এলাকার মুসলমানরা নামায, রোযা, যাকাত ধর্মের এসব অবশ্য করণীয় কাজগুলো খুব কমই করে থাকে। এখানে বিয়ে-শাদি স্থানীয় রীতিতে হলেও বিয়ের আসল মত দেয়া-নেয়া ইসলামি ধারাতেই চলে।
এসব তথ্য শুনতে শুনতে সবাই হোটেলে এসে পৌঁছে।

চৌদ্দ
শিক্ষা প্রসঙ্গে

পরদিন। হোটেলের বারান্দায়।
সকালের নাশতা খাওয়া হয়ে গেছে। সবাই সম্মেলনে যাবার জন্য তৈরি। হাতে এখনো অনেকটা সময়। আব্বা-আম্মা চেয়ারে বসে খবর-কাগজ পড়ছেন। পাশে শেফা। সে নিচের সদর রাস্তার লোক চলাচল দেখছে।
কাছেই বোধহয় কোনো স্কুল ও মেয়েদের কলেজ। শেফার বয়সী দশ-বারটি মেয়ে পায়ে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে। সবার পরনে স্কুল উইনিফরম। সাদা ব্লাউজ ও নেভীব্লু স্কার্ট। কলেজের মেয়েরা পরেছে কালো-পাড় ঘিয়ে রং শাড়ি, কালো ব্লাউজ।

আব্বার নতুন রোটারিয়ান বন্ধু মহাদের রায় এসে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। মিঃ রায় ভাদগাঁও বা ভক্তপুরে থাকেন। শিক্ষিত ব্যবসায়ী।
হোটেলে শেফাদের পাশের কামরাতেই আছেন।
আম্মা তাঁর কাছ থেকে এখানকার স্কুলের পড়াশোনার কথা জানতে চাইলেন। মহাদেব কাকা শুরু করেন, এখানাকার স্কুলগুলো অবৈতনিক, তবে বাধ্যতামূলক নয়।

১৯৭৬ সনে নেপালে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক বলে ঘোষণা করেছেন বর্তমান রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব।
পরবর্তীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তকও বিনাপয়সায় দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

১৯৭১ সনে 'জাতীয় শিক্ষা নীতি' প্রবর্তিত হয়। এতে কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। শিক্ষার কাঠামোও তখন তৈরি করা হয়েছে। ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক, ১১ থেকে ১২ নিম্ন মাধ্যমিক ও ১৩ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা নেপালের সব জায়গায় ও খুব দূরের অঞ্চলগুলোতে এখনও কার্যকরী করা হয় নি। তবে চেষ্টা চলছে ।

মিঃ রায় বললেন, পাহাড়ি অঞ্চলে এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে, যারা দূর-দূরান্ত, পাহাড় পর্বত পেরিয়েও ঘন্টার পর ঘন্টা পায়ে হেঁটে শহর বা শহরতলির স্কুলগুলোতে পড়তে আসে।

সরকার সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেশি করে বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা করছেন। শুনেছি পাহাড়ি এলাকার বেশ কয়েকটি জেলায় 'গ্রামোন্নয়নের জন্য শিক্ষা' নামক ইউনেসকো প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। প্রাইমারী স্কুলের দালান-কোঠা, খেলার মাঠ ইত্যাদি তৈরি হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও দেয়া হবে।

নেপালে একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। নাম ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়। এটি কাঠমণ্ডু শহরেই। তবে গোটা দেশের বিভিন্ন শহরে এর অনেকগুলো শাখা রয়েছে। সবগুলো কলেজই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

www.pathagar.com

পনের

বালাজু ওয়াটার গার্ডেন ও বুদ্ধনীলকান্ততে

সম্মেলনে বিকেলের অধিবেশন শেষ হবার আগেই আব্বা শেফাদের নিয়ে বের হয়ে পড়েন। সাথে আছে হেলেন খালা-খালু, মলি খালা-খালু ও নানি। যাচ্ছেন বালাজু ওয়াটার গার্ডেনে। কাঠমণ্ডু থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে।

বালাজু ওয়াটার গার্ডেনে যাবার পথে বেশ চওড়া একটা রাস্তা দেখা যায়। রিং রোড। বাগানটি নাগার্জুন পাহাড়ের তলদেশে অবস্থিত।

ঢুকেই মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। প্রবেশপথের দু পাশে অসংখ্য গোলাপ গাছের সারি। লাল, গোলাপি সাদা, ফিকে হলুদ, গাঢ় হলুদ নানান রংয়ের ফুটন্ত গোলাপে জায়গাটা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পাহাড়ের দিক থেকে একটি ঝরণা বেয়ে প্রবল বেগে পানি ঝরছে।

এখানকার সুন্দর পার্কটির নাম বালাজু বাগান।

বাগানের মধ্যে পাথরের একটি কৃত্রিম পাহাড়। সেখানে শ্বেত পাথরে তৈরি বর্তমানের রাজা রানির মূর্তি। অন্যদিকে হিন্দুদের দেবতা নারায়ণের মূর্তি।

বাগান লাগোয়া বিরাট সুইমিং পুলটিও দেখবার মতো । জনসাধারণের জন্য এটি খোলা থাকে । কাছেই বালাজু শিল্প এলাকা।

সেখান থেকে শেফারা ট্যাক্সি করে পাঁচ ছ মাইল দূরে এল! বুদ্ধনীলকান্ততে। একটি বাঁধানো পুকুরে পানির উপর ভাসিয়ে রাখা হয়েছে শিবের বিরাট এক মূর্তি। অসংখ্য পেঁচানো সাপের ওপর 'অনন্ত শয্যায়' শুয়ে আছেন শিব।

এখানকার একজন সেবক জানালো যে এ স্থানটি হিন্দুদের অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

ষোল

কথায় কথায় অনেক মিল

কাঠমণ্ডুতে প্রায় দিন দশেক কেটে গেল।

শেফারা নেপালীদের ভাবধারা কিছুটা বুঝে নিয়েছে। যুদ্ধের সময় ওরা সিংহের মতো ভয়ংকর। আর শান্তির সময় মেষের মতো শান্ত। তারা সহজ, সরল, ধর্মভীরু, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নিজের শক্তির ওপর খুব বিশ্বাসী।

একটা ব্যাপার শেফার খুব ভাল লেগেছে। পথে ঘাটে ভিক্ষুক নেই বললেই চলে। দু একজন ভিক্ষুক যাদের মন্দিরের দোরগোড়ায় দেখা গেছে, তারা কেউ অন্ধ, খোঁড়া, পঙ্গু কিংবা অসুস্থতার কারণে দুর্বল। শেফা সেদিন রত্না পার্কের কাছে একজন পঙ্গু ভিখারিকে দেখেছে।

তাকে ঠিক ভিখারি বলা চলে না। কেননা পঙ্গু লোকটি শুধু হাতে পয়সা চায় না। পাকা মেঝের ওপর চকরং দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট এক চিত্র একে পাশে একটা পাত্র রেখে দিয়েছে। সে তার পরিশ্রম ও শিল্পকাজের সম্মানী চায়, ভিক্ষে চায় না।

পথে ঘাটে চলার সময়, দু তিনটে বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে, বিশেষ করে সম্মেলনে চা, নাশতা ও খাবারের সময় নেপালী লোকদের কথা শুনে শেফারা অবাক হয়ে গেছে!

খুব মজার ! অনেক শব্দ তারা বুঝতে পেরেছে।

নেপালীদের মুখে বাংলা শব্দ!! কতকগুলো শব্দ আবার ঠিক হিন্দির মতো ! যে শব্দগুলো বাংলার সাথে হুবহু মিলে যায়, সেগুলো হলো ঘর, কোঠা, জায়গা, জমিন, ধনসম্পদ, শহর, ধূলো, ভিতর, বাবা, দাদু, নাতি, বেটা, বুড়া, ছোঁড়া, বাচ্চা, সাথি, নরনারী, সিপাই, কুকুর, বেড়াল, ঢোল, মশি, কলম, ঔষধ, নাম, গীত, ফুল, নদী, কালো, সূর্য, পূর্ব, পশ্চিম সাঁজ, বছর, আরাম, কষ্ট, পাপী, পাতকী-আরো অজস্র শব্দ-ঠিক বাংলা শব্দ!

www.pathagar.com

ভদ্র, মামলা, অপমান, প্রশ্ন, সম্পর্ক, ব্যক্তিগত, অধিকার, স্বীকার, সহানুভূতি, পত্র-পত্রিকা, উপন্যাস, ঝগড়া, মাফ, পেট, পুরা, ধন্যবাদ এসব বাংলা শব্দগুলোরও যে নেপালী ভাষায় রয়েছে তা কী শেফারা জানতো? অবশ্য শব্দগুলো বাংলা হলেও কিছু কিছু শব্দ নেপালীরা তাদের নিজস্ব রীতিতে উচ্চারণ করে থাকে। যেমন ধন্যবাদকে উচ্চারণ করে ধানিয়াবাদ!

বাংলার খুব কাছাকাছি শব্দও শেফারা জেনে নিয়েছে। যেমন চামচা, রোটি, চিটটি, ভগমান, কহন, পষ্ট, বাস, সোয়াস্তি, হাতকড়ি, আঁখে, সাথে, দুখী, বিশওয়াস ইত্যাদি।

কয়েকটি নেপালী শব্দও শিখেছে শেফারা। যেমন কুখারা -মুরগি, ফুল-ডিম, টান্না-চাদর, ধোকা-দরজা, কাচাউরা কাপ, মা-আমি, তিমি-তুমি, মালাই-আমাকে।

রাজধানী কাঠমণ্ডুর আকর্ষণীয় বেশ কয়েকটা বেশ কয়েকটা জায়গা শেফাদের দেখা হয়ে গেছে। মন ভরে উঠেছে। এবার শহর থেকে দূরের কতকগুলো নামকরা স্থানে যাবার কথা।

সতের
ভক্তদের নগর ভক্তপুর

সম্মেলন শেষে রোটারিয়ান মহাদেব রায় তাঁর সাথে শেফাদের ভাদগাঁও বা ভক্তপুরে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। আব্বা, আম্মা ও শেফা সবাই খুব খুশি।

দিনে গিয়ে দিনেই ফিরে আসতে হবে। কেননা পরদিনই সবাই দল বেঁধে কোচে পাতান যাবেন, এ ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করা আছে। তাছাড়া জনকপুর, পোখারা ও লুম্বিনী যাবার প্রোগ্রামও রয়েছে। ভক্তপুর নেপালের একটি বড় জেলা। কাঠমণ্ডু থেকে আট ন মাইল দূরে।

স্বর্ণ ফটক ভক্তপুর (নেপাল)

www.pathagar.com

একটা ট্যাক্সি ভাড়া করা হলো। যেতে যেতে শেফারা মহাদেব কাকার কাছ থেকে জানলো যে তারা এমন এক সময় যাচ্ছে, যার দু দিন পরই নেপালের একটা বড় রকম ধর্মীয় উৎসব শুরু হবে। এ উৎসবটি শুধু ভক্তপুরেই হয়ে থাকে। নাম বিস্কেট উৎসব। মহাভারতের যুদ্ধ জয়ের স্মৃতি হিসেবে এ উৎসব পালন করা হয়।

নেপাল হলগ্যে মন্দির, প্যাগোডা ও উৎসবের দেশ। অধিকাংশ নেপালী উৎসবই হিন্দু বা বৌদ্ধ এই দুই ধর্মের সাথে জড়িত। বুদ্ধ জয়ন্তী, ঘন্টকর্ণ, কৃষ্ণাষ্টমী, ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে এগুলো প্রধান। তাছাড়া মহামান্য রাজাদের জন্ম বা মৃত্যুদিনে বা দেশ জাতির বিশেষ স্মরণীয় দিনে বা ঋতু-ভিত্তিক উৎসব তো আছেই ।

এরপর উঠলো ভক্তপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গ।

কৃষ্ণ মন্দির (নেপাল)

ঃ ভাদগাঁও ছিল নেপালের মধ্যযুগীয় রাজধানী। ৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা আনন্দদেব মল্ল এ শহরটি বিষ্ণু নারায়ণের শঙ্খের আকারে তৈরি করেছিলেন। ভক্তপুরের নামই প্রমাণ করে এটি হিন্দু ভক্তদের দেশ। স্থাপত্য শিল্পের ধ্বংসাবশেষ যা আছে, দেখে চমৎকৃত হতে হয়। স্থপতি ও শিল্পীর দৃষ্টিতে ভাদগাঁও হলো 'আলাদীনের গুহা'।

শহরে ঢুকেই বাঁ দিকে বাঁধানো চতুষ্কোণ বিরাট এক দীঘি দেখা গেল। টলটলে পানি।

মহাদেব কাকা জানালেন যে পুকুরটির নাম সিদ্ধ পোখারী। খুব সম্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা যক্ষমল্ল এটি খনন করিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মহাদেব কাকা এবার ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তার বাসা চিনিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। একটি পুরনো বেশ বড় একতলা বাসার সামনে গাড়ি থামে। বাড়িটির নির্মাণ কৌশল চমৎকার।

ঃ এ বাড়ি আমার ঠাকুরদাদার আমলের।

একটি জোয়ান কাজের ছেলে দৌড়ে এল। নমস্কার জানিয়ে মালপত্র নামিয়ে নিল।

মহাদেব কাকা তাদের বসবার ঘরে বসিয়ে ভেতরে গেলেন। মোজাইক করা মেঝের ওপর খুব দামী কার্পেট। চেয়ার, সোফা, শো-কেস, ঝকঝকে। স্পষ্টই বোঝা যায় বনেদি ঘর।

মহাদেব কাকা শেফাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মহাদেব রায়ের স্ত্রী লীলা রায় এলেন। সাথে এক পরিচারিকা। তার হাতে বড় একটা ট্রে ভর্তি নাশতা। লীলা রায় দু হাত জোড় করে হাসিমুখে আব্বা-আম্মাকে নমস্কার জানালেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, এখন সামান্য কিছু খেয়ে নিন। পরে ঘুরে এসে ভাত খাবেন। ফোলা ফোলা গরম লুচি, পায়স, আলুর দম ও বিশেষ পদ্ধতিতে রান্না করা একপদ নিরামিষ।

মহাদেব কাকা কৈফিয়তের সুরে বললেন,

প্যাগোডা ধাচের নাইতাপোলা মন্দির, ভক্তপুর।

ঃ কনফারেন্সে লাঞ্চ বা ডিনারে আপনাদের সব সময়ই নিরামিষ ভোজীদের কক্ষে ঢুকতে দেখেছি। তাই গিন্নিকে আমি সে ধরনের রান্নাই করতে বলেছি।

ঃ ভাগ্যিস বলেছিলেন, নইলে নিরামিষ রান্না যে এতো স্বাদের হতে পারে, ধারণাই করতে পারতাম না। বললেন শেফার আম্মা।

www.pathagar.com

লীলা কাকি আম্মার চেয়ে বয়সে বেশ কিছুটা বড় হবেন। পাতলা এক হারা গড়ন, পরিপাটি করে খোঁপা বাঁধা, চুলে পাক ধরেছে। সিঁথিতে সিঁদুর।
কপালের বড় টিপটিও সিঁদুরের। হালকা অলঙ্কার, পরনে ভারতের "গার্ডেন সিল্ক' শাড়ি। ফরসা, ছোট চোখ টানা টানা। শিশুর মতো চাহনি। তাঁকে আম্মার খুব ভাল লেগেছে।
নাশতা খেয়েই উঠতে হলো। সাথে কাকাই যাচ্ছেন।
দরবার স্কোয়ারের একটি পুরনো রাজপ্রাসাদের কাছে এলেন সবাই। এটি পঞ্চান্ন জানালার রাজপ্রসাদ নামে পরিচিত। উঠানে যাবার প্রবেশ পথেই স্বর্ণফটক।
কিছুটা এগিয়ে ওরা পঞ্চান্ন জানালার রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেলেন।
মহাদেব বললেন, ১৪২৭ সালে রাজা যক্ষমল্ল রাজাদের বাসস্থানের জন্য এটি নির্মাণ করেছিলেন। ওরা রাজপ্রাসাদের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ইটের তৈরি রাজপ্রাসাদ। তাতে কোণাকুনিভেবে ঝুঁকে পড়া পঞ্চান্নটি জানালা। জানালাগুলো কাঠের। সেগুলোর নকসা অদ্ভুত সূক্ষ্ম ও সুন্দর!
এরপর তাঁরা এগিয়ে যান। যেতে যেতে রাজপ্রাসাদও পুরনো বাড়িঘগুলোর জানালার দিকে সবার দৃষ্টি পড়ে। কাঠের জানালাগুলোতে সুন্দরভাবে জাফরি কাটা। তার মধ্যে ময়ূর জানালাটি অপূর্ব।
জানালার ফ্রেম চৌকোণাকার। তার ওপরে ও দুপাশে অনেকগুলো ময়ূরের প্রতিকৃতি।
এরপর পিক্‌চার গ্যালারির কাছে এস কাকা বললেন, আজ মঙ্গলবার। এটি বন্ধ। নইলে এখানে অতি পুরনো কালের বিভিন্নযুগের পেন্টিং দেখে যেতে পারতেন। এটিকে নেপালের প্রাচীন শিল্প কলার ভাণ্ডার বলা হয়।
এরপর প্যাগোডা ধাঁচের একটি মন্দিরের কাছে এলেন সবাই।
ঃ খুবই বিখ্যাত এই মন্দির! নাম নাইতাপোলা। নাইতাপোলা মানে হলো পাঁচতলা । কাঠমণ্ডু উপত্যকার এটিই সবচেয়ে উঁচু মন্দির। আর এটিকে নেপালের প্যাগোডা স্থাপত্যে সর্বোৎকৃষ্ট মান্দির বলে মনে করা হয়। রাজা ভূপতিন্দ্রমল্লের তৈরি।
সিঁড়ির প্রথম ধাপে নেপালের মহা শক্তিশালী দুই রাজার মূর্তি। একদিকে জয় মল্ল, অন্যদিকে ফাত্তা মল্ল।
চলার পথে দূর থেকে তারা পশুপতিনাথ মন্দিরটি দেখে নেয়। মনে হয় অবিকল কাঠমণ্ডু বিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত।
ঃ ভক্তপুরের মাটির কাজ কিন্তু খুবই নাম করা । সময় থাকলে কোনো এক নামকরা কুমোরের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারতাম।
বাসায় ফিরে দেখা গেল লীলা কাকি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, আম্মা কাকির হতে ধরলেন।
খাবার টেবিলে এসে শেফারা তো অবাক!
তরিতরকারি দিয়ে যে এতো ভাল ভাল পদের ব্যঞ্জন রান্না করা যায় আগে কখনো দেখে নি ওরা। মটরশুঁটি, ফুলকপি ও আরো দু তিন পদ সবজি মিশিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে কোপ্তা করে, পোলাউয়ের সাথে তা মিশিয়ে কোপ্তা পোলাউ 'বেঁধেছেন লীলা কাকি। খেতে খেতে আম্মা মহাদেব কাকাকে বললেন, দিদিকে নিয়ে আমাদের দেশে একবার বেড়াতে আসুন না! খুবই খুশি হবো এলে।
ঃ যদি ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কনফারেন্স হয়, হবে নিশ্চয়ই যাবার ইচ্ছা রাখি।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আব্বা-আম্মা কাকা-কাকির ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

কাকা-কাকির ছেলে নেই। একটি মাত্র মেয়ে গ্র্যাজুয়েট । নাম করুণা। বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামীর সাথে দেশেই আছে। কাঠমণ্ডু থেকে পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ মাইল দূরে হেলাম্বুতে।
হেলাম্বুর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কাকা উচ্ছ্বসিত হলেন।
: জানেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে হেলাম্বু অপরূপ। আবহাওয়াও অত্যন্ত মনোরম। যেমন সুন্দর জায়গা, তেমন সুন্দর সেখানকার অধিবাসীরা। গোলাপি গাল, মিষ্টি মুখ আর অতিথিপরায়ণ।

www.pathagar.com

সন্ধ্যার সময় তারা বিদায় নিলেন। আম্মা কাকিকে দেশ থেকে আনা চওড়া মুগাপাড় খয়েরি রঙের একটা টাঙ্গাইল শাড়ি উপহার দিলেন। কাকী দিলেন নাইতাপোলা মন্দিরের ব্রোঞ্জের একটা প্রতিকৃতি। কাঠমণ্ডুতে ফিরে যাচ্ছে শেফারা। রাত এগারটার ওপর হয়ে গেছে।
নির্জন পথ। জনশূন্য। অথচ ড্রাইভার বলল, চোর ডাকাতের ভয় নেই।

আঠার
সৌন্দর্যের শহর ললিতপুর

পরদিন।
সকাল নটাতে শেফারা সবাই নির্দিষ্ট কোচ স্ট্যান্ডে এসে জড়ো হয়েছে।
গতকাল একেক পরিবার একেক দিকে গিয়েছিলেন। সবাই কলকণ্ঠে নিজেদের দেখা জায়গাগুলোর বর্ণনা করছেন।
ডাঃ মীর্জাচাচাসহ রোকেয়া খালারা খুব খাছেই কীর্তিপুর ঘুরে এসেছেন। রোকেয়া খালার স্বর শোনা যায়—
ঃ আমরা নেপালের খুব নাম করা একটা ঐতিহাসিক জায়গা কীর্তিপুর দেখে এলাম। অতীতে এখানে নাকি অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল! এক সময়ে এ জায়গাটাকে 'অজেয় স্থান' বলা হতো।
মলি খালারা কীর্তিপুরের কাছাকাছি পাহাড়ি জায়গা চোভার দেখে এসেছেন।
ঃ চোভার একটি চমৎকার স্বাস্থ্যনিবাস। পাহাড়ের চূড়ায় আনন্দলোকেশ্বর মন্দির ও সেখানে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের বরফঢাকা চূড়া দেখে এলাম। ওহ্ চমৎকার !
সাড়ে ন টার মধ্যেই কোচ ছাড়লো। পাতানের দিকে যাত্রা। কাঠমণ্ডুর খুব কাছেই। মাইল তিনেক মাত্র দূরত্ব গাইডের বদলে এসেছেন নেপালের একজন রোটারিয়ান জয় গিমেরী।
গাড়ি ছাড়ার পরই জয় গিমেরী শুরু করেন,
ঃ শোনা যায়, এখান থেকে প্রায় পৌনে সাত শ বছর আগে বীরদের নামে এক রাজা পাতান শহরটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ শহরের পুরনো নাম ললিতপুর। ললিতপুরের মানে তো আপনারা জানেন, সৌন্দর্যের শহর!
এ শহর বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি বিশেষ কেন্দ্রভূমি।
অল্পক্ষণের মধ্যে সবাই পাতানে পৌঁছে গেলেন।
দেখা গেল এখানে প্যাগোডা মন্দিরের সংখ্যা অনেক বেশি। পাথরের মূর্তিও রয়েছে যথেষ্ট।
জয় গিমেরী সবাইকে প্রাচীনকালের মল্ল রাজাদের তৈরি রাজপ্রাসাদগুলো ঘুরে ঘুরে দেখালেন।
মন্দিরের কার্নিশে রামায়ণ ও মহভারত কাহিনীর বিশেষ দৃশ্যাবলি খোদিত করা হয়েছে। মন্দিরটি দেখতে একসময় হেলেন খালা খালুকে বললেন,
ঃ খেয়াল করেছ, এ মন্দিরটির স্থাপত্য কৌশল অনেকটা ফতেহপুর সিক্রির পাঁচ মহলের মতো না?
ঃ হ্যাঁ, সে রকমই! আমিও সে কথাই বলতে চাচ্ছিলাম । জয় গিমেরীও তাঁদের কথা সমর্থন করেন।
ঠিক ধরেছেন আপনারা। এতে মোগল স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট ছাপ রয়েছে। তবে এটা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই মন্দিরটি নেপালিদের নিজস্ব শিল্পনৈপুণ্যেই বিশেষ সমৃদ্ধ।

এরপর হিরণ্য বর্ণ মহাবিহারে। এটি 'প্রভুবুদ্ধের' মন্দির। তিনতলা বিশিষ্ট প্যাগোডা স্টাইলের। মন্দিরের তিনটি ছাদই সোনা তৈরি। ওপর তলায় বুদ্ধদেবের বিরাট এক সোনার মূর্তি !

ফেরার পথে গাড়ি একটি প্রাচীন স্তূপের পাশ দিয়ে যাবার সময় জয় গিমেরী সেটির দিকে সবার সৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
ঃ ওটি হলো অশোকস্তূপ। পাতানে এরকম আরো তিনটি অশোক স্তূপ আছে।
এবার তিব্বতীয়দের শিবিরে ।

www.pathagar.com

এখানে অল্পসংখ্যক তিব্বতীয় লোক মিলে যেন একটা আলাদা সমাজ গড়ে তুলেছে। অনেকগুলো মন্দির ও স্তূপও তৈরি করেছে। বেশ কয়েকটি স্মারক-দোকানও তারা খুলে বসেছে। সেসব দোকানের যাবতীয় জিনিসই তাদের নিজেদের হাতের তৈরি।

শেফারা ভেতরে ঢুকে দেখে, বেশ কয়েকটা সাজানো দোকান। কাঠের তৈরি প্রার্থনা-চক্র, হাতীর দাঁত, ব্রোঞ্জ ও রুপার তৈরি নানা ধরনের গহনা, তাম্র নির্মিত মন্দিরের লম্বা শিঙ্গা, হরেক রকম খেলনা, হাতে বোনা উলের সোয়েটার ও শাল এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী নকশা করা কার্পেট এ ধরনের যাবতীয় হস্ত শিল্পে দোকানগুলো বোঝাই।

দোকানীরা প্রায় সবাই মেয়ে। হাতে আজ সময় নেই। সবাই সামান্য কিছু কিনে নিলেন। কোচ কাঠমণ্ডুর পথে ফিরে চলল।

উনিশ

দেশে ফেরার আগে

হেলেন খালা- খালু কয়েকজন মিলে প্রাচীন ধূলিখেল শহরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে সরাসরি পশ্চিম থেকে পূর্বের হিমালয়ের সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখা যায়। গিয়েছিলেন পাহাড়ে উঠে দূরের মাউন্ট এভারেস্টের পেছন থেকে সূর্য ওঠার সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য।

কাঠমণ্ডু থেকে ধূলিখেল আঠার-উনিশ মাইল দূরে হবে। সেই রাত তিনটায় উঠে সবাই রওয়ানা দিয়েছিলেন। কথা ছিল পাহাড়ে উঠে সূর্য ওঠার দৃশ্য দেখে ফেরার পথে ধূলিখেলের খুব কাছের নামোবৌদ্ধ নামক খুব পুরনো একটি বৌদ্ধমঠ ও পানাউতি নামক একটি গ্রাম দেখে তারা ফিরবে।

কিন্তু সব গোলামাল হয়ে গেল।

পাহাড়ের উপর উঠতে গিয়ে নীলুফার চাচির তো যায় যায় অবস্থা! প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। রোকেয়া খালা পাশে ছিলেন বলে রক্ষা! ওদিকে খালু চাচাদের সাথে হেলেনা খালা আগেই তড়তড় করে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেছেন।

রোকেয়া খালার সেবায় নীলুফার চাচি সেরে উঠেছিলেন। বাস্তবিকই ঘোরাঘুরি আর তাঁর পোষাচ্ছে না।

হেলেনা খালা নোটবুকে সারাক্ষণ লিখছেন তো লিখছেনই। সামনে রাখা গরম চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ালই নেই।

ঃ এ্যাই, চা-টা আগে খেয়ে নাও না!

রাজিয়া ফুফুর তাগিদে শুধু নিঃশব্দে হাসলেন হেলেন খালা।

ঃ চা ঠাণ্ডা হলে ফের গরম করে নেয়া যাবে আপা! কিন্তু ললিতপুরের দৃশ্যগুলো মন থেকে মুছে গেলে, আর তা ফিরে পাব না!

দেখবেন, আমরা যেন আপনার স্বর্ণাক্ষর থেকে বাদ-টাদ না যাই!

রসিকতা করে বললেন লুৎফর চাচা।

ঃ আপনি যদিও বা বাদ যান, আপনার গিন্নিকে কিছুতেই বাদ দেয়া চলবে না।

ঃ কেন, কেন, গিন্নি আমার আবার হিরোইন হয়ে উঠল কেন?

ঃ বারে, কেন আবার কী? অনুষ্ঠানের শেষ দিনে বাংলাদেশের একমাত্র উনিই তো আমাদের সম্মান রক্ষা করলেন! চমৎকার করে গান গাইলেন!

ঃ আর আমি বুঝি কিছু করি নি? আমি যে চুপ করে বসে উনার গান শুনলাম, সেটা বুঝি কিছু না?

ঃ অ হ্যাঁ, সেটাও তো একটা কথা! তাহলে আপনিও থাকবেন হিরো হয়ে।

www.pathagar.com

দু জনে একসাথে হেসে ওঠেন।
বেশ কিছুক্ষণ কলগুঞ্জন করলেন সবাই।
শেফারা বিদায় নিল।

বিশ্

জনক রাজারদেশ জনকপুর

সময় কম। নেপালি রূপী তার চেয়েও কম। কজেই তিনটি বিশেষ যায়গার একটিতে যাওয়া বাদ দিতে হবে। জনকপুর, পোখারা ও লুম্বিনী।

জনকপুর যাওয়াই বাদ দিতে হবে। বেশ দূরের পথ। কাঠমণ্ডু উপত্যকা থেকে প্রায় ১১৮ মাইল। যেতে আসতে অনেক সময় লেগে যাবে। পকেটও শূন্য হয়ে যাবে।

শেফার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সে চলে আসবার আগে ছোটদের রামায়ণটা কততো ভাল করে পড়ে এসেছে!
জনকপুর নেপালের তরাই প্রদেশে মাহোতারি জেলায় অবস্থিত।

রামায়ণের কাহিনীতে আছে যে জনকপুর হলো মিথিলার রাজা জনকের রাজধানী। জনকরাজার কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। সন্তান লাভের জন্য তিনি নিজ হাতে যজ্ঞ-ভূমি চাষ করেন। চাষ করতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন ,মাটির ভেতর থেকে লাঙ্গলের শিরালে অর্থাৎ মাথায় একটা ডিম উঠে এসেছে। তিনি কাঁপা হাতে ডিমটা ভাঙলেন। আর কী তাজ্জব কাণ্ড! ডিমের ভেতর সুন্দর একটি ফুটফুটে মেয়ে! শিরালে জন্ম হয়েছে বলে রাজা তার নাম রাখলেন সীতা। জনকরাজার মেয়ে বলে সীতার আর এক নাম জানকী।
বিয়ের বয়স হলে জনকরাজা খুব ধুমধাম করে অযোধ্যার বড় রাজকুমার রামের সাথে সীতার বিয়ে দিলেন। ওদিকে বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামের অভিষেকের দিনই তাকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হয়। সাথে গেলেন ছোট ভাই লক্ষণ ও স্ত্রী সীতা।
বনে যাবার পর খুব খারাপ একটা ঘটনা ঘটল। রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে যায়।

রাম তখন বানর সৈন্যদের সাহায্য নিলেন। এই নিয়ে রাবণের সাথে যুদ্ধে নামেন। সে কী ভীষণ যুদ্ধ! শেষ পর্যন্ত রাবণ রাজা হেরে তো গেলই, মরেও গেল। রাম সীতাকে উদ্ধার করে দেশে নিয়ে আসেন। সে এক লম্বা কাহিনী। শেফা সব জানে। অথচ সীতার এই জন্ম স্থানটা সে দেখার সুযোগই পেল না! কী আপসোস!
জনকপুরের খবরাখবর আব্বা-আম্মারও যথেষ্ট জানা। এ অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়।
এখানে মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি বিরাট একটি মন্দির আছে। নাম জানকী মন্দির।

অদ্ভুত সুন্দর স্থাপত্য শিল্প! এতে ভারতীয় মোগল ও নেপালি স্থাপত্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

এই মন্দিরটিকে অনেকে নয় লাখ মন্দিরও বলে। কারণ এটি তৈরি করতে নাকি নয় লক্ষ রূপী লেগেছিল।

জানকী মন্দিরের কাছেই খুব পুরনো একটি মন্দির। নাম রামমন্দির।

মার্চ এপ্রিলের দিকে রাম নবমী এবং ডিসেম্বরে সীতা-বিবাহ পঞ্চমী উৎসবের সময় জনকপুর এবং যেন ঝলমলে এক রূপকথার রাজ্যে বদলে যায়। তখন দেশ বিদেশ, বিশেষ করে ভারতে ও নেপালের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার হিন্দু তীর্থযাত্রী এই দুই মন্দিরে পূজা দিতে আসে।
বলা হয়, সীতার জন্ম ও বিয়ে এই জনকপুরেই হয়েছিল।

দুটি চমৎকার দীঘি জনকপুরের সৌন্দর্য আরো বাড়িয়েছে। বড় দীঘিটির নাম গঙ্গাসাগর।

www.pathagar.com

একুশ
পর্যটকদের বেহেশত পোখারায়

শেফা আজ আনন্দে আত্মহারা। আব্বা-আম্মার সাথে পোখারায় বেড়াতে যাচ্ছে। পোখারা উপত্যকার কথা ঢাকা থেকেই অনেক শুনে এসেছে।

পাহাড়ি জায়গা। হ্রদ, ঝরনা ও ঘন সবুজের রাজ্য পোখারা। নেপালের মধ্যস্থলে, অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে অবস্থিত। পেছনে সুউচ্চ অন্নপূর্ণা ও ধৌলাগিরি পর্বতমালা। অন্নপূর্ণা পর্বতমালা থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে এ শহর। পোখারা থেকে পাহাড়টির প্রায় ছ মাইল বিস্তৃত অপরূপ দৃশ্যাবলি নজরে পড়ে।

কাঠমণ্ডু থেকে ১২৫ মাইল দূরে যেতে হবে । নতুন তৈরি সড়ক পৃথ্বীরাজমার্গের উপর দিয়ে তারা যাবেন ট্যাক্সিতে।

আম্মা টিফিন ক্যারিয়ার বোঝাই করে খাবার সাথে নিলেন।

পথ ঘাটের অবস্থা টুরিস্ট ব্যুরো থেকে আগেই জানা হয়েছে। কারো যেন উদগার না হয়, বা হলে তাড়াতাড়ি তা বন্ধ হয়ে যায়, সেরকম ওষুধও সাথে রেখেছেন। লেবু, কমলালেবু তো আছেই।

সকালের দিকে কাঠমণ্ডু থেকে পোখারার উদ্দেশ্যে তাদের যাত্রা শুরু হলো।

রাজধানীর সীমানা পার হওয়া মাত্রই গাড়ি থামাতে হয়। খুব কড়া দু জন নিরাপত্তা প্রহরী গাড়ীর ভেতরের 'চেক' করে তারপর ছেড়ে দিল।

এরপর থেকে গাড়ি যে এলোপাতাড়ি ঘোরা শুরু করল, আর থামা নেই।

শেফা ততক্ষণে বমি করতে শুরু করেছে। ওষুধ খেয়েও কোনো কাজ হয় নি। লিমং একটা ঝরনার পাশে গাড়ি থামালো।

ঝরনার ঠাণ্ডা পানি । চোখে-মুখে ছিটিয়ে আ! কী আরামই যে লাগছে!

কিছুটা জিরিয়ে নিয়ে ফের গাড়িতে।

এক জায়গায় গাড়ি থামতেই ছোট ছোট কয়েকটি ছেলে-মেয়ে ফুলের তোড়া হাতে ছুটে এলো। হাতে নেপালের জাতীয় ফুল রোডোডেনড্রোনের তোড়া।

সামান্য মূল্যে আম্মা শেফাকে একটা তোড়া কিনে দিলেন।

বিকেল চারটার দিকে লিমং গাড়ির গতিবেগ খুব বাড়িয়ে দিয়ে বেশ অনেকটা উঁচুতে পোখারা উপত্যকায় উঠে এলো। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫০০ ফুট উঁচুতে। দৈর্ঘ্য প্রায় একুশ মাইল ও প্রস্থে প্রায় আঠারো মাইল। অত্যন্ত আকর্ষণীয় সব পাহাড় দিয়ে ঘেরা। নিঃসন্দেহে উপত্যকাটি "পর্যটকদের বেহেশত" সময়টা এপ্রিলের মাঝামাঝি। নেপালে বসন্তকাল। শীত শীত মিষ্টি সকাল ও দুপুরে সামান্য গরম। বিকেল থেকে শুরু হয় ফুরফুরে হাওয়ার আনাগোনা।

লিমং জানালো যে শুধু বসন্তকালেই নয়, শরৎ ও শীত কালেও এমনি চমৎকার আরামপ্রদ আবহাওয়া। গ্রীষ্মকালেও এখানকার জলবায়ু ভেজা থাকে। তখন অঝোর ধারার বৃষ্টি ঝরে।

লিমং তাদের মোটামুটি একটি ভাল হোটেলে নামিয়ে দিয়ে, ভাড়া নিয়ে চলে গেল। পাকা কুটির। একেকটা কামরা করে ভাড়া দেয়া হয় । ছয়টি পরিবারের উপযোগী ছিমছাম হোটেল । পানির সুব্যবস্থা আছে। একটা বড় রুম খালি ছিল। তাতে শেফারা উঠল।

শেফা আম্মার সাথে তাড়াহুড়া করে তাদের ঘরটা গুছিয়ে ফেলে।

বিকেল হয়ে গেছে। কাজেই শুধু একটি বা দু টি দিকে যেতে হবে। এখানে এসে প্রায় সবাই প্রথমে হ্রদগুলো দেখতে যায়।

এখানে বেশ কটি হ্রদ রয়েছে, তার মধ্যে ফেওয়া, বেগনাস ও রূপা প্রধান। কিছুটা দূরের ছোট হ্রদগুলোর নাম খাস্তে, দীপং ও মার্দি।

www.pathagar.com

একটা ট্যাক্সি ভাড়া করা হলো। এখানে তিব্বতীয়দের স্থায়িভাবে থাকবার দু টি জায়গা রয়েছে। সে দুটো জায়গাতেই এখন সবাই যাচ্ছে ।

গাড়ি চলছে। উঁচু-নিচু পথ। পথের দু ধারের দৃশ্য সুন্দর। সুন্দর দৃশ্যাবলির মাঝে স্থানীয় যে-সব লোকজন চলাফেরা করছে তারাও সুন্দর। ফরসা রং, স্বাস্থ্যবান।

মাইল চারেক এগিয়ে এসে ড্রাইভার অমর বললো,

ঃ কাছেই মহেন্দ্র গুহা। প্রাকৃতিক এই গুহাটি খুবই চমৎকার! আকারেও বেশ বড়। একটু নেমে কিছুটা হেঁটে শেফারা দশ বারোটা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামল।

গুহা দেখার জন্য জনপ্রতি দুই রূপী করে টিকেট কাটতে হলো।

গুহার মধ্যে ঢুকে সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। মাঝে-মধ্যে বিজলীবাতি, ফিকে-আবছা আলোয় নির্জন গুহার পরিবেশে একটা ছমছমে ভাব।

এক সময় দু জন বিদেশী সাহেব দেখা গেল। ওঁরা চারদিকে দেখেশুনে কী সব নোট করছেন।

অমর ফিসফিস করে বলল, ওঁরা ভূতত্ত্ববিদ। গবেষণার কাজে এসেছেন।

মহেন্দ্র গুহা দেখে সবাই খুব শিগগিরই ফিরে এল। বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করে ট্যাক্সি টিনের ঘের দেয়া বিরাট একটা বাসস্থানের কাছে থামে।

সবেমাত্র দরজা খুলে একজন বয়স্ক লোক ভেতরে ঢুকছেন। হাতে একটি বড় চটের ব্যাগ। সেটা ভরতি চাল, ডাল ও অন্যান্য সব সওদা।

আব্বা ইংরেজিতে ভেতরে যাবার অনুমতি চাইলেন।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন,

ঃ অনুমতির তো প্রশ্নই ওঠে না। আপনারা দূর দেশ থেকে আমাদের এখানে এসেছেন, এতো আমাদের সৌভাগ্য!

ভদ্রলোক বেশ অমায়িক ও আলাপী।

শেফা ও অন্যান্যরা ভেতরে ঢুকে গেছে।

বাড়ির মেয়েরা কার্পেট বুনছে। দিনের শেষের দিকের কাজ। দ্রুত হাত চালাচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে তরুণী ও প্রৌঢ়া সব বয়সের মহিলাই রয়েছে। একজন বয়স্ক মহিলা তরুণীদের ধরে ধরে কাজ শেখাচ্ছেন। কার্পেটে নানা ধরনের নকশা। তিব্বতীয়দের ঐতিহ্যবাহী ফুল, লতা, পাতা ও দেব-দেবীর আঁকা নকশা।

মেয়েদের গায়ের রং হলদে বা তামাটে। ফোলা ফোলা মুখ। চোখ ছোট। কাপড় লুঙ্গির মতো করে পরা, গায়ে ঢোলা ফুল হাতা ব্লাউজ। অনেকেই রূপা ও পাথরে ভারি অলঙ্কারে সজ্জিতা। চুল উসকো খুসকো।

ওরা তাদের হাত জোড় করে নমস্কার জানায়।

আম্মার অনুরোধে তারা বিভিন্ন সাইজের কার্পেট খুলে খুলে দেখাতে থাকে। ঠাসা বুনটের দামি দামি সব কার্পেট।

নেপালি রূপী হাতে কম। আম্মা শুধু দুটি ছোট কার্পেট কিনলেন।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা ট্যাক্সিতে ওঠে।

পরদিন সকাল। শেফারা হোটেলের সামনে লনে এসে দাঁড়ায়। আরে কী আশ্চর্য! অন্নপূর্ণা পর্বতমালার সবচেয়ে নাম করা মাচ্ছাপুচ্ছে (মাছের লেজ) নামক চূড়াটি যে খুব কাছে থেকে দেখা যাচ্ছে! সূর্যের আলোকে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়াঢাকা রুপালি কোনো মাছের লেজের মতো দেখাচ্ছে। আর এজন্যেই বোধ হয় এটার নাম রাখা হয়েছে মাচ্ছা-পুচ্ছে।

আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে । প্রতি পনেরো বিশ মিনিট অন্তর পাহাড়ের রূপ বদলাচ্ছে।

কিছুক্ষণ ওরা আকাশ ও পাহাড়ের রং বদল খেলা উপভোগ করে। ন টার দিকে বিখ্যাত ফেওয়া হ্রদে যাবার প্রোগ্রাম। তাই গোসলের জন্য শেফারা ভেতরে এল। আস্তে আস্তে ...একী! সাড়ে আটটাতেই

www.pathagar.com

যেন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে! পাহাড়গুলো সব মেঘে ছেয়ে গেছে। সামনে যেন একটা ছাই রঙের পর্দা ঝুলে পড়েছে। বোঝাই যায় না পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এততোগুলো সারি সারি পাহাড়!
বেলা দশটার সময় শেফারা ফেওয়া হ্রদে এল। জানা গেল, হ্রদটি ছ মাইল দীর্ঘ ও দু মাইল প্রস্থ । নীল টলটলে পানি। পানিতে বড় মাছ। প্রচুর ডিঙি নৌকা ভাসছে।
আব্বা একটা ডিঙ্গি নৌকা ভাড়া করলেন। ঘণ্টায় পনরো রূপী ভাড়া। ফেওয়া হ্রদে নৌকা ভ্রমণ! চারদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আর লেকের বুকে মৃদুমন্দ হাওয়া। শরীর মন জুড়িয়ে যায় ।হ্রদের তীর ঘেঁষে অনেকেই পানিতে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। অনেকে সাঁতার কাটছে।
লেকের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ। দূর থেকে ঠিক ছবির মতো দেখাচ্ছে।
অল্প সময়ের মধ্যে তারা সেই দ্বীপটিতে পৌঁছে যায়।
দ্বীপের মধ্যে হিন্দু-দেবী বরাহী ভগবতীর মন্দির। মন্দিরের চার দিকে রেলিঙের ঘেরা। মন্দির ঘেঁষা বিরাট একটা আমগাছ। অন্যান্য গাছপালাও রয়েছে জড়াজড়ি করে। লোকে বোঝাই মন্দির। এটি হিন্দুদের একটি পুণ্য ভূমি।
মন্দির দেখার পর ফের সবাই কিছুক্ষণ নৌকায় ঘুরে কাটালো। চারদিকে পাহাড়ের গায়ে ঘন কালচে সবুজ গাছ । হ্রদের পানিতে তার প্রতিচ্ছবি।
একসময় মাঝি দূরে তীরের দিকে আঙুল দেখালো। নেপালি ভাষায় বলল, ওই যে রাজবাড়ি রত্নমন্দির। অনেকটা জায়গা নিয়ে পাহাড়ের কোল জুড়ে রয়েছে রাজবাড়িটি। পটে আঁকা সুন্দর একটি ছবি যেন।
ডিঙ্গি থেকে নেমে কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে কিছু খেয়ে নিয়ে তারা বেগনাস হ্রদ দেখতে আসে।
পোখরা শহর থেকে প্রায় নয় মাইল দূরে। দ্বিতীয় বৃহৎ হ্রদ।
ঃ ফেওয়া লেকের চেয়ে এটি আরও বেশি সুন্দর তাই না? হ্রদের তীর ঘেঁষা নিচু পাহাড়। পানিতে তার স্পষ্ট ছায়া।
একটি সরু অংশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো ড্রাইভার,
ঃ দেখুন, এ জায়গাতে কততো মাছ এসে জড়ো হয়েছে! মাহসিয়ার মাছ এগুলো। সবাই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মাছের খেলা দেখল। লেকের ধারে সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ালো। চারপাশে অপরূপ প্রকৃতি। তার মাঝে বেশ কিছুটা সময় যে কী ভাবে কেটে গেল টেরই পেল না ওরা।
এখন আর নৌকা করে বেড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না ।
ফেরার পথে ড্রাইভার বেশ কিছুটা তথ্য পরিবেশন করে। পোখারা উপত্যকার সমতল উষ্ণ অঞ্চলে এবং নিচু পাহাড়গুলোতে প্রধানত নেওয়ার, ছেত্রি, ব্রাক্ষণ ও অন্যান্য হিন্দুবর্ণের বাস। অন্যদিকে নাতিশীতোষ্ণ উঁচু জমিতে গুরাঙ্গ মাগরারা বাস করে। ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল আছে। ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় শাখাও রয়েছে এখানে। পোখারার রোদমাখা ও কিছু ভেজা আবহাওয়া প্রচুর সবজি ও ফল উৎপাদনের উপযোগী। তার মধ্যে কমলালেবু প্রধান।
পরদিন। ফজরের নামাজ পড়েই আব্বা-আম্মা শেফাকে নিয়ে লনে এসে বসেন।
পোখারার সকালের পাহাড়ের দৃশ্য নাকি অপূর্ব! গতকাল তারা যখন লনে এসেছিলেন, সূর্য তার বহু আগেই জেগে গিয়েছিল।
গভীর আগ্রহের সাথে ওরা সামনের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।
সূর্য ওঠার আগের মুহূর্তটি। সব ক টি পাহাড় মিষ্টি এক গোলাপি আভায় ছেয়ে গেল। গোলাপি রঙের পাহাড়! অদ্ভুত, আর অপরূপ! মুগ্ধ চাহনির মাঝে কয়েকটি নীরব মুহূর্ত পালিয়ে যায়। সেই পলাতক মুহূর্তের ফাঁক গলিয়ে সারিবদ্ধ পাহাড়গুলো নিজেদের রং বদলে ফেলে। সূর্য সবেমাত্র উঁকি দিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে এখন কাঁচা সোনার ছড়াছড়ি । মনে হচ্ছে সোনার পাহাড়!
এরপর সূর্য উঠে গেল । সোনার পাহাড় কোথায় শূন্যে মিলিয়ে গেছে! যেন একটা ভেলকিবাজি !
পাহাড়ের গায়ে এখন লাল শাড়ি জড়ানো! কিছুক্ষণ পর লাল রংও ফিকে হয়ে গেল। আস্তে আস্তে পাহাড় তার নিজ রূপ ধারণ করছে।

www.pathagar.com

শেফারা যে যার কামরায় ফিরে আসে।
আজ কাঠমণ্ডুতে ফিরে যেতেই হবে। কাজেই সকালেই যেটুকু পারা যায়, দেখে নিতে হবে।
হোটেল মালিক জিতেন্দ্ররানা নিজে এসে একটি ট্যাক্সি ঠিক করে দিলেন। ট্যাক্সি-ড্রাইভার সুনীল তাঁর পরিচিত। সে ইংরেজি ও হিন্দি মিশিয়ে বলল,
ঃ এখানকার কমলালেবুর বাগানগুলো ভারি সুন্দর। চলুন, একটা নামকরা কমলালেবুর বাগান ঘুরিয়ে আনি। মিঃ রানা বললেন, ঃ না, না, তা করো না। ওঁদের সময় খুব কম। প্রথমে ডেভিড জলপ্রপাতও তাশিলিং ব্রীজটা দেখিয়ে আন। এরপর সময় থাকলে যাবে কমলালেবুর বাগানে।
ট্যাক্সি চলছে। উঁচুনিচু পাহাড়ি পথে ঝাঁকুনি খাওয়া প্রায় রপ্ত হয়ে গেছে সবার।
দূর থেকে দেখা যায় ডেভিড জলপ্রপাত। শীঘ্রই সে দূরত্ব কমে যায়।
স্পষ্ট কানে বাজে প্রচণ্ডবেগে জড়িয়ে পড়া জলপতনের শব্দ।
ঃ এটি পোখারার সবচেয়ে খরস্রোতা জলপ্রপাত।
সুনীলের কথা যে যথার্থ তাতে আর সন্দেহ নেই। উঁচু পাহাড় থেকে পানি বহু ফুট নিচে আছড়ে পড়ছে। পড়ে, রীতি-মতো ধোঁয়া হয়ে ওপরে উঠেছে। ধোঁয়া, ধোঁয়া আর ধোঁয়া! সাদা ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে জায়গাটা। ধোঁয়ার যে অদ্ভুত একটা সৌন্দর্য রয়েছে, ডেভিড জলপ্রপাতে না এলে ধারণাই করা করা যেত না।

বাইশ
গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনিতে

এবার লুম্বিনীর পথে। বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থস্থান।
পাঁচজনের জন্য একটি ট্যাক্সি ভাড়া করা হলো। শেফারা তিনজন আর বাকি দু জন হেলেন খালা ও খালু ।
ট্যাক্সি চলছে। গৌতমবুদ্ধের জীবনী নিয়ে নানান ধরনের কথা বলতে বলতে সবাই একদম তন্ময় হয়ে গেছেন।
হিমালয় পাহাড়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু। সেখানকার রাজা ছিলেন শুদ্ধোধন। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশের শাক্য গোত্রের। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল মহামায়া। অন্য নাম মায়াদেবী। এক সময় মায়াদেবী তাঁর বাবার বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন।
কপিলাবস্তু শহর ছাড়িয়ে লুম্বিনি গ্রামে পৌঁছেছেন। পথেই লুম্বিনি উদ্যান। সেই উদ্যানেই তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। সনটি ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৭ অব্দ। পুত্রের নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ । তার জন্মের পর পরই মায়াদেবী মারা যান। সিদ্ধার্থ বিমাতা গৌতমীর কোলে লালিত পালিত হন। সেজন্য তাকে গৌতম বলেও ডাকা হয়।
ভবিষ্যতে সিদ্ধার্থ যেন উপযুক্ত শাসক হতে পারে, পিতা শুদ্ধোধন তাঁকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেভাবে গড়ে তোলেন। ষোল বছর বয়সে যশোধরা (অন্য দুটি নাম গোপা ও বিম্বা) নামে খুব সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী এক কন্যার সাথে তাঁর বিয়ে দেন। উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁদের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। নাম রাখা হলো রাহুল।

এতদিন সিদ্ধার্থ খুব আড়ম্বরপূর্ণ জীবনে দিন কাটাচ্ছিলেন। একদিন শিকার করতে গিয়ে প্রথমে একজন অসুস্থ, পরে এক বৃদ্ধ ও এক মৃত ব্যক্তিকে দেখে তাঁর মনে ভীষণ এক পরিবর্তন দেখা দেয় । তিনি নিজের দিকে তাকালেন। তাহলে এই সৌন্দর্য, এই স্বাস্থ্য,... আনন্দ সব নষ্ট হয়ে যাবে? সেও একদিন জরাগ্রস্ত হবে, বৃদ্ধ হবে, শেষ পর্যায়ে মৃত্যু তাকে গ্রাস করবে!

এই তো দুনিয়া! তাহলে এই আনন্দ-স্ফূর্তি, জাঁকজমকভরা জীবনের কী দাম আছে?

www.pathagar.com

এসব চিন্তা ভাবনায় তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। এ সময় এক সন্ন্যাসীর দিব্যকান্তি দেখে তাঁর মনে হলো সংসার ত্যাগ করলে সুখ পাওয়া যাবে।

তাই একদিন সবাই যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি মগধের তৎকলীন রাজধানী রাজগৃহে গমন করেন।

অশোক স্তম্ভ, লুম্বিনি। গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান

সেখানে তিনি দু জন বিখ্যাত সন্ন্যাসীর শিষ্য হন। কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের শিক্ষা তাঁর মনোমত হয় নি। তাই তিনি বর্তমানের বোধগয়ার কাছে উরুভিলা নামক স্থানে গেলেন। সেখানে ব্রাক্ষণদের শিক্ষায় শুরু হয় তার কঠোর তপস্যা।

ছয় বছর ধরে এভাবে থেকে তাঁর শরীরটাই শুধু ক্ষয় হলো কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না।

এরপর একদিন তিনি নিরঞ্জন নদীতে অবগাহন করে একটা পিপল গাছের নিচে বসলেন । মনটাকে তিনি একটা নিয়মের মধ্যে এনে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এ সময়ে তাঁর নিজের মনের মধ্যেই প্রকৃত জ্ঞানের সঞ্চার হলো।

www.pathagar.com

তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ। তাঁর নাম হলো বুদ্ধ। বুদ্ধ মানে জ্ঞানী। তিনি বৌদ্ধধর্ম নামে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। অহিংসা পরম ধর্ম ও জীব হিংসা মহাপাপ, এই ছিল তাঁর ধর্মমতের মূলসূত্র। তিনি সত্যবাদিতা, সংযম, পবিত্রতা, দয়া, দানশীলতা, এসবের ওপর খুব জোর দিতেন।

দিব্যজ্ঞান লাভের পর গৌতমবুদ্ধ ভারতের সারনাথে এসে বৌদ্ধধর্ম প্রচার শুরু করেন। পরবর্তী ৪৫ বছর ধরে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে পৃথিবীর নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন। গরিব কৃষক থেকে শুরু করে রাজা-মহারাজা অনেকেই এই নূতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিহার ও অযোধ্যার লোকেরা গড়ে তোলেন একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তিশালী সংস্থা। এই সংস্থা 'সংঘ' নামে পরিচিত।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৭ অব্দে (কিছু মতভেদ আছে) আশি বছর বয়সে তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কুশীনগরে মৃত্যুবরণ বা নির্বাণ লাভ করেন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যেরা রাজগৃহে একটা সাধারণ সভা ডেকে তাঁর ধর্মমত ও শিক্ষা লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার জন্য একটি প্রস্তাব ও সে সাথে পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তা সমাপ্ত হতে আরো এক শ দু শ বছর লেগে যায়। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম হলো ত্রিপিটক যার মানে হলো তিনটি বাক্স। তাদের অপর একটি পবিত্র গ্রন্থের নাম 'জাতক'!

সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে দিতে বুদ্ধদেবের পুরোটা জীবনীই বিশদভাবে আলোচিত হলো। আলোচনার এক পর্যায়ে ডাক্তারখালু একটা প্রশ্ন রাখলেন,

ঃ আচ্ছা, এই যে নেপালে গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান, কিন্তু এখানে তো জানি শতকরা মাত্র ৭ ভাগ বৌদ্ধ, আর ৯০ ভাগই হিন্দু। তো, বৌদ্ধরা এখানে এতো কম কেন?

জবাবে আব্বা বললেল,

ঃ নেপালে জন্মালে কী হবে! যেহেতু তিনি এখানে এক নতুন ধর্ম বের করেছিলেন, আর সে ধর্ম হিন্দুধর্ম হতে অনেকটা দূরে সরে পড়েছিল, সেজন্যে। তাছাড়া, বৌদ্ধরা নিজেদের সম্পূর্ণ আলাদা মনে করত। প্রধানত এইসব কারণেই বৌদ্ধরা নিজেদের দেশ ও ঘনিষ্ঠরাজ্য ভারত থেকে প্রায় বিতাড়িত। তবে অন্যান্য দেশ যেমন শ্রীলঙ্কা, বার্মা, চীন, থাইল্যান্ড ও আরো বেশ কয়েকটি দেশে বৌদ্ধধর্ম খুব সমাদর লাভ করেছে। ওসব দেশে বৌদ্ধধর্মের লোকেরাই সংখ্যায় বেশি।

বৌদ্ধধর্ম এখন পৃথিবীর অন্যতম একটি প্রধান ধর্মে পরিণত হয়েছে। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। এক পাশে চুড়িয়া পাহাড়ের সারি। ঘন বন ....আর জানা-অজানা হরেক রকম গাছ-গাছালি ও ফুল। তার মধ্যে নেপালের জাতীয় ফুল রোডোডেনড্রোনও রয়েছে ।

লুম্বিনিতে পৌঁছে গেল শেফারা।

চুড়িয়া পাহাড় সারির পাদদেশে, দক্ষিণ দিকে সমতল ভূমিতে লুম্বিনি অবস্থিত। ভাবগম্ভীর একটা পরিবেশ। পৃথিবীর সকল বৌদ্ধদের এবং শান্তিকামী মানুষদের কাছে সর্বাপেক্ষা পবিত্র ভূমি।

সবাই অশোক স্তম্ভের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। খুব উঁচু স্তম্ভ। চারপাশে লোহার গ্রীল দিয়ে ঘেরা। পেছনে ছোট পাহাড়ের স্তূপ ও অতি প্রাচীন একটি বৌদ্ধ মঠ।

শেফার আব্বা আগে থেকেই লুম্বিনির অনেক কিছুই জেনে এসেছেন। বললেন,

www.pathagar.com

ঃ জানেন, ১৮৯৫ সনে ডঃ ফুরার নামে একজন জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত এই আমাদের মতো এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। এসে এই বিরাট পাথরের স্তম্ভটি আবিস্কার করেন। আবিস্কার করেন যে, খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দে ভারতের সম্রাট অশোক এটি নির্মাণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার বেশ কয়েকবছর পর অশোক গৌতমবুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তাঁর জন্মস্থান লুম্বিনিতে এসেছিলেন। স্থানটি চিহ্নিত করে রাখার জন্য তিনি ঐ স্তম্ভটি তৈরি করে ফেললেন। স্তম্ভটির নাম হলো অশোকস্তম্ভ।

সবাই খেয়াল করে দেখে স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা কী সব লেখা।

ঃ ওটাতে কী লেখা আছে? কী ভাষা ওটা আব্বু?

ঃ ওটা ব্রাহ্মি বলে একটা ভাষা আছে, সেই ভাষার লেখা কয়েকটি কথা। কথাগুলো খুব সংক্ষেপে বাংলায় অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়, "এখানেই আশীর্বাদ- প্রাপ্ত বুদ্ধ শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।"

এই অশোক স্তম্ভটি নির্মাণ করে সম্রাট অশোক ।

আব্বা এশিয়ার একজন প্রাচীন অভিজ্ঞ পর্যটক সর্দার ইকবাল আলী শাহের চমৎকার একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিলেন,

'যেমন সারা বিশ্বের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা জেরুজালামের দিকে, মুসলমানেরা মক্কার দিকে, ঠিক যেমনি পৃথিবীর সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায় নেপালের বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনি বাগানের চিহ্নিত স্থানে সম্রাট অশোকের তৈরি স্তম্ভটির দিকে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার জন্য তাকিয়ে থাকে।'

অশোক স্তম্ভের পাশ দিয়ে একটি নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। স্থানীয় লোকেরা এই নদীটিকে বলে 'তৈল নদী '। এরপর তাঁরা মায়াদেবীর মন্দিরের কাছে এলেন।

মন্দিরে উঁচু পাথরের গায়ে সিদ্ধার্থের জন্মলগ্নের দৃশ্য আঁকা। দৃশ্যে ক্লান্ত মায়াদেবী একটা শাল গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে আছেন, আর নবজাত সিদ্ধার্থ একটা পদ্মআঁকা স্তম্ভমূলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দু টি কথিত স্বর্গীয় মূর্তি ওপর থেকে পানি ঢালছে ও পদ্মফুল নিচে ফেলছে।

সেখান থেকে ওরা দু টি বৌদ্ধ মন্দির বা মঠের ভেতর প্রবেশ করে। নতুন তৈরি। নেপালের অত্যন্ত আধুনিক বৌদ্ধ মন্দিরগুলোর মতো করে এ দু টি নির্মিত।

উপাসনা কক্ষে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের বেশ বড় একটি প্রতিকৃতি।

এই আধুনিক দু টি বৌদ্ধ মন্দির ছাড়াও কাছাকাছি কয়েকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির, মঠ ও প্রাচীর রয়েছে। ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে পাথরের খোদাই করা মায়াদেবীর প্রতিকৃতিটি যেমন সুন্দর তেমনই মূল্যবান। লুম্বিনিতে বেশ কিছুদিন ধরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু হয়ে গেছে।

ফেরার পথে শোফার মধ্যে একটা তন্ময়তার ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ঃ কী শেফামণি? তুমি যে কোনো কথা বলছো না?

জবাব না দিয়ে শেফা শুধু মৃদু হাসে।

সে তখন ভাবছে...। ভাবছে, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজর বছর আগে এক মহাপুরুষের মুখ থেকে কী চমৎকার শান্তির বাণী বের হয়েছিল !

কিছুক্ষণ আগে হেলেন খালা কাব্য করে বলছিলেন, গৌতমবুদ্ধ হলেন লুম্বিনি বাগানের একটি অনবদ্য পবিত্র ফুল, আর তাঁর বাণী হলো সেই ফুটন্ত ফুলের মাধুর্যময় সুন্দর গন্ধ!

কী সৌভাগ্য শেফার, সেই সুগন্ধে ভরা মিষ্টি মধুর স্নিগ্ধ বাণী যাঁর মুখ থেকে বের হয়েছিল, তাঁরই স্মৃতি বহন করে সে আজ তা নিজের দেশে নিয়ে যাচ্ছে সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বন্ধুদের জন্যে।

www.pathagar.com

তুষারকুমারী
ও
সাত বামন (অনুবাদ)

হেলেনা খান

প্রকাশক : ঐতিহ্য, ঢাকা
প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০০১।

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

জার্মানির গ্রিম পরিবারের দুই ভাই জ্যাকব গ্রিম (১৭৮৫-১৮৬৩) ও উইলহেম কার্ল গ্রিম (১৭৮৬-১৮৫৯) বহু সংখ্যক জার্মান রূপকথা ও লোককাহিনী তাঁদের দেশীয় বন্ধ-বান্ধব ও পরিচিত লোকজনদের কাছ থেকে মুখে মুখে শুনে সংগ্রহ করেছিলেন। শিশু-কিশোর ও জনসাধারণের রুচি ও ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গল্পগুলো যাতে তাদের মনে রেখাপাত করতে পারে, সেদিকে গ্রিম ভাইদের সতর্ক দৃষ্টি ও যত্ন ছিল অপরিসীম।

গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের এই সমস্ত রূপকথার গল্প সংগ্রহে মূলত জার্মান ইতিহাস, পৌরাণিককাহিনী, প্রকৃতি, অলৌকিক ঘটনা এবং কাল্পনিক উদ্ভট বিষয়াদি স্থান পেয়েছে।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের এই ধরনের গল্পের প্রথম গ্রন্থের বই ৮৬টি গল্প নিয়ে বের হয় এবং ২১০টি গল্পসহ শেষ গ্রন্থটি বের হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

এই সমস্ত জার্মান রূপকথা সংরক্ষণের ব্যাপারে দুই ভাইয়ের শ্রম ও অধ্যবসায় তো ছিলই, সে সাথে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এসব ছাড়াও, তাঁরা জার্মান অভিধান লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। জ্যাকব গ্রিম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন 'জার্মান ব্যাকরণ' লিখে, অন্য দিকে উইলহেম কার্ল গ্রিম রূপকথার গল্পগুলো সম্পাদনার বিষয়ে অধিকতর দায়িত্বে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

গ্রিম ভাইদের সংগৃহীত জনপ্রিয় রূপকথার গল্পগুলো পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই, বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। মূল গল্পগুলো ঠিক রেখে লেখকেরা কিছু না কিছু পরিবর্তন করে, নিজেদের দেশের উপযোগী করে সেগুলো উপস্থাপন করেছেন। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। আমি গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের "তুষারকুমারী ও সাত বামন" গল্পটিতে ছড়া সংযোজন করে বাংলা ভাষাভাষী শিশুদের জন্য বাংলায় লিখেছি এবং তা আমাদের দেশের কৃষ্টি, সভ্যতা ও প্রচলিত ধারার দিকে লক্ষ রেখেই লিখেছি।

হেলেনা খান

www.pathagar.com

তুষারকুমারী ও সাত বামন

এক শীতের দেশে খুব সুন্দর এক রাজপ্রাসাদে এক রাজা তাঁর রানিকে নিয়ে সুখে বাস করতেন। এক রাত্রে খুব ঘন তুষার পড়েছিল। বাড়ি-ঘর, পথ-ঘাট, গাছপালা ,এমন কি নদী ও লেকও বরফে ঢেকে গিয়েছিল। চারিদিকে সাদা,সাদা আর সাদা! সে রাত্রে রানির একটি মেয়ে জন্মালো। ভারি সুন্দর! রং বরফের মতো ধবধবে সাদা। রাজা ও রানি তার নাম রাখলেন তুষারকুমারী।

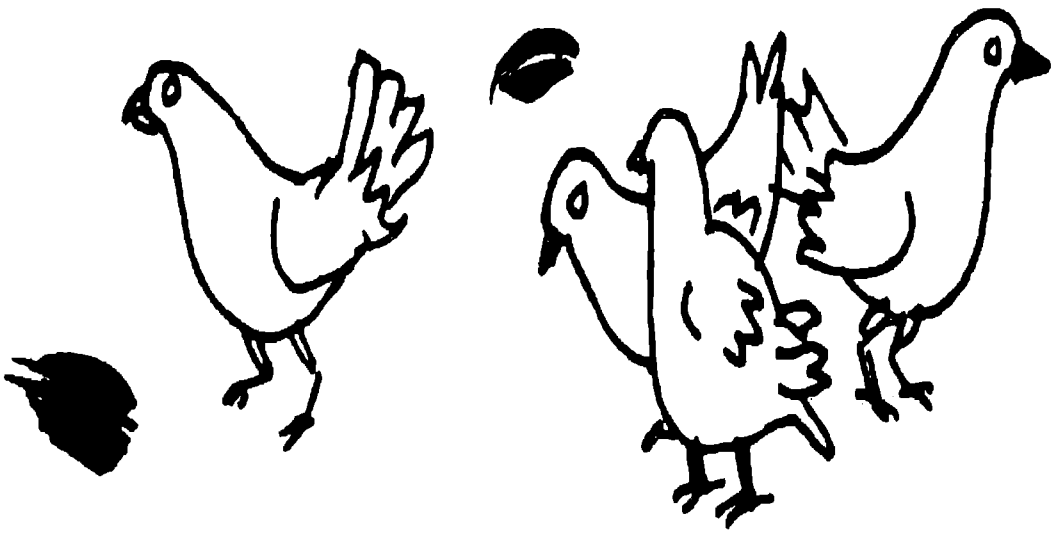

একটু বড় হলে, তুষারকুমারী রাজবাড়ির বাগানে ছুটোছুটি করে খেলা করে। তার সাথিরা হলো রঙিন প্রজাপতি, নানান ধরনের পাখি, কাঠবিড়ালি, হরিণীরা। ফুলে ফুলে ছাওয়া বাগানে ওরা যখন হাত ধরাধরি করে খেলা করে, ফুলেরা হাসি হাসি চোখে তাকিয়ে তা দেখে। মনে হয় তাদেরও তুষারকুমারীর সাথে খেলতে খুব ইচ্ছে হয়।

এমনি করে আনন্দের মধ্যে তাদের সবার দিন কেটে যাচ্ছিল। একদিন-হায়, হায়রে! কী ভীষণ দুঃখের কথারে! তুষারকুমারীর মা সামান্য অসুখেই মরে গেলেন। তুষারকুমারী মায়ের বুকে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

মা, তুমি চোখে বন্ধ করে আছে কেন? তাকাও মা, তাকাও !

কিন্তু মানুষ মরে গেলে তো আর তাকায় না! কিছুই করতে পারে না। তুষারকুমারী কাঁদে, কেবলি কাঁদে। তার পশু-পাখি বন্ধুরা তাকে আদর করতে আসে, কিন্তু তুষারকুমারী মায়ের কথা ভুলতে পারে না। রানির দুঃখে রাজারও খুব মন খারাপ!

রাজার মন্ত্রী ও সভাসদেরা তাই রাজাকে বললেন, হুজুর, আমরা অনুরোধ করছি আপনি আমাদের আগের রানিমার মতো সুন্দরী দেখে কোনো এক রাজার মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনুন! তুষারকুমারী তার মাকে ফিরে পেয়ে দুঃখ ভুলবে, তাতে আপনিও সুখী হবেন ।

www.pathagar.com

রাজা পাশের রাজ্যের সুন্দরী এক রাজকন্যাকে বিয়ে করে রাজপ্রাসাদে আনলেন। তুষারকুমারীকে বললেন, এই যে তুষারকুমারী, এ তোমার মা। মা-মণি এ তোমার মা। তোমাকে আদর করবে, খাওয়াবে ও সুন্দর সুন্দর জামা পরিয়ে দেবে, আরো কত কী করবে! তুষারকুমারী তো এখনো খুব ছোট! সে ভেবেছে, সত্যি তার মা ফিরে এসেছে। সে ছুটে তার কোলে উঠতে গেল। কিন্তু তাকে দেখে তার নতুন মা ছিটকে দূরে সরে যায়। মেয়েকে দেখে তার মনে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে ।

চটের জামা পরে পাকা মেঝে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে তুষারকুমারী

এত সুন্দর তুষারকুমারী ! তার চেয়েও অনেক অনেক সুন্দর! এতদিন সে জানত তার মতো সুন্দরী তাদের ও তাদের আশে-পাশের রাজ্যেও কেউ নেই। কিন্তু এখন একি সে দেখছে! যদিও তুষারকুমারী পরিষ্কার সুন্দর জামা পরেই ছিল, তবু রানি রেগে আগুন হয়ে নাক-মুখ কুঁচকে বলল,

দূর হয়ে যা নোংরা মেয়ে!
আসিস নে মোর কাছে,
তোর ছোঁয়াতে এ-রূপ আমার
বদলে না যায় পাছে!

www.pathagar.com

শুনে তুষারকুমারী কেঁদে ফেলল। এতে রাজার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। তাঁর এত আদরের মেয়েটা! তারই জন্য তিনি বিয়ে করলেন, আর সে কিনা তাকে হিংসে করে! ঘৃণা করে!

রাজা ঠিক করলেন তুষারকুমারীকে যদি তার নতুন মা দেখতে না পারে, তবে তাকে তিনি তার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু এরি মধ্যে রাজা হঠাৎ সাধারণ একটা অসুখে মরে গেলেন। দুঃখে তুষারকুমারীর বুকটা যেন ভেঙে যায়। সে সারাদিন 'বাবা! বাবাগো'! বলে কেবলি কাঁদে।

রাজার মৃত্যুর পর তুষারকুমারীর সৎ মা রাজ্যের সিংহাসনে বসেছে। মহারানি হয়েছে। সে তুষারকুমারীকে একটা চটের জামা দিয়ে বলল,

ওঠ্ তুই, পর এটা!
ঝাঁটা হাতে নে!
কান্নার ঢং রেখে
ঘর ঝাঁট দে!

তুষারকুমারী কুয়া থেকে পানি তুলছে

কী আর করবে তুষারকুমারী! ভয়ে তার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। চটের জামা পরে সে ঘর-দোর-উঠান সব ঝাঁট দেয়, পাকা মেঝে ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে। আরো অনেক রকম কাজ করে সে। রানি তাকে বাঁদির মতো খাটায়, ভাল খেতেও দেয় না। রানির একটা যাদুর আয়না ছিল। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আয়না আমায় বলতো তুই, বল জলদি করে, সবার চেয়ে সুন্দরী কে, আছে সে কোন ঘরে?

www.pathagar.com

আয়না বলে, ওগো রানি, তুমিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সুন্দরী। শুনে রানি খুবই খুশি হলো। খুশি হয়ে সে তখনই আয়নাটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে আনল। এনে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখল।

..অবাক হয়ে যায় তুষারকুমারী। সামনে দাঁড়ানো রাজকুমার

বেচারি তুষারকুমারীর খাটতে খাটতে জান শেষ! কিন্তু তবু তার মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সে যখন কাজ করত, তার পশু-পাখি বন্ধুরা সব তার চারপাশে ঘিরে থাকত। তুষারকুমারী ওদের গান শোনাতো আর কাজ করত! রানি আয়নাকে আবারও জিজ্ঞেস করে,

আয়না আমায় বল্ তো তুই,
বল্ জলদি করে,
সবার চেয়ে সুন্দরী কে,
আছে সে কোন ঘরে?

আয়না আগের মতই বলে, ওগো রানি! তুমিই হলে এখন পর্যন্ত এদেশের সেরা সুন্দরী। খুশি হয়ে রানি আয়নাটার সোনার ওপর পান্না ও হীরের কাজ করিয়ে আনল।

www.pathagar.com

দিন কেটে যেতে থাকে। তুষারকুমারী দেখতে দেখতে বেশ বেড়ে উঠেছে। আগের চেয়ে আরো বেশি রূপসী হয়েছে। আজকাল সে একাকী গুনগুন করে মিষ্টি সুরে একটা গান গায় ও মনের গোপন একটা ইচ্ছে প্রকাশ করে।

একদিন কুয়ো থেকে পানি তুলছে আর গুনগুনিয়ে গান গাইছে,

হাজার কাজের মাঝে আমার
দিন যে বয়ে যায়,
কোথায় আছে রাজকুমার
আসবে নাকি হায়!

তুষারকুমারীর ইচ্ছে হতো কোনো রাজকুমার এসে যেন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এত কষ্ট তার আর সহ্য হচ্ছে না।

তুষারকুমারীকে তুমি গভীর বনে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দেবে

কুয়ো থেকে বালতি তুলেই অবাক হয়ে যায় তুষারকুমারী! নিজের দু চোখকে সে বিশ্বাসই করতে পারে না! সে মনে মনে যা চেয়েছিল, আশ্চর্য! তাই হয়েছে! তার সামনে দাঁড়িয়ে খুব রূপবান এক রাজকুমার! সাথের তেজী এক ঘোড়ার লাগাম ধরে পলকহীন চোখে সে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

www.pathagar.com

এক সময়ে রাজকুমারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এ পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম! হঠাৎ তোমাকে দেখে থামলাম। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, তুমি বনের কোনো দেবী! পরে বুঝলাম, না তুমি একজন মানুষ। খুব রূপসী মেয়ে মানুষ! মনে হচ্ছে তুমি কোনো রাজকন্যা! কিন্তু তোমার পোশাক—

হ্যাঁ:, আমি এ রাজ্যের রাজকুমারী। কিন্তু আমার সৎ মা আমাকে ভাল পোশাক বা খাবার কিছুই দেয় না, পাছে তাঁর চেয়ে আমাকে বেশি সুন্দর দেখায়। আর আমাকে সারাদিন ধরে কেবলি খাটিয়ে মারে।

রাজকুমার বলল, ওগো রূপসী রাজকুমারী! তোমার জন্য আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে! তা, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করে আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই, যাবে তুমি? তুষারকুমারীর রাজকুমারকে ভাল লেগে গেল। কিন্তু ভয়ে তার বুকটা কেঁপে উঠল। সর্বনাশ! তার সৎ মা যদি এঁর কথা জানতে পারে, তবে আর রক্ষা নেই! তাকে তো অন্ধকার শাস্তি ঘরে আটকে রাখবেই, রাজকুমারকেও মেরে ফেলতে পারে! না, না! রাজকুমারের কোনো বিপদ হোক তুষারকুমারী তা চায় না। তাই সে ছুটে রাজপ্রাসাদের ভেতরে চলে গেল।

তুষারকুমারী সাত বামনকে গান গেয়ে শোনাচ্ছে

www.pathagar.com

রাজকুমার অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল! কিন্তু তুষারকুমারী আর বাইরে আসে না।

সেদিন সন্ধ্যায় রানি আগের মতোই আয়নাকে জিজ্ঞেস করল, আয়না আমায় বল তো তুই,

বল্ জলদি করো ,

সবার চেয়ে সুন্দীর কে,

আছে সে কোন ঘরে?

আয়না এবার চুপ করে রইল।

কী হয়েছে? বলছিস না কেন যে আমিই দেশের সেরা সুন্দরী?

আয়না ভয়ে ভয়ে বলল,

ধবধবে ফরসা সে

এ ঘরেরই মেয়ে ,

মাথা ভরা আছে তার

কালো চুলে ছেয়ে।

শুনে রানি রেগে আগুন! দারুণ ক্রোধে সে আয়নাটা মেঝেতে ছুড়ে মারল। যাদুর আয়না বলে সেটা ভাঙল না, একটু ফেটে গেল।

রানি তখন রাজ-শিকারিকে ডেকে চিৎকার করে বলল,

আমার আদেশ! আগামীকাল খুব ভোরে তুষারকুমারীকে তুমি গভীর বনে নিয়ে চিরদিনের জন্য শেষ করে দেবে! আর শোনো, এ কথা যেন কেউ না জানে!

রাজ-শিকারি তখন ভয়ে কাঁপছে। রানি তাকে একটা সোনা, পান্না, চুনি ও মণি-মুক্তা ভরা বাক্স দিয়ে বলল, নাও, এই তোমার উপহার! তুমি যে তুষারকুমারীকে মেরেছ তার প্রমাণ নিয়ে এসে আমাকে অবশ্যই দেখাবে, মনে থাকে যেন!

রাজ-শিকারি তুষারকুমারীকে নিয়ে খুব ঘন একটা জঙ্গলে এল ।

এ সময়ে একটা বাচ্চাপাখি তার বাসা থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে চিঁউচিঁউ শব্দ করে কাঁদতে থাকে। তুষারকুমারী তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বাচ্চা পাখিটাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে আদর করে, তারপর সে তাকে খুব যত্ন করে তার বাসায় শুইয়ে দিয়ে আসে।

এ দৃশ্য দেখে রাজশিকারির মনটা মমতায় ভরে গেল ।.

সে তুষারকুমারীর সামনে দুই হাত জোড় করে বলল, রাজকুমারী, তুমি আমাকে মাফ করে দাও! তোমার সৎ মা তোমাকে মেরে ফেলার জন্য আমাকে কঠোর আদেশ দিয়েছে। কিন্তু আমি কিছুতেই তা করতে পারব না। তাই বলছি,

যাও চলে দূরে
আরো ঘন বনে,
দিশে যেন না পায়
কেউ কোনো জনে।

রাজ-শিকারিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তুষারকুমারী প্রাণপণে ছুটে চলে।

ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে! অবশেষে আর ছুটতে না পেরে ধপ করে এক জায়গায় বসে পড়ল।

www.pathagar.com

ঘন বন, ভীষণ নির্জন ও থমথমে। একটু পরেই সূর্য ডুবে যায়। ভয়ানক অন্ধকার নেমে আসে। হিংস্র পশুদের ডাক শোনা গেল!

তুষারকুমারীর বুকটা ভয়ে দুরদুর করে কাঁপছে। আর ভীষণ কান্না পাচ্ছে! কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত তুষারকুমারী এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে রাজ-শিকারি করল কী, একটা জন্তুকে মেরে তার কলজেটা সেই দামি বাক্সে ভরে রানির সামনে তা রেখে বলল, এই যে মহারানি দেখুন, তুষারকুমারীর কলজে।

দুষ্টরানি খুব খুশি হয়ে হাহ্‌হা, হিহ্‌হি করে অনেকক্ষণ ধরে হাসল।

তারপর লাফ দিয়ে উঠে রীতিমতো নাচ শুরু করে দিল।

এইবার এইবার
আর কেউ নয়,
সুন্দরী সেরা আমি
আমারই জয়!

বামনরা তুষারকুমারীর সঙ্গে নাচতে শুরু করলো

www.pathagar.com

ওদিকে পরদিন সকালে সূর্য উঠলে তুষারকুমারীর ঘুম ভাঙল। সে তাকিয়ে দেখে আরে! তাকে ঘিরে রয়েছে সুন্দর সুন্দর সব পাখি, প্রজাপতি, কাঠবেড়ালী , খরগোশ, হরিণ ও হরিণীরা । সবাই তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে । তুষারকুমারী তাদের দেখে খুব খুশি হলো। তার মুখে হাসি ফুটল।

ছোট্ট একটা পাখি তার কাঁধে এসে বসে, একটা খরগোশ তার পায়ের কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালে। বাচ্চা হরিণ একটা তার দিকে এগিয়ে আসে। তুষারকুমারী আনন্দে বলে ওঠে,

হেথায় আমি নইতো একা
এই তো মিতা কত,
এদের সাথে সুখে আমার
দিন যে হবে গত!

পাখিরা ঠোঁটে করে বন থেকে মিষ্টি ফল এনে তুষারকুমারীকে খেতে দিল । এরপর তার জামা ধরে ধরে তারা তাকে একটা ঝরনার ধারে নিয়ে এল। ঝরনার টলটলে পানি! প্রাণ ভরে পানি পান করল তুষারকুমারী, গোসলও করল সেখানে। গোসলের পর তাকে খুবই সুন্দর দেখায়।

পশুপাখিরা মুগ্ধ চোখে তাকে দেখে। তুষারকুমারী তাদের সাথে খেলা করে। এক সময় বলে, প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা কি আমাকে কোনো জায়গার সন্ধান দিতে পার যেখানে আমি থাকতে পারি?

শুনে দুটো ছোট্ট পাখি কিচির মিচির করে তাদের ভাষায় কী যেন বলল । তারপর তারা তুষারকুমারীর জামা ঠোঁটে ধরে টানতে টানতে একদিকে নিয়ে চলে। পেছনে পেছনে অন্য বন্ধুরাও আসতে থাকে।

এক সময় তারা তুষারকুমারীকে আরো ঘন বনের মধ্যে একটা ছোট্ট কুটিরের সামনে নিয়ে আসে। তুষারকুমারী বলে ওঠে, আরে! এটা যে দেখছি সুন্দর একটা পুতুলের বাড়ির মতো!

নির্জন বাড়ি। ভেতরে কেউ নেই। তুষারকুমারী আস্তে করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। বন্ধুরাও ঢুকল সাথে।

এঃ! ঘরের জিনিসপত্র কী ভীষণ অগোছাল!

তুষারকুমারী সেখানে ছোট ছোট সাতটা চেয়ার দেখল। সে তার নতুন বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে নিশ্চয়ই সাতটি ছোট ছেলে থাকে। আমি ওদের ঘরটা পরিষ্কার করে গুছিয়ে ফেলি! তাহলে বোধ হয় ওরা আমাকে কিছুদিনের জন্য এখানে থাকতে দেবে।

তুষারকুমারী ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করে। সাথে কাজে লেগে যায় তার বন্ধুরাও ।

নিচ-তলার কাজ গুছিয়ে, তুষারকুমারী ওপর-তলায় যায়। গিয়ে দেখে এক সারিতে সাতটা ছোট ছোট বিছানা। তুষারকুমারী বিছানাগুলো ঝেড়ে সুন্দর করে পাতল।

অনেক কাজ করে সে এখন ক্লান্ত। বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, তোমরা এখন যাও! তোমাদের সাথে পরে আবার দেখা হবে। আমার এখন খুব ঘুম পাচ্ছে। একটু ঘুমাবো।

পশু-পাখিরা চলে গেলে তুষারকুমারী ছোট বিছানাগুলোর ওপর শুয়ে পড়ল এবং শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

এখন হয়েছে কী, এই বাসায় সাতজন খুব বেঁটে মানুষ যাকে বলে বামন, তারা বাস করে। সবাই দিনে একটা হীরের খনিতে কাজ করে। বিকেল হলে কাজের শেষে গান গাইতে গাইতে তারা বাসায় ফিরে আসে। আজ এসে তারা অবাক! আরে জানালাগুলো এত ঝকঝক করছে কেন? নিশ্চয়ই কেউ এখানে এসে এ কাজটি করেছে!

www.pathagar.com

তারা ঘরের ভেতরে ঢোকে। কী তাজ্জব কাণ্ড! টেবিল, চেয়ার, মেঝে, কার্পেট, থালা-বাসন কী পরিষ্কার আর সুন্দর করে সাজানো!

নিশ্চয়ই, কেউ ভেতরে এসেছে এবং এইসব করেছে! ওরা একটু ভয় পেয়ে গেল। ভূত-টুত নয়তো!

তারা নিচের ঘরে কাউকে দেখল না। আস্তে আস্তে উপরে উঠে এল ।

অবাক হলো! তাদের বিছানায় একটি মেয়ে ঘুমিয়ে আছে!

একজন বলে ওঠে, আরে ভূত না! একটি মেয়ে!

অন্যজন বলে, হ্যাঁ, ভারি সুন্দরী একটি মেয়ে। রং বরফের মতো দবধবে সাদা! আবার চুলগুলো কুচকুচে কালো। কী সুন্দরই যে লাগছে!

ফলওয়ালি বুড়িকে ডাকলো তুষারকুমারী

www.pathagar.com

ওদের কথার শব্দে তুষারকুমারীর ঘুম ভেঙে যায়। সে চোখ কচলে সাতজন বামন লোকের দিকে তাকায়। বলে, অ! তোমরা ছোট ছেলে নও! তোমরা দেখছি সাতজনই বয়স্ক খুদে মানুষ!

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি কে?

তুষারকুমারী নিজের পরিচয় ও জীবনের সব ঘটনা তাদের কাছে খুলে বলল।

তারা বলল, তুমি মেয়ে তাহলে আমাদের এখানেই থাকো। কেউ কোনো রকম তোমার ক্ষতি করতে এলে, আমরা তোমাকে রক্ষা করব।

ওদিকে রাজপ্রাসাদে রানি যাদুর আয়নাকে প্রশ্ন করে,

আয়না আমায় বলতো তুই
বল জলদি করে,
সবার চেয়ে সুন্দরী কে?
আছে সে কোন ঘরে?

রানি ভেবেছিল আয়না বলবে যে, রানিই এখন সবচেয়ে বেশি সুন্দরী। কিন্তু তা না বলে আয়না বলল,

সাত মানিকের পাহাড় পর
সাত ঝরনার পরে,
দিন কাটছে তুষার মেয়ের
সাত বামনের ঘরে।
সেই সে মেয়েই রূপসী খুব
খুবই ভয়ে বলি,
ঠিক, মনে হয় ফুটে আছে
ম্যাগনোলিয়ার কলি।

আর যায় কোথায়? রানি রেগে চিৎকার করে উঠল,

রাজ-শিকারি আমার সাথে এত বড় মিথ্যে কথা বলল! এত সাহস তার! দাঁড়ারে ব্যাটা, তোর মুণ্ডুটি আমি কাটিয়ে নিচ্ছি!

কিন্তু মুণ্ডু কাটাবে কি, তার আগেই রাজ-শিকারি একেবারে উধাও! দাঁড়ারে মেয়ে! এখন আমি নিজেই তোকে শায়েস্তা করব। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল দুষ্ট রানি।

রানি ছুটে তার অন্ধকার পাতাল ঘরে এল। ঘরটা তার যাদু করার নানান রকম জিনিসে ভরা! সে গুঁড়ো পাউডারে পানির মতো কীসব মিশিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে সেটা সে ঢকঢক করে গিলে নিল। গেলার সাথে সাথেই ওয়াহ, কী বিচ্ছিরি! সে একটা কুৎসিত বুড়ি মেয়েমানুষে বদলে গেল। বদলে গিয়েই সে লাল রঙের একটা আপেলের ওপর বিড়বিড় করে যাদুর মন্ত্র পড়তে থাকে।

উকরি, মুকরি বকরীর ছা,
যারে ফল তুই, বিষ হয়ে যা!

www.pathagar.com

আপেলটা সত্যি সত্যিই বিষে ভরে গেল! এই বিষভরা আপেলে একটা কামড় যদি দেয় ওই মেয়ে, বাস্! সাথে সাথেই সব শেষ! কী ফুর্তি! কী আনন্দরে! ডাইনিরূপী সৎ মায়ের সেকি খ্যাক, খ্যাক, খ্যাক, ঘ্যাক, ঘ্যাক করা বিদঘুটে হাসি!

তুষারকুমারী সে রাত্রে সাত বামনের বাসায় খুব মজার মজার খাবার রান্না করেছে। রান্না শেষ করে সে বামনদের বলল, ওহে আমার খুদে ভাইয়েরা, আমার রান্না শেষ। তোমরা সবাই গোসল সেরে খাবার টেবিলে এস!

আপেলে কামড় দিতেই মেঝেতে ঢলে পড়লো তুষারকুমারী

গোসল! ওরা এই কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল । কিন্তু তুষারকুমারী তাদের তা ভুলতে দেবে না। বলল, উঁহুঁ, গোসল না করে এলে , কেউ মজার খাবার পাবে না!

অগত্যা তারা গোসল করে পরিষ্কার হলো ও খাবার টেবিলে এসে গপাগপ করে মজার মজার খাবার খেয়ে ভারি খুশি হলো।

www.pathagar.com

এবার একটু আনন্দ করা। এক বামন তার ক্ষুদে পিয়ানো বাজাতে শুরু করে। অন্য একজন বেহালা ও আর একজন বাজায় ড্রাম। অন্যেরা তুষারকুমারীকে নিয়ে এখন নাচবে।

ওদের একজন অন্যজনের ঘাড়ে উঠে, একটা লম্বা কোট দু জনের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তুষারকুমারীর মতো লম্বা হয়। তারপর তার হাত ধরে নাচতে শুরু করে। নাচতে নাচতে ওপরেরজন ধপ করে পড়ে যায়। তাদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। এরপর তুষারকুমারী ও ওরা সবাই ঘুমাতে গেল।

পরদিন সকাল । কাজে যাবার আগে ওরা তুষারকুমারীকে বলল, শোনো বোন, খুব সাবধানে থেকো! তুমি যাকে চেন না, তেমন কেউ এলে দরজা খুলো না কিন্তু! বলা যায় না, দুষ্ট রানি কী না করতে পারে!

তুষারকুমারী মৃদু হেসে বলল, কিছ্ছু ভেবনা ভাইয়েরা আমার ! আমি সাবধানেই থাকব।

তুষারকুমারীর বামন ভাইয়েরা কাজে চলে গেছে। সে তাদের জন্য মজার খাবার তৈরি করতে বসে। তার খাবার তৈরি প্রায় শেষ, এমন সময় বাইরে এক বুড়ি ফলওয়ালির দুর্বল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ফলওয়ালি বুড়ি আমি
আপেল বেচে খাই,
কেউ যদি গো দয়া কর
আপেল বেচে যাই!

তুষারকুমারীর মনটা তো খুব মায়ায় ভরা! সে ভাবল আহা, বুড়ো মানুষ! কষ্ট করে ফল বেচে খায়! আমি কটা আপেল কিনলে ওর কিছুটা সাহায্য হবে।

বুড়ির দুঃখের কথা ভেবে, সে নিজের বিপদের কথা একেবারেই ভুলে গেল। সে ফলওয়ালিকে ডাকল । তার পশু-পাখি বন্ধুরা কিন্তু দূর থেকেই ডাইনিবেশী রানিকে চিনতে পারল। তারা ছুটে এসে নিষেধ করার আগেই রানি তুষারকুমারীর দিকে একটা আপেল এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি মেয়ে কততো ভাল! আমার কষ্ট দেখে তুমি ফল কিনে নিতে চাচ্ছ! তা পয়সা দেবার আগে একটা আপেল এক কামড় খেয়ে দেখনা! খারাপ হলে আমি একটা পয়সাও নেব না।

তুষারকুমারী যেই না আপেলে একটা কামড় দিয়েছে, অমনি তার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। সে মেঝেতে ঢলে পড়ে যায়। মেঝেতে পড়ে যেতে যেতে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সুন্দর রাজকুমারের মুখখানা। সে বিড়বিড় করে কোনো রকমে বলে,

কোথায় ওগো, রাজারকুমার,
আছো কোন দেশে?
হাত বুলিয়ে মাথায় আমার
বাঁচাও হেথা এসে!

ডাইনিরূপী রানি হাহ্, হাহ্, হাহ্! করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আর বলে, কেমন মজা! কেমন মজা আমার চেয়েও সুন্দরী হবার কেমন পেলি সাজা! বলে, আর বিদঘুটে স্বরে হাসতে হাসতে ধেই ধেই করে নাচতে থাকে।

www.pathagar.com

পশু-পাখিরা তখনই ছুটে সোনার খনিতে এল। তারা বামনদের কাপড় কামড়ে ধরে টানতে থাকে । ওরা বুঝল, নিশ্চয়ই বাসায় ভয়ানক কিছু একটা হয়েছে। তারা তখনই লাফ দিয়ে একেকজন একেকটা হরিণের পিঠে চড়ে বসল। হরিণেরা তাদের পিঠে নিয়ে ছুট্! ছুট্! ছুট্!

পথেই তারা ছদ্মবেশী দুষ্ট রানিকে পেল! ওদের দেখে রানির বুক ধড়ফড়, ধড়ফড়, ধড়ফড় করতে শুরু করেছে! অ সব্বোনাশরে! বামুনরা যে তার পেছন পেছন ছুটে আসছে! সে পাশে পেল একটা খাড়া পাহাড়। তাড়াতাড়ি সেটাতে উঠতে থাকে সে । দুষ্ট রানি উঠছে, হরিণের পিঠে বামনেরাও তার পেছন ধাওয়া করছে। তাদের হাতে হাতুড়ি, কোদাল ও শক্ত শাবল।

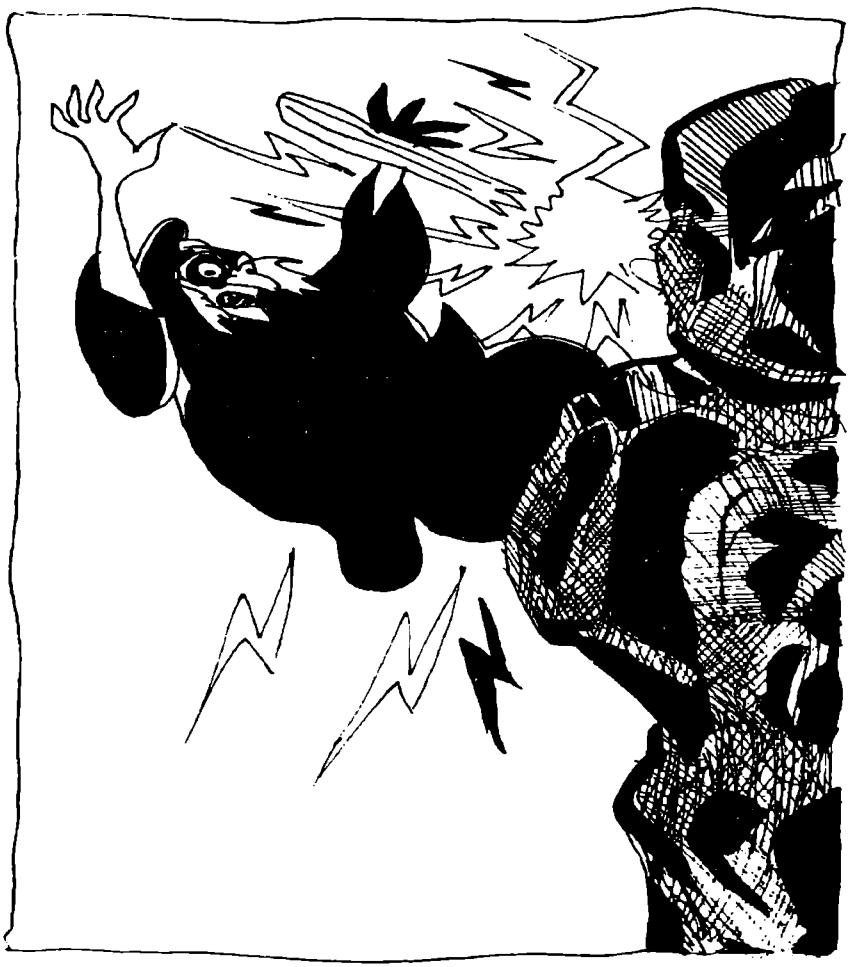

আকাশ থেকে এসে একটা বিদ্যুৎ এসে পড়লো ঠিক দুষ্টু রানির ঘাড়ে।

ডাইনি-রানি ছুটছে, ছুটছে! ছুটতে, ছুটতে তার লম্বা জিব বের হয়ে পড়েছে। সেই অবস্থাতেই সে খাড়া উঁচু পাহাড়টার চূড়ায় উঠে এল। চূড়ায় উঠে অবশ্য পাহাড়ের কিনারায় সরু একটা জায়গায় আটকা পড়ে গেল। নিচে বিশাল সমুদ্র। পড়লে আর রক্ষা নেই!

www.pathagar.com

বামনেরা তাকে প্রায় ধরে ধরে অবস্থা! এমন সময় দুষ্ট রানি করল কী, বিরাট একটা পাথর তুলে নিল। যেই না সেটা সে তাদের দিকে ছুড়ে মারতে যাবে, হঠাৎ আকাশ থেকে চোখ ধাঁধাঁনো একটা বিদ্যুৎ নেমে এল। এসে পড়বি তো পড়, একেবারে দুষ্ট রানির ঘাড়ে।

এবড়ো, থেবড়ো পাহাড়ের গা বেয়ে রানি গড়াতে থাকে। গড়াতে গড়াতে সে নিচে পড়ছে। নিচে পড়তে পড়তেও ডাইনি- রানি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, সাত বামনকে গালি দিচ্ছে ।

উকরি, মুকরি, ঐরে বুটুরি
রাখরে বেঁচে নিই,
বাঁচার পরে দেখবি ওরে
ক্যামন পিটুনি দিই!

কাঁদতে কাঁদতে বামনরা তুষারকুমারীর প্রাণহীন দেহ বিছানায় শুইয়ে দিল।

www.pathagar.com

কিন্তু দুষ্টটার পিটুনি দেবার আর সুযোগ হলোনা। সে গড়াতে, গড়াতে, গড়াতে একেবারে পাহাড়ের তলায় এসে চিৎপটাং হয়ে পড়ল। আর পড়েই জিব বের করে মরে গেল।

ডাইনি-রানি মরে গেলে সাত বামন বাড়ি ফিরে এল! এসে দেখে, তাদের আদরের তুষারকুমারী মেঝেতে পড়ে আছে। তার দেহে প্রাণ নেই। দুঃখে তারা বিলাপ করে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে তারা তুষারকুমারী প্রাণহীন দেহ তার বিছানায় শুইয়ে দেয়।

পরদিন তারা বড় একটা সোনার বাক্স তৈরি করল। করে, তার মধ্যে তুষারকুমারীকে অতি যত্নে রেখে দেয়। বাক্সের ওপরে কাচের ঢাকনা রাখল, যাতে তারা তুষারকুমারীকে দেখতে পায়।

রাজকুমার দেখে তুষারকুমারীর প্রাণহীন দেহ নিয়ে সাত বামন বসে আছে।

সোনার বাক্সটা তারা কাঁধে করে একটা নির্জন, গভীর বনের মধ্যে নিয়ে এল। চারদিকে লম্বা পাইন গাছ। তার নিচে বাক্সটা রেখে, তার চারপাশ ঘিরে তারা বসে থাকে; কাঁদে আর ভাবে এই বুঝি তাদের প্রিয় তুষারকুমারী জেগে উঠবে! বেশ কয়েকদিন এভাবে কেটে যায়। তুষারকুমারী আর জেগে ওঠে না।

ওদিকে সেই যে রাজকুমার, যে তুষারকুমারীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সে রাজবাড়িতে তুষারকুমারীর খোঁজ নিতে গেল। গিয়ে শোনে, তুষারকুমারী একদিন একা গভীর জঙ্গলে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।

www.pathagar.com

সেখানে সে নাকি কোনো বাঘ বা ভল্লুকের থাবায় মারা গেছে। শুনে দুঃখে রাজকুমারের বুকটা ফাঁকা হয়ে যায়। তবু তার কেবলই মনে হতে থাকে–না, তুষারকুমারী মরে নি! নিশ্চয়ই সে কোনো বনে বেঁচে আছে।

সে তার ঘোড়া ছুটিয়ে এ-বন, সে-বন, সারা বনে তুষারকুমারীকে খুঁজতে থাকে।

.....খুঁজতে, খুঁজতে, খুঁজতে একদিন সে সেই বনের মধ্যে এল, যেখানে তুষারকুমারীর প্রাণহীন দেহ একটা সোনার বাক্সে রেখে, সাতজন বামন তার চারপাশে বসে চোখের পানি ফেলছে।

রাজকুমার বাক্সটার কাছে এল । একি! তুষারকুমারী যে সত্যি সত্যিই মরে গেছে! তার দু চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে।

তুষারকুমারীকে রাজকুমার তার প্রাসাদে নিয়ে চলল।

সে কাচের ঢাকনাটা তুলে ধরে। কান্নাভেজা স্বরে বলে, এতদিন পর ওগো আমার প্রিয় তুষারকুমারী! তোমাকে আমি খুঁজে পেলাম! হায়! তোমার একি দশা দেখছি! কিন্তু আমার মন বলছে, তুমি মর নি!

সে তুষারকুমারীর দিকে ঝুঁকে পড়ে তার মাথায় ও মুখে আদর করে হাত বুলাতে থাকে আর বলে,

www.pathagar.com

ওঠো, ওগো রাজার মেয়ে
তাকাও চোখ মেলে,
মন বলছে জাগবে তুমি
আমার ছোঁয়া পেলে।

তুষারকুমারীর যাদুর ঘোর কেটে গেল। সত্যি সত্যিই সে জেগে উঠল। চোখ মেলে সে তাকালো। আনন্দে রাজকুমার তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নেবার জন্য এগিয়ে গেল। এবার আর তুষারকুমারী সেই প্রথমবারের মতো রাজকুমারের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গেল না।
সাত বামনের খুশি আর ধরে না! তারা রাজকুমার ও তুষারকুমারীকে ঘিরে বেশ কিছুক্ষণ নেচে গেয়ে আনন্দ প্রকাশ কারে । বিদায় নেবার সময় তুষারকুমারী ছলছল চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বলে,

জীবন ভর তোমরা ক জন
রইবে আমার মনে,
মাঝে মাঝেই আসতে হবে
থাকতে মোদের সনে।

এরপর তুষারকুমারীকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে রাজকুমার খুব ধুমধাম করে বিয়ে করল। বিয়েতে সাত বামনকে দাওয়াত করে আনা হলো। শুধু বিয়েতেই নয়, যখনই রাজপ্রাসাদে কোনো অনুষ্ঠান হতো,

তুষারকুমারী ও রাজকুমার তাদের দাওয়াত করত।
তারা খুশি হয়ে আসত। এসে, হেসে-খেলে, নেচে গেয়ে, আনন্দ করে, পেটপুরে খেয়ে তারপর তাদের সুখী তুষারকুমারীর শুভ ও মঙ্গল কামনা করে চলে যেত।

www.pathagar.com

বুদ্ধির বাহাদুরি(নাটিকা)

হেলেনা খান

www.pathagar.com

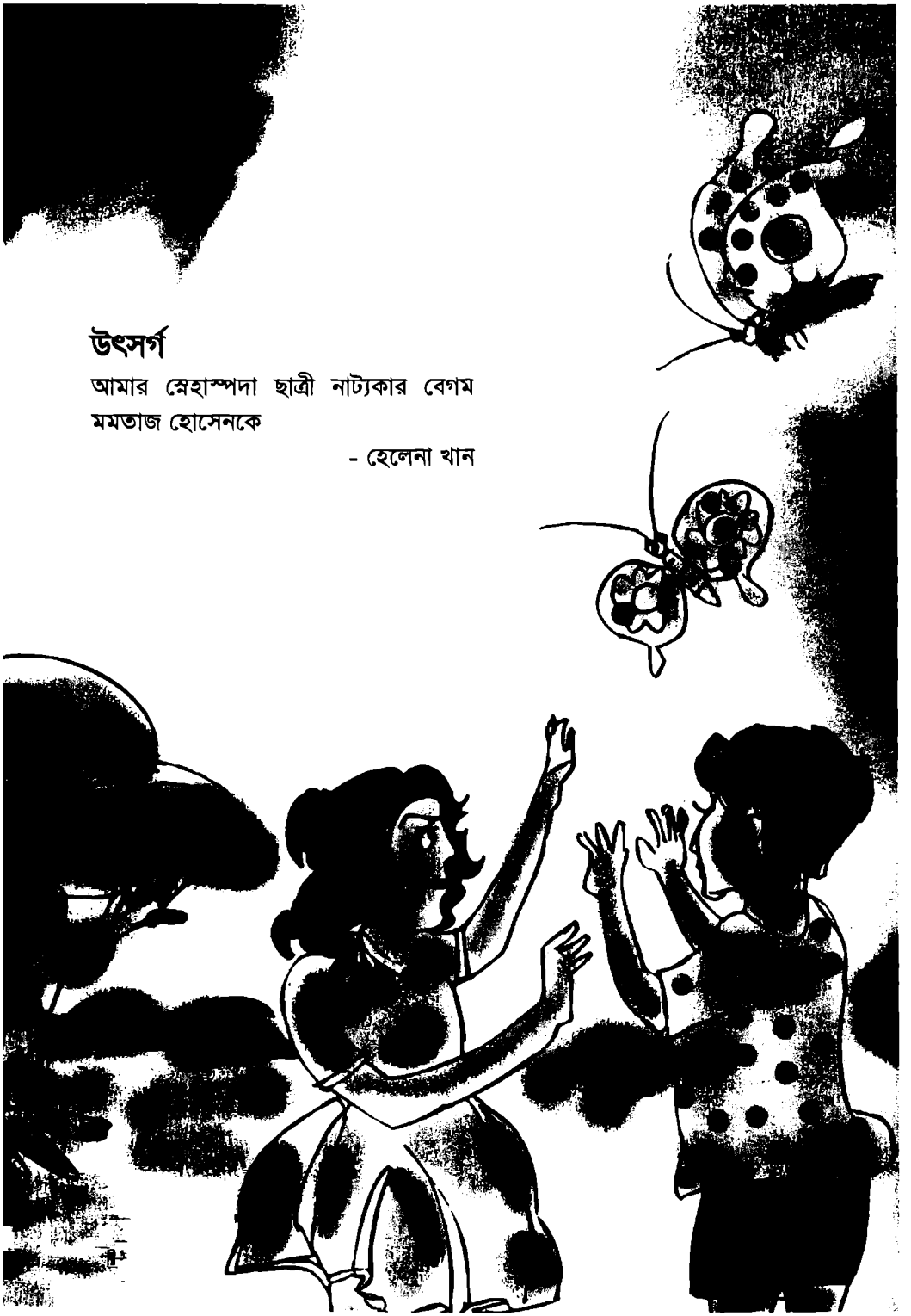

উৎসর্গ

আমার স্নেহাস্পদা ছাত্রী নাট্যকার বেগম মমতাজ হোসেনকে

- হেলেনা খান

www.pathagar.com

১ম দৃশ্য

পর্দা ওঠার পর উইংস্‌এর এক দিক থেকে হাসিমুখে লাফিয়ে লাফিয়ে বাঁশি (যে কোনো ধরনের বাঁশি) বাজাতে বাজাতে বে-আক্কেল আলীর স্টেজে (ডালপালা শোভিত গ্রামের একটি পথ) প্রবেশ।

বাঁশি বাজাতে বাজাতে দু এক চক্কর লাফিয়ে স্টেজের মাঝ খানে এসে থামে। চারদিকে ভালভাবে তাকিয়ে স্বগতোক্তি ঃ ওঃ ! এই পৃথিবীটা কী সুন্দর! ওঃ কী সুন্দর বন! কী চমৎকার গাছপালা! (উইংসএর বাঁ দিকে তাকিয়ে) ওদিকে ফুলে ফুলে ছেয়ে যাওয়া কী অপরূপ ঝোপঝাড়ে প্রজাপতি রঙিন পাখা মেলে উড়ছে! আর ফুলের মিষ্টি গন্ধ! সবুজ মখমল ঘাস, পাকা ধানের বোঝাই ক্ষেত; হলুদ সরষে ফুলে ছাওয়া কী সুন্দর দৃশ্য! সাদা, গোলাপি ও বেগুনি ফুলে বোঝাই শিমের জাংলা, কী অপরূপ!
(ডান দিকে ফিরে) সাগর! কী বিশাল সাগর তুমি! তোমার তীরে কত ঝিনুক! আর ঝিনুক ভরা মুক্তো আর মুক্তো! সূর্যের আলোয় ঝিলমিলে ওই বালুকণা হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে! চোখ ধাঁধানো দ্যুতি ছড়াচ্ছে! (পেছন ফিরে হাত দিয়ে দেখিয়ে) আর ওদিকে কত উঁচু পাহাড়! আর কত ধরনের বন্য পশু-পাখি! (কয়েকবার পেছন দিকে ভালভাবে ঘুরে ফিরে দেখে তারপর স্টেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে) এ সবই আমার! এ আমার দেশ! আমি যেখানে খুশি যেতে পারি, যেখানে খুশি থাকতে পারি!
(দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) পিছুটান? আমার আর এখন পিছুটান নেই। কেন নেই? আমার জন্মের সাথে সাথেই মা মারা গেছেন সেই পনেরো বছর আগে। বাবার কোলে আমি মানুষ। তিনিও এ বছর আমাকে ছেড়ে এ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। (দীর্ঘশ্বাস)।

www.pathagar.com

(এরপর স্টেজের এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে পেছনের পাহাড়ের দিকে উঁকি মেরে ভাল করে দেখে নিয়ে)

ঃ আরে! দূরে–ওই অনেক দূরে মস্ত বড় একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে যে! মনে হচ্ছে ওটা কোনো প্রাসাদ! খুব সুন্দর! (হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে পথের এক দিকে দেখিয়ে) এই যে, এ পথে কে যেন আসছে না? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে! (হাসি মুখে) ভালই হলো! এই বনের মধ্যে একজন সাথি পাওয়া গেল। যে লম্বা পথ! যাহোক, এখানে একটু অপেক্ষা করা যাক!

(গাছের কাটা গুঁড়িতে বসে আস্তে আস্তে বাঁশি বাজাতে থাকবে। মুরগিওয়ালার প্রবেশ। কাঁধে তার একটা মাঝারি আকারের কাঠের বাক্স। সে একটা গামছা দিয়ে তার মুখ ও কপালের ঘাম মুছছে। মনে হচ্ছে বাক্সটা বহন করতে তার কষ্ট হচ্ছে। মুখে তার বিরক্তির কুঞ্চন!

(বে-আক্কল আলী তার কাছে গিয়ে নরম স্বরে)

বে-আক্কেল আলীঃ আস্‌সালামু আলাইকুম জনাব !

(মুরগিওয়ালা তার কথার উত্তর না দিয়ে চলতে থাকবে। বে-আক্কেল আলী তার সাথে পেছন পেছন চলে।)ঃ জনাব, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? মনে হচ্ছে আপনার কাঁধের বাক্সটা খুব ভারি, যদি দেন, তবে আমি খুশি হয়েই ওটা বহন করতে পারি। (একটু থেমে) তা, ওটার ভেতর কী আছে জনাব?

মুরগিওয়ালা (বে-আক্কেল আলীর প্রতি তীক্ষ্ম ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে)

ঃ তাতে তোমার কী হে ছোকরা? এখানে তোমার জন্য কিছু নেই।

www.pathagar.com

বে-আক্কেল আলী (দুঃখিত হয়ে) না, জনাব ! আমি আমার জন্য কিছু আছে ভেবে প্রশ্ন করি নি। বাক্সটা আপনার বইতে কষ্ট হচ্ছে দেখে– যাক গে জনাব, কিছু মনে করবেন না।

(বে-আক্কেল আলী অন্যমনস্কভাবে নিজের পকেট নাড়তে নাড়তে স্বগতোক্তি)

ঃ কী দরকার আমার গায়ে পড়ে অন্যের উপকার করতে যাওয়ার? বেচারার কষ্ট হচ্ছিল বলে আমি একটু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। তা উনি তা চান না। রেগে গেছেন! যাক গে – আমার কী!

(বে-আক্কেলের পকেটে টাকার শব্দ শুনে মুরগিওয়ালা ফিরে তার কাছে এল। বাক্সটা নামিয়ে নরম স্বরে)ঃ ওহে বাছা শোনো! একটু সবুর করো।

বে-আক্কেল-আলী। (ফিরে, নরম সুরে)ঃ জনাব, আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন?

মুরগিওয়ালাঃ আমার মনে হলো তোমার দু পকেট ভরতি টাকা! শব্দ শুনলাম–ঝনঝন, ঝনঝন!

বে-আক্কেল আলীঃ জ্বি টাকার শব্দ ওরকমই হয়ে থাকে। ঝনঝন ---- ঝনঝন! (পকেট থেকে কয়েকটা রুপার টাকা বের করে দেখালো)

ঃ তা জনাব, আপনি কি কিছু টাকা চান?

মুরগিওয়ালা (কপট ভঙ্গিতে)ঃ না, না ! আমি কেন বাছা তোমার টাকা চাইব? আসলে কী জান বাছা, আমি তোমার কথা ভাবছিলাম! তুমি একেবারেই একা, তার ওপর ছেলে মানুষ! এভাবে টাকা নিয়ে পথ চললে ঠগ, জোচ্চোর বা চোর-ডাকাতের হাতে পড়তে পার কিনা! তাই ভাবছিলাম–

বে-আক্কেল ঃ আমার জন্য ভেবে আপনি মানসিক কষ্ট পাবেন না জনাব! ঠগ জোচ্চোরেরা আমাকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিতে পারবে না। আর ডাকাতরাও আমার সাথে পেরে উঠবে না। এই দেখছেন জনাব, আমার দুই হাতের কব্জি ও মাংসপেশি! (দেখাবে)।

মুরগিওয়ালাঃ (অন্যদিকে ফিরে, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি) বটে, ছেলেটার গায়ে অনেক শক্তি আছে বলেই মনে হয়! (সরবে)ঃ তা বাছা, তোমার নামটা কী জানতে পারি?

বে-আক্কেলঃ নিশ্চয়ই জনাব, আমার নাম বে-আক্কেল আলী।

মুরগিওয়ালা (হঠাৎ খুব খুশি হয়ে যায়। খুশিতে তার দু চোখের তারা নেচে ওঠে। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি)ঃ এই বোকাটার কাছ থেকে টাকাটা মেরে দেয়া কিছুমাত্র কঠিন কাজ হবে না। (এরপর বে-আক্কেল আলীর দিকে ফিরে সরবে) ঃ তা, বে-আক্কেল মিয়া, কে তোমার এমন নাম দিয়েছে?

বে-আক্কেল ঃ মিয়া নয়, আলী। আমার মা-বাবা এ নাম দিয়েছেন, কারণ– মুরগিওয়ালা (সব দাঁত বের করে হেসে)ঃ বুঝেছি, বুঝেছি বাছা! তোমার মা বাবা কেন তোমাকে এ নাম দিয়েছেন!

(স্টেজের দিকে এগিয়ে এসে অত্যধিক খুশি হয়ে স্বগতোক্তি)

ঃ গায়ে শক্তি থাকলে কী হবে! নিশ্চয়ই এ ছোকরা একটা ভ্যাবলা! বোকার হদ্দ! ওঃ! আমার কপাল ভাল! খুবই ভাল! হাবলার কাছ থেকে অতি সহজেই টাকাগুলো গাপ মেরে নেয়া যাবে! (বে-আক্কেলের দিকে ফিরে সরবে)ঃ তোমার নাম বে-আক্কেল আলী! চমৎকার নাম! তা, তোমার অন্য কোনো নাম নেই?

বে-আক্কেলঃ আছে। তবে আমি এ নামেই পরিচিত।

মুরগিওয়ালাঃ বেশ, বেশ, খুব চমৎকার নামে তুমি পরিচিত হয়েছ! তা বৎস বে-আক্কেল আলী, কিছু মনে করোনা! একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

www.pathagar.com

বে-আক্কেলঃ একটা কেন, হাজারটা কথা আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন!

মুরগিওয়ালাঃ বাহ্, বেশ, বেশ! তা, তুমি দু পকেট ভরতি এত টাকা কোথায় পেলে?

বে-আক্কেলঃ কোথায় মানে? কী ভেবেছেন আপনি? আমি কি টাকাগুলো চুরি করে এনেছি? এ্যাঁ! চুরি করে? জ্বি-না, জ্বিনা সাহেব, টাকাগুলো আমি চুরি করে আনি নি। টাকা কেন, কারো গাছের একটা মরা পাতাও আমি ছুঁয়ে দেখি না। বরঞ্চ আমি কী করি জানেন জনাব? চোর ডাকাত দেখলে ধরিয়ে দেই, বাদশার কোটালের কাছে ধরিয়ে দেই!

মুরগিওয়ালাঃ (কপট ভঙ্গিতে) সত্যি? অ, বাবারে!

বে-আক্কেলঃ তা জনাব, জানতে চেয়েছিলেন না আমি এত টাকা কোত্থেকে পেয়েছি? পেয়েছি আমার বড় দুই ভাইয়ের কাছ থেকে। বুঝলেন, বড় দুই ভাইয়ের কাছ থেকে।

মুরগিওয়ালাঃ তা, তোমার দুই ভাই তোমাকে এত টাকা দিয়ে দিলেন?

বে-আক্কেলঃ কেন দেবেন না? আমার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আমার অংশটা তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন। দিয়ে বলেছেন, যাও, ঘরে বসে না থেকে এ টাকা নিয়ে ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো! এ পৃথিবীটা এখন তোমার হাতের মুঠোয়, বুঝলে? (মুরগিওয়ালার কাছে সরে এসে) কথাটা খুবই সত্যি, তাই না জনাব? (চারিদিকে তাকিয়ে) ওঃ! পৃথিবীটা সত্যি কত ছড়ানো! আর কত সুন্দর! তাই না?

মুরগিওয়ালাঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! এত বড়, আর এত সুন্দর পৃথিবী! অথচ কী কাণ্ড দেখ, তুমি আর আমি ছাড়া এটা কেউই লক্ষ্য করে নি!

বে আক্কেল ঃ তা বটে, তা বটে! আপনার কথা শতকরা এক শ ভাগই সত্যি!

www.pathagar.com

মুরগিওয়ালাঃ তা বাছাধন, এই পৃথিবীতে তো কত কিছুই আছে সুন্দর সুন্দর! আমার এই বাক্সটার মধ্যেই একটা অত্যন্ত সুন্দর জিনিস আছে যা দেখে তুমি একেবারে হাঁ হয়ে যাবে! আমার কাছ থেকে এটা এক্ষণই কিনে নেবার জন্য রীতিমতো পীড়াপীড়ি শুরু করবে!

বে-আক্কেলঃ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই জনাব, আপনি যখন বলছেন, তা অত্যন্ত সুন্দর না হয়েই যায় না! আর এখন আমার পকেট ভরতি টাকা আর টাকা! টাকা থাকা তো ভাল এবং সুন্দর জিনিস কেনা-কাটা করবার জন্যই! ঠিক কিনা!

মুরগিওয়ালাঃ (পাশে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বগতোক্তি) ঃ বাস, কেল্লা ফতে! ওষুধ ধরে গেছে! বুক্কুসটা কিছু না দেখেই পছন্দ করে ফেলেছে! তাহলে দাম একটা যা ধরব কিনা! এক্কেবারে দশগুণ! (সরবে) তা, এস বাছা, এদিকে এস! (বাক্সের ডালা খুলে) দেখ, কী সুন্দর একটা মুরগি! আমি হলফ করে বলতে পারি, এত সুন্দর মুরগি তুমি আগে কোথাও নিশ্চয়ই দেখো নি!

বে-আক্কেল (মুরগিটা দেখে)ঃ জ্বি, আপনি ঠিকই বলেছেন। ধবধবে সাদা, মোটা তাজা খুব সুন্দর মুরগিটা আপনার! এত সুন্দর মুরগি আমি আগে কখনো দেখিনি! অদ্ভুত সুন্দর! সাদার মধ্যে আবার লাল ফুটি!

মুরগিওয়ালাঃ হ্যাঁ, সেজন্যেই তো এটা আমি বাক্সে করে নিয়ে যাচ্ছি। খোলা রাখলে কেউ না কেউ কেড়ে নিয়ে যেতে পারে!

(দূরের এক দিক দেখিয়ে) ওই যে দেখছ পাহাড়ের ওপর বিরাট একটা প্রাসাদ, ওখানকার বাদশার কাছে আমি এটা বিক্রি করতে যাচ্ছিলাম। তা, তুমি বাছা খুবই ভাল মানুষ! তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে!

বে-আক্কেল ঃ আপনাকেও আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তাই আপনার মুরগিটা আমিই কিনব। তা, মুরগিটার দাম কত জনাব?

মুরগিওয়ালাঃ দাম? দাম তো এটার পাঁচ শ টাকা হবেই! তবে তোমার জন্য দু শ। মাত্রই দু শটি টাকা!

বে-আক্কেলঃ কী বললেন? দু শ! বিশ টাকার মুরগি আপনি দু শ টাকা চাচ্ছেন?

মুরগিওয়ালাঃ দেখছ না কেমন বাহারের মুরগিটা আমার! বাদশার লোক দেখলেই খপ করে এটা তুলে নেবে, আর টুক করে পাঁচ শটা টাকা ফেলে দেবে!

বে-আক্কেলঃ (পাশে গিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) হুঃ! নামটা আমার বে-আক্কেল আলী বলে ব্যাটা আমাকে সত্যি বে-আক্কেল মনে করছে! উঁহু! আর যাই হোক, নামের সাথে আমার মাথার একটুও মিল নেই, তা একটু পরেই মুরগিওয়ালা বাড়িতে গিয়েই তা বুঝবেন! (মুরগিওয়ালার দিকে ফিরে স্বগতোক্তি)ঃ আপনাকে আমি ডান পকেটের রুপোর টাকা দেবো আঠারটি আর বাকি অনেকগুলো দেবো তামার পয়সা, যা আসলে মুরগির দাম যা হবে, তা-ই আপনি পাবেন। (সরবে) এই যে জনাব, আপনার মুরগির দাম নিন! (রুপার টাকা দেখিয়ে, পকেটে থেকে থলে বের করে ঝনঝন শব্দ তোলে। (মুরগিওয়ালা খপ করে টাকার থলেটা ধরে নিয়ে হনহন করে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে।)

বে-আক্কেল আলীঃ (পেছন থেকে)ঃ ওকি জনাব, গুণে নিলেন না? অবশ্য না গুনলেও চলবে! আপনার মুরগির ঠিক ঠিক দামই কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি! একটুও ঠকাই নি জনাব!

(মুরগির বাক্স নিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়)

বে-আক্কেল আলীর স্বগতোক্তিঃ লোককে ঠকানো খুবই খারাপ! অন্যায়! তবে উচিত শিক্ষাটা না দেয়াও বোকামি! জনাব মুরগিওয়ালা! আমাকে বোকা ঠাউরে খুব বড় রকম একটা দাও মারতে চেয়েছিলেন! হুঁ হুঁ ! বাড়িতে গিয়ে বুঝবেন কে বোকা আর কে চালাক! তবে হ্যাঁ, আবারও বলছি, আপনাকে আমি একটুও ঠকাই নি জনাব!

www.pathagar.com

২য় দৃশ্য

জঙ্গলের মধ্যে পথ। পথের দু ধারে সুন্দর গাছপালা ফুলে ফুলে ভরা। বে-আক্কেলঃ (কাঁধে মুরগির বাক্স। ডান হাতে বাঁশি বাজাতে বাজাতে স্টেজে প্রবেশ। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে)ঃ ওই তো দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রাজপ্রাসাদ! যাই, মুরগিটা বাদশাকে উপহার দিয়ে আসি! (এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ বাদশার পাহারাদার এসে তাকে থামায়।)

১ম পাহারাদারঃ এই যে, এই যে তাগড়া জোয়ান ছোকরা! কোথায় চলেছ? বলি, চলেছ কোথায়?

বে-আক্কেলঃ আস্‌সালামু আলাইকুম পাহারাদার সাহেব! চলেছি, মানে আমি ওই রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি! মহামান্য বাদশার সাথে মোলাকাত করব।

১ম পাহারাদারঃ রাজপ্রাসাদে যাচ্ছ? বাদশার সাথে মোলাকাত করবে? তুমি কি মনে কর, তুমি ইচ্ছেমতো সরাসরি হেঁটে রাজপ্রাসাদে চলে যাবে, আর বাদশার সাথে দেখা করবে?

বে-আক্কেলঃ জ্বি, আমি তো তাই মনে করি। কেন না, আমি তো তাই জানি।

১ম পাহারাদারঃ তা, অত বকবক না করে বলেই ফ্যালো কেন তুমি তাঁর সাথে দেখা করতে চাও?

বে-আক্কেলঃ আমি বাদশাকে একটা উপহার দিতে চাই। আর সেজন্যেই–

১ম পাহারাদারঃ (খুব খুশি হয়ে) উপহার? তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা! সে কথা আগে বলো নি কেন? আসলে কী জানো, বাদশার জন্য যে যা-ই উপহার আনে না কেন, তার অর্ধেক পাওনা হয় আমার।

বে-আক্কেলঃ তাই নাকি?

১ম পাহারাদারঃ তা নয়তো কী!

বে-আক্কেল ঃ তা, এ বিষয়ে কোনো লিখিত আইন আছে জনাব?

www.pathagar.com

১ম পাহারাদারঃ তুমি তো দেখছি আচ্ছা ওস্তাদ মিয়া! আমার কথাই তো আইন! যদি অর্ধেক উপহার আমাকে দিতে পার, তবে বাদশার সাথে দেখা করতে পারবে, নইলে নয়।

বে-আক্কেলঃ না, না জনাব, তাই কি কখনো হয়? আপনার কথাই যখন আইন, আপনাকে অর্ধেক উপহার না দেয়া চলে? তা জনাব, (বাক্সটা কাঁধ থেকে নামিয়ে) আমি যদি আগে জানতাম তাহলে এই উপহারটা আনতাম না। অন্য রকম উপহার কিনে আনতাম!

১ম পাহারাদারঃ দেখি, কী উপহার তুমি কিনে এনেছ?

বে-আক্কেলঃ একটা মুরগি। খুব সুন্দর মুরগি! ধবধবে সাদা। সাদার ওপর লাল ফুটিফুটি! (বে-আক্কেল আলী বাক্সের ডালা খুলে দেখায়।)

১ম পাহারাদারঃ ওঃ, চমৎকার মুরগি! অতি সুন্দর মুরগি! আর বেশ মোটা তাজা! একটা খাসির গোশতের মতো আন্দাজ এটার গোশত হবে। ওঃ। খেতে যা মজাদার হবে কিনা! (জিবের পানি টেনে) কিন্তু ---- কিন্তু মুরগিটা তো আর অর্ধেক করা যাবে না! তা, যা হোক, তুমি মুরগিটা নিয়ে শাহানশার কাছে যাও! আমি জানি তিনি এ অদ্ভুত সুন্দর তাজা মুরগিটা পেয়ে খুবই খুশি হবেন, আর সাথে সাথেই তোমাকে অনেক টাকা পয়সা, মণি মুক্তা উপহার দেবেন! (খুশিতে লাফিয়ে উঠে) নিশ্চয়ই দেবেন! তুমি ফেরবার সময় আমাকে তার অর্ধেক দিয়ে যাবে ক্যামন? এই চুক্তি। ঠিক তো?

বে-আক্কেল ঃ ঠিক, ঠিক, ঠিক! এই চুক্তিই ঠিক।

১ম পাহারাদারঃ (নিজের জায়গায় যেতে যেতে) দেখো, বে-আক্কেল মিয়া-

বে-আক্কেলঃ জ্বি, আমার নাম বে-আক্কেল আলী! মিয়া বলবেন না।

১ম পাহারাদারঃ ওই হলো, একই কথা! তা শোনো, মনযোগ দিয়ে শোনো বে-আক্কেল আলী মিয়া, তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমি ওই খানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব! তুমি কিন্তু আমার সাথে চালাকি করতে চেষ্টা করো না! বে-আক্কেল আলীর জায়গায় আক্কেল আলী হতে চেষ্টা করো না, বুঝলে?

বে-আক্কেল ঃ (ঘাড় কাত করে প্রায় মাটির সাথে লাগিয়ে দিয়ে) জ্বি, জ্বি জনাব, মন বলেন, অন্তর বা অন্তঃকরণ, কিংবা হৃদয় –যাই বলেন না কেন, তার ওপর একেবারে সেঁটে লিখে রাখব যে অর্ধেকটা পাহারাদার সাহেবের। (১ম পাহারাদার স্টেজের এক কোণে শাহী পাহারাদারের ভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়াবে)।

বে-আক্কেল আলী ঃ বাঁশি বাজাতে বাজাতে এগোতে থাকবে। স্টেজের পর্দা পড়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের তা উঠে যাবে। এ সময়ে পথের দু পাশের গাছপালা অন্য রকম থাকবে। পর্দা উঠলে দেখা যাবে বে-আক্কেল আলী আগের ভঙ্গিতে কাঁধে মুরগির বাক্স নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এবার সামনে এসে দাঁড়ায় ২য় পাহারাদার)

২য় পাহারাদারঃ থামো! থামো হে তাগড়া জোয়ান ছোকরা! তুমি কি জান, কোথায় তুমি যেতে চাচ্ছ?

বে-আক্কেল আলীঃ জ্বি, তসলিম জনাব পাহারাদার সাহেব! আমি এই উপহারটা নিয়ে শাহানশার কাছে যাচ্ছি।

২য় পাহারাদারঃ কিন্তু তুমি কি মনে করো, যে কেউ ইচ্ছে হলেই শাহানশার সাথে দেখা করতে পারে?

বে-আক্কেল আলীঃ রাজপথের ওই প্রথম পাহারাদার আমাকে প্রাসাদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, কেন না, আমি শাহানশাকে এই এটা উপহার দেবো। (বাক্সটা দেখাবে)

২য় পাহারাদারঃ সে নিশ্চয়ই অনুমতি দিয়েছে গেট দিয়ে ঢুকতে। কিন্তু রাজপ্রসাদের দরজা দিয়ে ঢুকতে হলে আবার আমার অনুমতি লাগবে!

বে-আক্কেল আলীঃ তাহলে অনুমতিটা দিয়ে দিন জনাব!

২য়-পাহারাদারঃ আরে এ তো দেখছি খুব চালাক চতুর, ঝানু আক্কেলয়ালা একজন লোক!

বে-আক্কেলঃ জ্বি-না, আমি একটা বোকা-সোকা, গাধা মানুষ জনাব! মা-বাবা তাই আমার নাম রেখেছেন বে-আক্কেল আলী।

www.pathagar.com

২য় পাহারাদারঃ বে-আক্কেল আলী? তা, বে-আক্কেল আলী, তোমার সাথে সাফসুফ কথা, তুমি বাদশাকে যা দেবে বলে এনেছ, প্রথমে আমাকে তার অর্ধেক দিয়ে যেতে হবে!

বে-আক্কেলঃ (বাক্সের ডালা খুলে) কিন্তু জনাব, আমার উপহার তো এই তরতাজা একটা মুরগি। এটার অর্ধেক আপনাকে দিয়ে, বাকিটা শাহানশার কাছে নিয়ে গেলে, সেটা কি ভাল দেখাবে? আপনিই বলুন, ভাল দেখাবে?

২য় পাহারাদারঃ (থুতনিতে হাত ঘষে, আক্ষেপসূচক শব্দ করে) নাঃ! অর্ধেক মুরগি শাহানশাকে উপহার দেয়াটা ভাল দেখাবে না। (হঠাৎ ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে) তা ছাড়া, তা ছাড়া বাদশা নামদার তোমাকে জিজ্ঞেসই করে ফেলবেন, বাকি অর্ধেকটা মুরগি তুমি কাকে দিয়েছ? (স্বগতোক্তি) এই সেরেছে, তাহলেই গেছি! (সরবে) যা হোক, তুমি আস্ত মুরগিটা নিয়েই প্রাসাদে ঢোকো এবং গোটা মুরগিটাই বাদশাকে উপহার দিয়ে দাও! আমি ঠিক জানি, বাদশা বদলায় তোমাকে টাকা-পয়সা বা দামি অনেক কিছু অবশ্যই দেবেন!

বে-আক্কেলঃ (মাথা নুইয়ে) জ্বি, জ্বি, দেবেন, দেবেন! নিশ্চয়ই দেবেন! হাজার হলেও পাহারাদার থুরি! ভুলে গেছি, আপনার মতো একজন হবু রাজা-বাদশার কথা তো!

২য় পাহারাদারঃ না, না, থুরি বলছ কেন? বলা তো যায় না, এভাবে টাকা-পয়সা মণি-মুক্তা, হীরে জহরত জমাতে জমাতে আমিও একদিন রাজা-বাদশা হয়ে যেতে পারি!

বে-আক্কেলঃ (রঙ্গ করে) তা জনাব, ভবিষ্যতের শাহানশা বাহাদুর! আপনি এই ভাবে টাকা রোজগার করে এককালে বাদশা হতে চান? তাহলে তো কারাগারের সবাই এক একজন বড় বাদশা হয়ে যেত!

২য় পাহারাদারঃ আরে, এ তো দেখছি বে-আক্কেল টে-আক্কেল কিছুই না! এ একটা শেয়ালের চেয়েও বেশি চালাক আর ধূর্ত!

বে-আক্কেলঃ না, না জনাব, আমার সাথে শেয়ালের তুলনা করে বুদ্ধিমান ওই প্রাণীটাকে ছোট করবেন না! কাণাঘুষায় এই কথা ওরা জানতে পারলে, অপমানে ওরা আর চুরি করতে যাবে না। ফলে আপনাদেরই ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে!

২য় পাহারাদারঃ আমাদের ক্ষতি? কী রকম? ক্ষতিটা কী রকম?

বে-আক্কেলঃ শেয়ালরা যদি মুরগি চুরি না করে, তবে মুরগিওয়ালারা লাফিয়ে লাফিয়ে টাকার পাহাড়ে উঠে যাবে!

২য় পাহারাদারঃ তার মানে? মানেটা কী হলো?

বে-আক্কেল আলীঃ মানেটা তো খুবই সোজা! শেয়ালরা মুরগি নেবে না। তাতে মুরগিওয়ালাদের মুরগি সব বেঁচে যাবে। মুরগিরা ডিম পাড়বে, সেই সব ডিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে, হাজার হাজার মুরগি বের হবে। মুরগি আর ডিম! ডিম আর মুরগি! বিক্রি করে মুরগিওয়ালারা বিরাট বড়লোক হয়ে যাবে! বড়লোক হয়ে তারাই তখন এই আপনাদের এখনকার মতো অনেক মুরগিওয়ালাকে ভাল বেতনে পাহারাদার রাখবে। মুরগিওয়ালারা পাহারাদার হলে আপনাদের সম্মান হানি হবে না?

২য় পাহারাদারঃ কী আজেবাজে বকছো ! মুখে যা-ই আসছে তা-ই বলে যাচ্ছ? জানো? এ ধরনের কথা বললে তোমাকে বাদশার সাথে দেখাই করতে দেবো না!

বে-আক্কেল (ফিরে যেতে উদ্যত হয়ে)ঃ তাহলে চলি পাহারাদার সাহেব! বাদশার সাথে যখন দেখাই করতে দেবেন না, তবে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী? যাই, বাজারে গিয়ে মুরগিটা চড়া দামে বিক্রি করে পকেট ভরতি টাকা নিয়ে ঘরে ফিরি ! কাউকে ভাগ দিতে হবে না!

www.pathagar.com

২য় পাহারাদারঃ (পথ রোধ করে) সে কী কথা! তুম ফিরে যাবে কী গো? তোমার মতো লোককে যে কিনা এমন চমৎকার মুরগিটা উপহার নিয়ে এসেছে, তাকে বাদশার সাথে দেখা করতে দেবো না, এটা কি কখনো হতে পারে? ও তো আমি তোমার সাথে রঙ্গ করে বলেছিলাম!

(কাছে এসে চাটুকারের ভঙ্গিতে) জানেন আক্কেল আলী সাহেব, আমাদের বাদশা না সব রকম খাবারের মধ্যে তেলতেলে সুন্দর মুরগি খেতে পছন্দ করেন সবচেয়ে বেশি! আরো পছন্দ করে খাবেন জেনে যে মুরগিটা ছিল এক অত্যন্ত আক্কেলওয়ালা লোকের!

বে-আক্কেল আলীঃ কী আক্কেলওয়ালা, আক্কেল আলী বলছেন আমাকে! আমার নাম বে-আক্কেল আলী। নাম বিকৃত করা আমি মোটেই পছন্দ করি না!

২য় পাহারাদারঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে! আমাকে মাফ করবেন, বে-আক্কেল আলী সাহেব! আপনি এবার দয়া করে বাদশার প্রাসাদে প্রবেশ করে আমার মতো সামান্য একজন পাহারাদারকে ধন্য করুন! তবে ধন্য করতে গিয়ে আপনার সাথে আমার প্রথমে যে শর্ত হয়েছে, সেটা কিন্তু ভুলবেন না জনাব! মনে আছে তো শর্তটা? বাদশা যে টাকা কড়ি আপনাকে দেবেন, তার অর্ধেক আপনার, আর বাকি অর্ধেকটা আমার।

বে-আক্কেল ঃ জ্বি পাহারাদার সাহেব, মনে না রেখে কি আমি পার পাবো? (২য় পাহারাদার চলে যায়। বে-আক্কেল আলীর স্বগতোক্তি)

ঃ যা পাবো, অর্ধেক নেবে এক নম্বর পাহারাদার, আর বাকি অর্ধেক নেবে দুই নম্বর পাহারাদার। তাহলে আমার জন্যে কী থাকবে? অ্যাঁ? আমার জন্যে থাকবেটা কী?

www.pathagar.com

৩য় দৃশ্য

(রাজ-দরবার। বাদশার সিংহাসন শূন্য। দু পাশের আসন গুলোতে উজির, নাজির, কোটাল ও সভাসদগণ বসে আছেন। পাশে পাত্র মিত্র ও প্রজাদের সাথে দুইজন পাহারাদারের মধ্যে বে-আক্কেল আলী দাঁড়িয়ে আছে। নেপথ্যে নকিবের উচ্চকণ্ঠ শোনা যাবে।

ঃ আমাদের মহা সম্মানিত বাদশা, শাহানশা তকলিফ নিয়ে রাজ-দরবারে তশরীফ রাখছেন! মহান আল্লাহতায়ালা তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুন! মহা মান্যবর শাহান-শা!

(রাজকীয় পোশাক পরিধান করে শাহানশার প্রবেশ। সভাস্থ সকলের দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন। বাদশা সিংহাসনে উপবেশন করে, মৃদু হেসে সবাইকে হাত দিয়ে ইশারা করে বসতে বলেন। সবাই বসলে, একজন অমাত্য উঠে এসে শাহানশাকে কুর্নিশ করে সভাসদ ও অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে)

ঃ উপস্থিত সকল উজির, নাজির, কোটাল, পাত্র-মিত্র, অমাত্য, সভাসদ ও সকল শ্রেণীর প্রজাবর্গ! আমাদের মহানুভব পরম দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ শাহানশা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা জানেন, প্রতি মাসের পয়লা তারিখে তিনি সবার সামনে এসে তাদের নালিশ, আবেদন নিবেদন, অভাব-অভিযোগ সব শোনেন, বিচার করেন এবং রায় দেন! আপনাদের মধ্যে যারা আজ ফরিয়াদি, আবেদনকারী, অনুরোধকারী বা উপঢৌকন প্রদানকারীরূপে উপস্থিত হয়েছেন, আসুন, নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন! এসে যার যা বলবার অকপটে তা বাদশার কাছে বলুন! যার যা উপহার দেবার, প্রদান করুন!

www.pathagar.com

ঘোষণাকারীঃ (সভা নীরব)! আপনাদের মধ্যে কারো কি কিছু বলবার, চাইবার বা দেবার আছে?

১ম পাহারাদারঃ (বাদশার দিকে বে-আক্কেল আলীকে ঠেলে দিয়ে চাপা কণ্ঠে) যাও! মুরগিটা দাও! আর দুই থলে ভরতি মোহর চাও!

২য় পাহারাদারঃ (বে-আক্কেল আলীকে আরো একটু ঠেলে দিয়ে নিচু স্বরে) এ্যাই, যাওনা! মুরগিটা দিয়ে এক শ তোলা সোনা চাও না!

(উজির, নাজির, ঘোষক-সভাস্থ সকলেই ঔৎসৌক্যের সাথে বে-আক্কেল আলী ও পাহারাদার দু জনকে লক্ষ্য করেন।)

একজন অমাত্যঃ বালক, তুমি কি মহামান্য বাদশার সাথে কোনো কথা বলতে চাও?

১ম পাহারাদারঃ (খুব আগ্রহের সাথে) জ্বি হুজুর, ও কথা বলতে চায়!

২য় পাহারাদারঃ (তেমনি আগ্রহে) কথা বলবার জন্যই আমরা ওকে হুজুর রাজপ্রাসাদে ঢুকতে অনুমতি দিয়েছি।

অমাত্য (নরম স্বরে)ঃ তুমি কী কথা বলতে চাও বালক? বলো!

বে-আক্কেল আলীঃ জ্বি জনাব, আমি মহামান্য শাহানশাকে একটি উপহার দিতে চাই! এই বাক্সে সেটি আছে। তিনি দয়া করে এই উপহারটি গ্রহণ করলে আমি খুবই বাধিত হবো। (বে-আক্কেল আলী বাক্সটার ডালা খুলবে। অমাত্য সেটা দেখে খুবই উচ্ছ্বসিত হবেন)।

অমাত্যঃ অদ্ভুত সুন্দর একটি মুরগি! শাহানশাকে দেবার মতো খুবই উপযুক্ত একটি উপহার! (বাদশাও বাক্সটার দিকে ঝুঁকে দেখেন। দেখে বলেন)ঃ বাঃ! চমৎকার মুরগিটাতো! বহু বছর এমন সুন্দর মুরগি

www.pathagar.com

আমার জন্য কেউ আনে নি! এমনটিই আমি চাচ্ছিলাম! আজ দুপুরে পাশের রাজ্যের আমার বন্ধু-বাদশা আমার মেহমান হচ্ছেন। ঠিক সময়েই এই চমৎকার মুরগিটা পাওয়া গেল!

(অমাত্যের দিকে তাকিয়ে) আপনি এটি এখনই আমার খাস বাবুর্চির কাছে পাঠিয়ে দিন! আজ দুপুরে মেহমানের সামনে সুস্বাদু ও মজার করে রান্নার পর যেন পরিবশেন করা হয়।

অমাত্যঃ জ্বি শাহানশা! আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি। (একজন এসে বাক্সটি নিয়ে ভেতরে চলে যায়।)

অমাত্য (উচ্চৈঃস্বরে)ঃ আর কারো কিছু দেয়ার বা বলবার আছে কি? (সভা নীরব)।

অমাত্যঃ যদি কারো কিছু বলবার না থাকে, তবে আপনারা আর কষ্ট করে অপেক্ষা করবেন না। মহামান্য শাহানশার আন্তরিক দোয়া নিয়ে ঘরে ফিরে যান! (উজির, নাজির, কোটাল, অমাত্য সভাসদ, দুইজন পাহারাদার ও বে-আক্কেল আলী ছাড়া অন্যান্য সকলের প্রস্থান।)

শাহানশাঃ (বে-আক্কেল আলীর প্রতি) ওহে সুবোধ বালক, তোমার এই সুন্দর উপহার পেয়ে আমি সত্যই প্রীত হয়েছি! তোমাকে আমি খুশি হয়ে কিছু দিতে চাই। নিঃসংকোচে বলো, কী পেলে তুমি খুশি হবে?

(বে-আক্কেল আলী তখন নতজানু হয়ে বসে আছে। তার দু দিকের দুই পাহারাদারদের দিকে এক নজর তাকিয়ে তারপর বাদশার দিকে ফিরে)

ঃ সম্মানিত মহান শাহানশা, আমি যা চাই, তা বলতে আমার খুবই সংকোচ বোধ হচ্ছে!

বাদশাঃ সংকোচের কী আছে বালক? বলো, বলো, তোমার বয়সী বালকেরা তো প্রচুর টাকা পয়সা পেলেই খুশি হয়।

www.pathagar.com

(দুই পাহারাদারের বত্রিশপাটি দাঁত বের হয়ে পড়ে। খুশিতে তারা মাথা দোলাতে থাকে।)

বে-আক্কেলঃ (বিনীতভাবে) মহানুভব শাহানশা! আমি টাকা পয়সা, মণি-মানিক, রত্ন, মোহর কিছুই চাই না!

(পাহারাদার দু জনের ক্রোধের মুখভঙ্গি।)

বাদশাঃ (অত্যাধিক বিস্ময়ে) কী বলছ তুমি বালক! আমি জীবনে এই প্রথম শুনলাম যে, কেউ বাদশার কাছ থেকে প্রচুর ধন-রত্ন পেয়েও কিছুই সে নিতে চায় না! তুমি কি সত্যি সত্যিই ওসব নিতে চাচ্ছ না?

বে-আক্কেলঃ সত্যি বলছি বাদশা নামদার, সত্যি আমি এসব চাইনা। আমি চাই –

বাদশাঃ হ্যাঁ, বলো, বলো! তুমি কী চাও!

বে-আক্কেল ঃ আমি চাই, আপনি একটা খুব শক্ত উত্তম-মধ্যম অর্থাৎ আচ্ছাসে একটা পিটুনির ব্যবস্থা করেন!

(সভায় যারা তখন উপস্থিত ছিল, তাদের সকলেরই চোখ অত্যধিক বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়। তাদের মধ্যে অবিশ্বাসের মৃদু গুঞ্জন ওঠে। তারা সবাই এই অবিশ্বাস্য চাহিদার ব্যাপারটা নিয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলে। (১ম পাহারাদারের ভঙ্গিতে বোঝা যাবে যে সে ছেলেটাকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে ভাবছে। ভেবে সে সভাস্থ সবার দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে। ২য় পাহারাদার সভাসদদের চোখে যেন না পড়ে সেইভাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বে-আক্কেল আলীকে ঘুষি দেখাচ্ছে ও লাঠি তুলে দেখাচ্ছে)।

বাদশা (খুবই অবাক হয়ে)ঃ আমি কি নিজের কানে এই বালকের স্বর শুনছি? বালক, সত্যিই কি তুমি শুধু একটা উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা চাচ্ছ?

www.pathagar.com

বে-আক্কেলঃ জ্বি শাহানশা! আমি সত্যি সত্যিই একটা শক্ত ধরনের উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছি!

বাদশাঃ ওহে ভদ্র বালক, এ তোমার এক অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত অনুরোধ! আমি তোমার এ ধরনের অনুরোধ–

বে-আক্কেল আলীঃ না, না, দোহাই হুজুর! আমার এ অনুরোধ আপনি বাতিল করে দেবেন না!

বাদশাঃ বাতিল করে দেবো না! তবে সত্যই বেদম প্রহারই চাও?

বে-আক্কেলঃ জ্বি জাহাপনা, বেদম প্রহার ! খুব শক্ত রকমের প্রহারের ব্যবস্থা আপনি করুন! তাই আমি চাই।

বাদশাঃ ঠিক আছে! তুমি যখন এই অদ্ভুত উপহারের জন্য কাকুতি-মিনতি করছ, কী আর করি? তোমার জন্য আমি সেরকম ব্যবস্থাই করছি!

(অমাত্যের দিকে ফিরে) আপনি তাহলে রাজ-লাঠিয়ালকে ডাকুন! অমাত্য (উচ্চৈঃস্বরে)ঃ রাজ-লাঠিয়াল!

(একজন বেশ মোটা তাগড়া-লাঠিয়াল একটা শক্ত লাঠি হাতে স্টেজে ঢুকবে।

তার পরনে কালো পাজামা ও গায়ে লাল ফতুয়া। ঝাঁকড়া চুলে লাল পট্টি বাঁধা। গলায় বড় এক মাদুলি)

বাদশা (লাঠিয়ালের প্রতি)ঃ এই বালককে তুমি শাস্তিঘরে নিয়ে যাও! নিয়ে শক্ত করে কয়েক ঘা লাগিয়ে বিদায় কর, যাও!

(লাঠিয়াল বে-আক্কেল আলীকে ধরে নিতে এগিয়ে আসে। বে-আক্কেল আলী তাকে অবজ্ঞা ভরে ঠেলে দিতে দিতে বাদশার দিকে তাকিয়ে)

ঃ হুজুর, শাহানশা, বাদশা! এই ব্যাপারে আমার একটা ছোট্ট নিবেদন আছে জাঁহাপনা!

বাদশা (বিরক্তির সাথে)ঃ লাঠিয়াল, একটু থামো তো!

(লাঠিয়াল একটু সরে দাঁড়ায়। বে-আক্কেল আলী বাদশার সামনে এসে নতজানু হয়)।

বাদশা (অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে)। দেখ ছোকরা, এটা রাজ-দরবার! রঙ্গ-তামাশা করবার জায়গা নয়! তোমার মতো একটা ফচকে ছোকরার সাথে নষ্ট করবার মতো-সময় আমার নেই, বুঝলে? তা বলো, তাড়াতাড়ি বলো, তুমি কি তোমার মত বদলেছ? বদলে এখন কী চাচ্ছ তুমি ?

বে-আক্কেল আলীঃ জ্বি না জাঁহাপনা! আমি আমার মত একটুও বদলাই নি। উপহারের ব্যাপারে আমি আমার আগের চাওয়া উপহারটাই চাই!

বাদশা ঃ তাহলে আর ভড়ং করার কী প্রয়োজন?

বে-আক্কেল (খুব নরম স্বরে) ঃ উপহারটা আমি নিজের জন্য চাই না জাহাপনা!

বাদশা (রাগত স্বরে)ঃ আবারও ফচকামো!

বে-আক্কেল আলী (জিব কেটে, অত্যধিক নুয়ে কুর্নিশ করে)ঃ তওবা! তওবা! মহামান্য শাহনশা বাদশা! আপনার সাথে এত বড় বেয়াদবি করবে এই আমার মতো এক অধম বান্দা, এ কি কখনো হতে পারে? এ হলে, আপনি অবশ্যই আমার এ গর্দানটা কেটে নেবেন! অনুমতি যখন দিয়েছেন, তা হলে শুনুন জাঁহাপনা।

বাদশা (নরম হয়ে)ঃ বলো, সব খুলে বলো! সব না শুনে আমি বিচার করতে পারছি না!

www.pathagar.com

বে-আক্কেল আলীঃ জাঁহাপনা আপনাকে সামান্য একটা উপহার দিয়ে আপনার অনুগ্রহের দানটা আমারই পাওনা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাঁহাপনা, সেটা নিজে গ্রহণ করার মতো সৌভাগ্য আমার হলো না।

বাদশাঃ কেন? হেঁয়ালিপনা না করে স্পষ্ট করে বলো!

বে-আক্কেলঃ জ্বি, বলছি জাঁহাপনা! আপনার সাথে দেখা করবার আগে রাজপ্রাসাদের ও রাজদরবারের দুই ফটকের পাহারাদারদের কাছে আমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে, যা কিছু আপনি আমাকে দেবেন, তাদের দু জনকে তা অর্ধেক অর্ধেক করে দিয়ে দিতে হবে। তা না হলে তারা আমাকে এখানে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না ! জাঁহাপনা ! আধা আধি করে তাদের দু জনকে সবটা দিয়ে দেবার শর্ত করে তবে আমি এখানে ঢুকতে পেরেছি। অথচ জাঁহাপনা, আমি জানতাম, আজকের দিনে আপনার সাথে যে কেউ দেখা করতে চায়, কারো সাথে কোনো রকম শর্ত বা চুক্তি না করেই সে দেখা করতে পারে।

বাদশা (সব বুঝতে পেরে)ঃ অ বুঝেছি! এই তাহলে আসল ঘটনা? (পাহারাদারদের দিকে তাকাতেই তারা থরথর করে কাঁপতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতেই ওরা বে-আক্কেল আলীর দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।)

বে-আক্কেলঃ তাহলে জাঁহাপনা, আপনার দেয়া আমার পাওনাটা আর আমার থাকে না। এদের—এই দু জন পাহারাদারকে সমানভাবে ভাগ করে তা দিতেই হবে! কেন না আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

বাদশা (মৃদু হেসে) হ্যাঁ বালক, আমার কাছে এবার সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার! (লাঠিয়ালের দিকে ফিরে) এই যে লেঠেল! যাও, এই দু টাকে ধরে নিয়ে যাও! গিয়ে ওদের পাওনা সমান সমান বুঝিয়ে দাও! (লাঠিয়াল ও তার সাথে অন্য দু জন এসে পাহারাদারদের ঠেলে বাইরে নিয়ে যেতে থাকে। দরবারে একটা হাসির রোল ওঠে।)

www.pathagar.com

বাদশাঃ আজ সভা ভঙ্গ! রাজরক্ষী দু জন ছাড়া আপনারা সবাই যে যার বাড়ি চলে যেতে পারেন ! আমি এই বালকের সাথে দু চারটে কথা বলব। (দু জন রাজরক্ষী ছাড়া সকলের প্রস্থান। বে-আক্কেল আলী তখনো নত মুখে দাঁড়িয়ে।)

বাদশা (বে-আক্কেল আলীর কাছে এসে)ঃ তোমার নাম কী বালক?

বে-আক্কেলঃ জ্বি, আমার নাম বে-আক্কেল আলী জাঁহাপনা!

বাদশাঃ বে-আক্কেল ? এটা কি তোমার আসল নাম? কে তোমার এ নাম রেখেছে?

ব-আক্কেলঃ জ্বি, জাঁহাপনা, আমার আসল নাম ছিল আক্কেল আলী। আব্বা আম্মাই প্রথমে আমার এ নাম রেখেছিলেন। পরে তাঁরাই আবার ওই নামের আগে একটা বে যোগ করে ডাকতে শুরু করলেন বে-আক্কেল আলী।

বাদশাঃ কেন? কেন? তাঁরা তোমাকে বুদ্ধিমান নাম দিয়ে পরে আবার বোকা বলে ডাকতে শুরু করলেন কেন? তুমি কি খুব বেশি রকমের কোনো বোকামো করে ফেলেছিলে?

বে-আক্কেল আলীঃ জ্বি না জাঁহাপনা, আমি কোনো রকম বোকামো আগে বা পরে কোনো সময়ই করি নি।

বাদশাঃ তাহলে?

বে-আক্কেল ঃ আসলে হয়েছে কী জাঁহাপনা, আমার নামের পেছনে একটা কিস্‌সা আছে। যদি অনুমতি দেন তো বলি!

বাদশাঃ নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই! তোমাকে কিছু বলতে দেবার জন্যই তো আমি দরবারে রয়ে গেছি!

বে-আক্কেলঃ কিসসাটা হলো জাঁহাপনা, আমার আব্বা ও আম্মা আমার প্রথম বড় দুই ভাইয়ের চমৎকার দুটো আরবি নাম রেখেছিলেন- আলীম ও আল্লাম। নাম দুটোর মানে তো আপনি ভাল করেই জানেন! আলীম হলোগ্যে মহাজ্ঞানী ও আল্লামের মানে হলো বিজ্ঞ। আব্বা-আম্মা লেখাপড়া জানতেন না। তাঁদের দুই ছেলে বিদ্বান হবে, জ্ঞানী হবে, এই ভেবে তাঁরা তাদের ওই দুটো নাম রেখেছিলেন। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা, পাঁচ-ছ বছর বয়সের সময় ওরা দু জনেই গুলাওঠা রোগে মারা যায়! বাদশা (আক্ষেপসূচক শব্দ করে)ঃ আহারে!

বে-আক্কেল ঃ এরপর আমরা পর পর আরো তিন ভাই জন্মগ্রহণ করি। আকিকার সময় মওলানা সাহেবরা আমাদের তিন ভাইয়ের নাম ঠিক করে দিয়েছিলেন- সুলতান আলী, মালেক আলী ও আক্কেল আলী! কিন্তু আমাদের আব্বা-আম্মা তিনটি নামই বদলে দিলেন। রাখলেন, মিসকিন আলী, ফকির আলী এবং আমার নামের সামনে একটা বে বসিয়ে নামকরণ করলেন বে-আক্কেল আলী। তাঁরা বললেন, আমাদের চাষাভূষা ও অশিক্ষিতদের ঘরে ওসব শাহী নাম মানায় না, পোষায়ও না! এই হলো জাঁহাপনা, আমার ও আমার ভাইদের নামের কিসসা-কাহিনী।

বাদশাঃ সব শুনলাম আক্কেল আলী! সব শুনলাম ও তোমাকেও বুঝলাম।

বে-আক্কেলঃ (ভয়ে ভয়ে) আমার বেয়াদবি মাফ করবেন। আপনি আমাকে কী বুঝলেন জাঁহাপনা? আমি কোনো অন্যায় করেছি ? সেজন্যে আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন?

বাদশা (কপট গাম্ভীর্যে) নিশ্চয়ই দেবো!

www.pathagar.com

বে-আক্কেল (ভীত ও বিনীত স্বরে) ঃ কী শাস্তি জাঁহাপনা? আমি তা মাথা পেতে নেবো!

বাদশা (কৌতুকের স্বরে)ঃ তাহলে তুমি আমার পাশে এই কুরসিটাতে এসে বসো!

বে-আক্কেল (স্বগতোক্তি)ঃ কী আশ্চর্য! এই কুরসিটা তো বাদশার প্রধান পরামর্শদাতার! (অভিনয় করে সরবে)

ঃ তা জাঁহাপনা, ওই চেয়ারটা কেমন আমি কি একটু দেখে নিতে পারি? ওরকম শাহী চেয়ারে কোনোদিন বসি নি কি না!

বাদশাঃ অবশ্যই দেখতে পারো!

বে-আক্কেলঃ বসব জাঁহাপনা! আপনি যখন আদেশ করেছেন, তখন নিশ্চয়ই বসব! তবে একটা অনুরোধ–

বাদশাঃ আবারও কী অনুরোধ?

বে-আক্কেলঃ ওই চেয়ারে আমাকে একবার বসালে, আর উঠে যেতে আদেশ করবেন না দয়া করে!

বাদশা (হাসতে হাসতে)ঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে! পাকাপোক্ত কথাটা আমার নিজের মুখ থেকে বের করে নিচ্ছ হে আক্কেলয়ালা বালক!

বে-আক্কেল আলী এসে চেয়ারে বসে। বাদশাহ দেহরীক্ষকে চুপি চুপি কী যেন বলেন।

ফেরে একজন অমাত্য ও একজন নকিবকে সাথে নিয়ে। অমাত্যের হাতে জরি ও মুক্তাখচিত একটা সুন্দর পাগড়ি। বাদশা সেটা নিজের হাতে তুলে নেন। বাইরে একটা ঘন্টাধ্বনি হতে থাকে। দরবারগৃহ উজির, নাজির, অমাত্য, পরিষদ ও গণ্যমান্য লোকে ভরে যায়। বাদশা পাগড়িটা বে-আক্কেল আলীর মাথায় পরিয়ে দেন। বলেন,

www.pathagar.com

ঃ আজ থেকে তুমি আমার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বহাল হলে আক্কেল আলী!

বে-আক্কেল (অত্যন্ত বিনীতভাবে কুর্নিশ করে)ঃ আমি আপনার দেয়া এ পদ মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। কিন্তু জাঁহাপনা, আমার নাম –

বাদশা (হেসে)ঃ হ্যাঁ তোমার আসল নামটাই এখন থেকে চালু হবে জনাব আক্কেল আলী!

উপস্থিত সমবেত সকলে (উচ্চৈঃস্বরে)ঃ মহান শাহানশা জিন্দাবাদ! জনাব আক্কেল আলী জিন্দাবাদ!

প্রধান উজির (দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে)ঃ (দুইবার) রাজ্য থেকে ঠগ আর দুষ্টলোক নিপাত যাক!

সকলে সমবেত ভাবে (উচ্চৈঃস্বরে) নিপাত যাক! নিপাত যাক!

প্রধান উজির (উচ্চৈঃস্বরে)ঃ সবার মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হোক! জাগ্রত হোক! সৎলোকেরা দেশে থাকবে! সৎবুদ্ধির জয় হবে!

সকলে সমবেত ভাবে উচ্চৈঃস্বরেঃ সৎলোকেরা দেশে থাকবে, সৎবুদ্ধির জয় হবে ! (দুইবার)।

॥ যবনিকা পতন॥

www.pathagar.com

নবী মূসা (আ) (জীবনী)

হেলেনা খান

প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
প্রকাশক : মো: আবদুর রব
প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

১৮৯

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার স্বামী মরহুম ডাঃ এ,
আর খান স্মরণে - হেলেনা খান

www.pathagar.com

নবী মূসা (আ) এর বংশ পরিচয়

আজ থেকে আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার বছর আগের কথা। মিসরে বনী ইসরাইল বংশে মূসা (আ) এর জন্ম হয়। তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন নবী ইয়াকুব (আ) ও পিতামহ ছিলেন নবী ইউসুফ (আ)। তাঁর পিতার নাম ইমরান ও মাতার নাম ছিল ইউহানিব যিনি ইউখাবিজ ও বারেখা নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর বড় ভাই হারুন ও বড় বোন ছিলেন মরিয়ম।

নবী ইয়াকুব (আ) এর বারোজন পুত্রের মধ্যে নবী ইউসুফ (আ) ছিলেন অন্যতম। নবী ইউসুফ (আ) তাঁর পিতামাতা ও অন্যান্য ভাইদের নিয়ে নিজের মাতৃভূমি সিরিয়ার নিকটবর্তী কেনান থেকে মিসরে এসে, সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেছিলেন।

নবী ইয়াকুব (আ) এর অন্য নাম ছিল ইসরাইল। তাঁর সন্তান- সন্তাতিগণই বনী ইসরাইল নামে পরিচিত।

নবী ইউসুফ (আ) মিসরের প্রধানমন্ত্রীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন । তাঁর জীবিত অবস্থায় বনী ইসরাইলরা মিসরে সম্মানসহ শান্তিতেই বসবাস করছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই তাদের ভাগ্য অশান্তির কালো ছায়া নেমে আসে। মিসরের ফিরাউন সম্রাটগণ বনী ইসরাইলদের দাসরূপে গণ্য করতে শুরু করে। তারা তাদের অত্যন্ত হেয় ও নীচ জ্ঞান করে তাদের বিনা পারিশ্রমিকে অত্যধিক পরিশ্রম করাতো।

ফিরাউনের লোকেরা মিসরের তৎকালীন রাজধানীসহ বড় বড় শহরের অধিবাসী ছিল। আর ওদিকে রাজধানী থেকে দু মাইল দূরে আমসীস নামক স্থানে বস্তিতে বসবাস করতে হতো বনী ইসরাইলদের। তৎকালীন কিবতী বংশীয় ফিরাউন দ্বিতীয় রামসিস বনী ইসরাইলদের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত করে তুলছিল।

এই ফিরাউনের রাজত্বকালেই নবী মূসা (আ) এর জন্ম।

ফিরাউন দ্বিতীয় রামসিসের পরিচিতি

"ফিরাউন দ্বিতীয় রামসিসের জন্ম মিসরের কিবতী সম্প্রদায়ের এক ধনী কৃষক পরিবারে। তার বাল্য নাম ছিল কাবুস । কাবুস বাল্যকাল থেকেই ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত, বেপরোয়া ও নিষ্ঠুর! পিতামাতা তাকে সংশোধনের যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সব প্রচেষ্টা বিফলে যায়।

ইতোমধ্যে বনী ইসরাইল বংশের অত্যন্ত সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা আছিয়া (রা) এর সাথে যুবক কাবুসের বিয়ে সম্পন্ন হয়। আছিয় (রা) এর পিতা মোজাহাম ছিলেন নবী ইয়াকুব (আ) এর বংশধর, একজন শিক্ষিত, জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি প্রখর বুদ্ধিমতী বালিকা আছিয়াকে শিক্ষক রেখে বিদ্যা ও ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রীকে মর্যাদা দেবার মতো পাপাচারী ও দুষ্কৃতিকারী কাবুসের মন-মাসিকতা ছিল না।

ঘরে পিতামাতার শাসন ছিল। একদিন সে ঘর ছেড়ে বন্ধু হামানকে সাথে নিয়ে রাজধানীতে গিয়ে হাজির হলো।

www.pathagar.com

অনেক চেষ্টা করে সে মিসরের সম্রাট ফিরাউনের অধীনে অতি সাধারণ একটি চাকরি পায়। এরপর চতুর কাবুস মিসরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে উপঢৌকন দিয়ে খুশি করে প্রধান নগররক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হয়। ক্রমে ক্রমে ধূর্ত কাবুস নিজের কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করে ফিরাউনের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। এ সময়ে হঠাৎ মিসরের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফিরাউন তখন কাবুসকে ডেকে পাঠায় এবং এই দুর্যোগের সময় তাকে প্রধানমন্ত্রীত্বের ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করে।

প্রধানমন্ত্রী হয়ে কাবুসের আরও বুদ্ধি বেড়ে যায় । সে প্রজাদের সুখ-সুবিধার দিকে মনোযোগ দিয়ে অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । বৃদ্ধ ফিরাউন তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এরপর সম্রাট ফিরাউনের মৃত্যু হলে কাবুস দ্বিতীয় রামসিস নাম গ্রহণ করে মিসরের সিংহাসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করে। প্রজারা আগে থেকেই তার অনুগত ও বাধ্য ছিল ।

সিংহাসনে বসেই নতুন ফিরাউন তার বন্ধু হামানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে।

প্রথম থেকেই দ্বিতীয় রামসিস বনী ইসরাইলদের সুনজরে দেখত না। কেননা কেনান থেকে মিসরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

নতুন ফিরাউন তরে মনোনীত প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে বনী ইসরাইলদের কাছে থেকে অতিরিক্ত কর আদায়ের জন্যে একটি আইন জারি করে। ক্রমে ক্রমে সে বনী ইসরাইলদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট করে শেষ পর্যায়ে তাদের দাস শ্রেণীতে পরিণত করে। নিজেকে সে তাদের উপাস্য বলে দাবি করে ।

"সে মিসরে পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে উহাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল। তাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করত ও নারীগণকে জীবিত থাকতে দিত। সে ছিল একজন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী!"

(সূরা আল্-ক্বাসাস : ৪)

ফিরাউন পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কাবুস স্ত্রী আছিয়া (রা) এর কোনো খোঁজ খবর নেয় নি। এখন নানান কারণ বিবেচনা করে সে তাঁকে রাজপ্রাসাদের তুলে নিয়ে যায়।

এক আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী পুণ্যবতী আছিয়া (রা) স্বামীর দুর্নীতি-পরায়ণতা, নিষ্ঠুরতা, বিশেষ করে নিজেকে উপাস্য বলে দাবি করায় অত্যন্ত মর্মাহত ও বিষণ্ন হয়েছিলেন; কিন্তু কোনো রকম উচ্চবাচ্য করার উপায় ছিল না। প্রাণের ভয়ে তিনি অতি সংগোপনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করে যেতেন। " (ক্বোরানের কাহিনী)

মূসা (আ) এর জন্ম ও তাঁর প্রতিপালন

বিখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, একদিন ফিরাউন স্বপ্ন দেখল যে, জেরুযালেম থেকে একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ছিটকে এসে তার ও তার সম্প্রদায়ের সুরম্য অট্টালিকাগুলো পুড়ে ছাই কারে ফেলেছে! অন্যদিকে বনী ইসরাইলদের তা সাধারণ বস্তিগুলোতে একটুও স্পর্শ করে নি।

www.pathagar.com

অত্যন্ত ভীত হয়ে ফিরাউন ঘটনাটি রাজ্যের পুরোহিত ও জ্যোতিষীদের কাছে খুলে বলল। তারা স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে জানালো যে, শীঘ্রই বনী ইসরাইল বংশে এমন এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ফিরাউনের পতন ঘটাবে!

ফিরাউন অত্যধিক ক্রুদ্ধ হয়ে সাথে সাথেই রাজ্যে হুকুম জারি করে, এখন থেকে বনী ইসরাইল বংশে যে সমস্ত পুত্রসন্তান জন্ম নেবে, সেই মুহূর্তেই তাকে হত্যা করা হবে। এই হুকুম জারির পর থেকে ফিরাউনের লোকেরা বণী ইসরাইলদের নবজাত শিশু পুত্রদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে থাকে।

এ সময়ে রাজাদরবারের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ফিরাউনকে বললেন, এভাবে বনী ইসরাইলদের সব শিশুপুত্রকে বধ করে ফেললে ভবিষ্যতে তার অধীনে কাজ করার মতো দাস শ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তার চেয়ে একটা ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। তা হলো প্রতি বছর না করে, একেক বছর অন্তর বনী ইসরাইলদের শিশুপুত্রদের বধ করা হোক!

ফিরাউন বিজ্ঞজনদের এই পরামর্শ মেনে নেয়। যে বছর শিশুপুত্রদের বধ করার কথা, সে বছরেই বনী ইসরাইল বংশে পিতা ইমরান ও মাতা ইউখাবিজের গৃহে মূসা (আ) এর জন্ম হয় । মা নবজাত শিশুকে বুকে আঁকড়ে ধরে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ! তুমি এই শিশুকে রক্ষা কর! তুমি ছাড়া আর কেউ একে বাঁচাতে পারবে না!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, "মূসা জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, তুমি শিশুটিকে স্তন্যদান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশংকা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো, ভয় করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাঁকে রসূলদের একজন করব।" (সূরা আল কাসাস : ৭)

আরো ইরশাদ করলেন, "তুমি তাঁকে সিন্ধুকের মধ্যে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, যাতে দরিয়া তাকে তীরের দিকে ঠেলে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আর এমন এক ব্যক্তি তাঁকে তুলে নেবে যে আমার ও এই শিশুর দু জনেরই শত্রু!" আল্লাহ তাআলা ফিরাউন-পত্নীর মন শিশু মূসার প্রতি মমতায় ভরে দিয়েছিলন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, "আমি আমার থেকে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।" (সূরা ত্বাহা : ৩৯)

আল্লাহর আদেশ পেয়ে শিশুর মা তাঁর প্রাণপ্রতিম সন্তানকে অতি যত্নে একটি বাক্সে শুইয়ে রেখে আল্লাহর নাম নিয়ে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন । আল্লাহ তাআলা বললেন, "সিন্ধুকটি ভাসাতে গিয়ে মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে উঠেছিল । যাতে সে আস্থাশীল হয়, সেজন্য আমি তাঁর মন দৃঢ় করে দিয়েছিলাম। তা না হলে সে তাঁর পরিচয় হয়ত বা প্রকাশ করেই ফেলত । মা তাঁর বালিকা কন্যা মরিয়মকে নদীর তীর ঘেঁষে সিন্ধুকটি নদীর স্রোতে যেদিকে যায়, সেদিক লক্ষ্য করে শত্রুদের অজ্ঞাতসারে দূর হতে তা দেখছিল।"(সূরা আল-কাসাস : ১০-১১)

এক সময় সে দেখল বাক্সটি স্রোতের টানে ফিরাউনের রাজপ্রাসাদের সামনের বাগানের ঘাটে এসে থেমে গেছে । ফিরাউনের কয়েকজন লোক তখন নদীতে গোসল করছিল। তারা বাক্সটি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে সম্রাজ্ঞী আছিয়া (রা) ও ফিরাউনের কাছে নিয়ে গেল।

বাক্সের ঢাকনা খুলে আছিয়া (রা) মুগ্ধ হয়ে গেলেন! একটি অনিন্দ্য-সুন্দর কচি শিশু তাঁর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে!

www.pathagar.com

বিবি আছিয়ার বুকটা মমতায় ভরে উঠল। তিনি হাত বাড়িয়ে শিশু মূসাকে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এত সুন্দর মায়াময় শিশু তিনি এর আগে কখনো দেখেন নি।

আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে শিশু মূসার উপর আদরনীরয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছিলেন। তাঁকে যেই দেখত, আদর না করে থাকতে পারত না। ফিরাউনের একজন লোক শিশুটিকে দেখে বলল, এ শিশু নিশ্চয়ই বনী ইসরাইলদের ঘরের । একে মেরে ফেলাই উচিত হবে ।

আছিয়া (রা) স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, "না, না! আপনি একে হত্যা করবেন না! দেখবেন, এ শিশু হবে আপনার ও আমার দু জনেরই নয়নমণি । এককালে এই শিশুটি আমাদের অনেক উপকারে আসতে পারে। আমরা একে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। আসলে তারা এর পরিণাম কী হবে বুঝতে পারেন নি"। (সূরা আল-কাসাস : ৯)

ফিরাউন ও আছিয়া (রা) শিশু মূসা (আ) কে তাদের ঘরে স্থান দিলেন। এরপর মরিয়ম সুযোগ বুঝে অন্যান্য লোকদের সাথে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল। কেউ তাকে শিশুটির বোন বলে চিনতে পারে নি।

শিশু মূসা তখন ক্ষুধার্ত হয়ে চিৎকার করে কাঁদছে, আর রানির নিযুক্ত করা এক ধাত্রী শিশুকে দুধ পান করাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই তার দুধ পান করবে না। "আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই শিশু মূসার জন্য অন্য ধাত্রীর স্তন্যপানে বিরত রেখেছিলেন।"

মরিয়ম এগিয়ে গিয়ে সম্রাজ্ঞী আছিয়া (রা) কে বিনীতভাবে বলল, "আপনারা যদি অনুমতি দেন, তবে আপানাদের আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিতে পারি যাঁরা এই শিশুকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সাথে লালন-পালন করবে ও শিশুটির মঙ্গলকামী হবে ।"
(সূরা আল্-কাসাস : ১২)

তাঁরা রাজি হলে মরিয়ম দ্রুত বাড়ি গিয়ে মাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এল। কেউই জানতে পারে নি যে ইনিই শিশু মূসার প্রকৃত মা। শিশুকে তাঁর কোলে দেয়া মাত্রই তিনি তাঁর বুকের দুধ খেতে শুরু করেন। সেদিন থেকেই তিনি শিশু মূসার ধাত্রী নিযুক্ত হলেন। শিশুর দুধ পান করার বয়স পর্যন্ত তিনি তাকে দুধ পান করিয়েছিলেন।

বর্ণিত আছে, আছিয়া (রা) শিশুর জন্য নিযুক্ত ধাত্রীকে রাজপ্রাসাদে অবস্থান করে তাকে স্তন্যদান করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ঘরে অন্যান্য সন্তান আছে বলে তিনি সে প্রস্তাবে রাজি হতে পারেন নি। পরবর্তীতে দু জনের মধ্যে এই ব্যবস্থা স্থির করা হলো, শিশু মূসা প্রয়োজনে তার ধাত্রীরূপী মায়ের কাছে থাকবে ও অন্য সময় সে তার পালক মাতার কাছে আসবে ।

মূসা (আ) এর নিজের মা সম্বন্ধে যেন কেউ কোনো রকম সন্দেহ পোষণ না করে, সেজন্য ইউখাবিজ নিজ পুত্র মূসাকে দুধ পান করাবার জন্য বিনিময় গ্রহণ করতেন।

এইভাবে "আল্লাহ তাআলা দুগ্ধপোষ্য শিশু মূসাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যেন সন্তানকে দেখে মায়ের চোখ জুড়ায় ও শিশুর জন্য মায়ের মনে কোনো ব্যাকুলতা না থাকে ! মা যেন উপলব্ধি করতে পারেন যে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা বাস্তবিকই সত্য!" (সূরা আল-কাসাস : ১৩)

শিশু মূসার স্তন্যপানের বয়স পার হয়ে গেলেও তাঁর মা তাঁকে মাঝে মাঝেই রাজবাড়িতে এসে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলন।

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে, শিশু মূসার নামকরণ ফিরাউনের ঘরেই সম্পন্ন হয়েছিল। প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় পানিকে 'মূ' বলা হয় ও 'উসা' বলতে বুঝায় 'বাঁচানো হয়েছে'। খুব সম্ভব আছিয়া (রা) পানি থেকে বেঁচে আসা শিশুর নাম মূসা রেখেছিলেন ।

ফিরাউনের ঘরে সম্রাজ্ঞী আছিয়া (রা) এর কোলে আদর যত্নে শিশু মূসা রাজপুত্রের মতোই প্রতিপালিত হতে থাকেন।

বর্ণনায় জানা যায়, একদিন শিশু মূসা একাকী বসে খেলা করছিলেন। ফিরাউন তাঁকে আদর করে চুমু খেতে গেল । মূসা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ফিরাউন আবারও তাঁকে চুমু খেতে চেষ্টা করে । এ সময়ে ছোট্ট মূসা ফিরাউনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। চড় খেয়ে ফিরাউনের মাথায় আগুন ধরে যায়! ক্রোধান্ধ ফিরাউন মূসাকে কেটে ফেলবার জন্য একটা তরবারি নিয়ে এল।

আছিয়া (রা) ছুটে এসে শিশুকে জড়িয়ে ধরলেন। ফিরাউন আগুন ঝরা দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বাধা দিও না আছিয়া! আমি বুঝতে পারছি, এ শিশুই বড় হয়ে আমার শত্রু হবে। শত্রুকে মেরে ফেলাই উচিত! আছিয়া (রা) বললেন, কী যে বলেন আপনি! সাম্যন্য এক দুধের শিশু । ওর বুদ্ধিই বা কী , আর জ্ঞানই বা কতদূর!

ফিরাউনের ক্রোধের আগুন কিছুতেই নিভে না। বলে, ঠিক আছে আমি এখনই ওর জ্ঞানের পরীক্ষা করছি।

তাঁর সামনে দুটো পেয়ালা আনতে আদেশ করা হলো। একটাতে রাখা হলো জ্বলন্ত অঙ্গার, অন্যটাতে রাখা হলো আগুনের মতো টকটকে লাল ইয়াকুত পাথর। পেয়ালা দুটো শিশু মূসার সামনে রাখা হলে, তিনি জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে পুড়ে দিলেন। আছিয়া (রা) সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গারটি মুখ থেকে বের করে আনলেন, কিন্তু ততক্ষণে শিশুর জিহ্বা পুড়ে গেছে। তিনি তোতলা হয়ে গেলেন। ফিরাউন চরম এ পরীক্ষা নিয়ে শিশু মূসাকে অব্যাহতি দিল।

তরুণকালে মূসা (আ)

"কালক্রমে মূসা (আ) পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেন এবং তাঁর শরীর-মন পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলেন।" (সূরা আল-কাসাস : ১৪)

শৈশব ও বাল্যকালে পিতামাতার সাথে মাঝে মাঝে বসবাস করার কারণে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ নবী ইউসুফ (আ), নবী ইয়াকুব (আ), নবী ইসহাক (আ) ও নবী ইবরাহীম (আ) —তাঁদের ধর্মজ্ঞান ও অন্যান্য শিক্ষা দীক্ষায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন! অন্যদিকে ফিরাউনের রাজপ্রাসাদে রাজপুত্র হিসেবে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে তিনি জ্ঞানী শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে থেকে মিসরীয় সমাজের বহুবিধ জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ফিরাউনের প্রাসাদে রাজকীয় অবস্থায় প্রতিপালিত হয়েও মূসা (আ) মনে মনে খুবই নিরানন্দ ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে ফিরাউন ও তার লোকেরা অত্যধিক জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অন্যদিকে বনী ইসরাইলরা চরমতম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি জানতেন যে, আল্লাহ তাআলার অলৌকিক দানে তাঁর জন্মের পর ওই দানব-প্রকৃতি ফিরাউন

www.pathagar.com

কর্তৃক তিনি নিহত হন নি, বরঞ্চ তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে তিনি তার সংস্পর্শে থেকেই বেড়ে উঠেছেন।

বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিবতী সরকারের কর্মচারীদের দ্বারা অসহনীয় নিষ্ঠুরতার মধ্যে তাঁরই লোকেরা (বনী ইসরাইলরা) নিগৃহীত হচ্ছে । এই নির্মম নির্যাতন থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য তিনি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

"একদিন মূসা (আ) শহরের পথে বের হয়েছিলেন। সেখানকার লোকজন কেউ তাঁকে লক্ষ্য করে নি। তাঁর নজরে পড়ে পথে দু জন লোক বিবাদ করছে। এদের একজন হচ্ছে তাঁর নিজের দলভুক্ত ইসরাইলী ও অন্যজন তাঁর শত্রু পক্ষের মিসরীয় কিবতী সম্প্রদায়ের।
কিবতী লোকটি ইসরাইলী লোকটির সাথে অন্যায় এক দাবি নিয়ে নিয়ে বিবাদ বাঁধিয়েছে। ইসরাইলী লোকটি মূসা (আ) এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।

মূসা (আ) কিবতী লোকটিকে অন্যায়ভাবে দাবি করতে নম্রভাবে নিষেধ করেন। কিন্তু তাতে না থেমে সে বরঞ্চ আরও বেশি উগ্র হয়ে ওঠে। ঐ অত্যাচার দমনের জন্য মূসা (আ) তাকে একটি মুষ্ঠাঘাত করলেন এবং এক আঘাতেই লোকটি মৃত্যুবরণ করল। আসলে হত্যার উদ্দেশ্যে তিনি লোকটিকে আঘাত করেন নি। একটি আঘাতে লোকটি মরে যেতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। সেজন্য তিনি যারপর নাই দুঃখ ও অনুতাপে জর্জরিত হলেন। মনে মনে বললেন, এ তো এক শয়তানী কাণ্ড ! শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী । তিনি দু হাত তুলে আল্লাহ তাআলাকে ডাকলেন, "হে আমার প্রভু! আমি না বুঝে আমার নিজের প্রতি যুলুম করে ফেলেছি! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।"
মূসা (আ) আরও বললেন,"হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না। "

পরদিন সকাল হলে মূসা (আ) ভয়ে ভয়ে চারদিক ভালভাবে তাকিয়ে শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন, সেই লোকটি যে গতকাল তাঁকে সাহায্যের জন্য ডেকেছিল, আজ আবার অন্য এক কিবতী লোকের সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে তাঁকে ডাকছে। মূসা (আ) বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি তো দেখছি খুবই ঝগড়াটে একটা লোক। প্রত্যেক দিনই কারো না কারো সাথে তোমার ঝগড়া হতেই থাকে! কিছুক্ষণের মধ্যে মূসা (আ) বুঝতে পারলেন যে, আজকেও কিবতী লোকটিই অন্যায় এক দাবি নিয়ে ইসরাইলী লোকটির সাথে বিবাদ সৃষ্টি করেছে।
তিনি তাদের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য দু জনের দিকেই এগিয়ে গেলেন। তাতে ইসরাইলী লোকটি ভুল বুঝল। সে ভাবল মূসা (আ) এবার তাকেই আঘাত করতে আসছেন। সে চিৎকার করে বলে উঠল, ওহে মূসা ! তুমি গতকাল যেমন একটি লোককে হত্যা করেছ আজ আমাকেও কি তুমি সেভাবে হত্যা করতে চাচ্ছ? তুমি তো দেখছি পৃথিবীতে একজন স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ! শান্তি স্থাপনকারী হতে চাচ্ছ না!" **(সূরা আল-কাসাস : ১৫-১৯)**
বিগত দিনের কিবতী হত্যার সংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু হত্যাকারীর পরিচয় তখন পর্যন্ত জানা ছিল না। এখন ফিরাউনের পক্ষের বিবাদকারী এই ব্যক্তি ইসরাইলী লোকটির মুখে এসব কথা শুনে বুঝতে পারল যে, মূসা (আ) ই গতকালের নিহত লোকটির হত্যাকারী।

www.pathagar.com

সে সাথে সাথেই রাজপ্রাসাদে গিয়ে এ খবরটা পৌঁছে দেয়। আর সেখানে তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শ সভা ডাকা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মূসা (আ) এর মৃত্যুদণ্ড ধার্য হয়ে যায়।

মূসা (আ) রাজপ্রাসাদের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। "এমন সময় দূর থেকে একজন লোক দৌড়ে এসে তাঁকে সাবধান করে দেয়। শুনুন মূসা (আ), ফিরাউনের পারিষদেরা আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। আপনি এক্ষণই এখান থেকে চলে যান! জানবেন, আমি আপনার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী।"

এই সংবাদ শোনা মাত্রই মূসা (আ) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে পড়েন ও বলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি যালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা করুন।" (সূরা আল-কাসাস:২০-২১) আল্লাহর কাছে আবেদন জানিয়ে মূসা (আ) মানসিকভাবে সান্ত্বনা ও বল পেলেন।

মাদইয়ানে মূসা (আ)

"মূসা (আ) দ্রুত বেগে মাদইয়ানের পথ ধরলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে আশায় বুক বাঁধলেন যে, তিনি তাঁকে নিরাপদে ও সহজ শান্তিতে সেখানে পৌঁছে দিবেন ।"(সূরা আল-কাসাস : ২২)

মাদইয়ান আরবের অন্তর্গত একটি জনবহুল স্থান। লোহিত সাগরের অপর পারে অবস্থিত এই এলাকাটি ফিরাউনের আধিপত্যের বাইরে। মিসর হতে পদব্রজে দশদিনের দীর্ঘ পথ। মরুময় রাস্তা খুবই সংকীর্ণ। জনমানবহীন অঞ্চলের মাঝে মাঝে ছোট বড় পাহাড়।

সুদীর্ঘ মরুভূমি অতিক্রম করে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত "মূসা (আ) মাদইয়ানে একটি কূপের কাছে পৌঁছলেন।"কূপের মুখটা একটা বিরাট পাথরে ঢাকা। কাছেই একটা বড় গাছ। তিনি বিশ্রামের জন্য গাছের নিচে বসলেন। মেষ প্রতিপালন করা এদেশের লোকদের প্রধান জীবিকা। মরুভূমির প্রখর রৌদ্রতাপে তৃষ্ণার্ত মেষপালকে রাখালেরা ঐ কূপের পানি পান করিয়ে নিয়ে যায়।

"মূসা (আ) দেখলেন, একদল রাখাল তাদের মেষপাল নিয়ে কূপের ধারে এসেছে। তারা কয়েকজন মিলে পাথরের তৈরি বিরাট ঢাকনাটা উঠিয়ে দূরে সরিয়ে রাখল। দড়িদড়াসহ বেশ বড় একটা বালতি সেখানে রাখা ছিল। রাখালেরা সেই বালতি ভরে পানি উঠিয়ে নিজেদের মেষগুলোকে পানি পান করালো।

মূসা (আ) লক্ষ্য করলেন, কিছুটা দূরে দু জন মেয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে । তারা তাদের পশুগুলোকে ছেড়ে না দিয়ে আগলে রাখছে ।

মূসা (আ) এর মনে হলো ঐ মেয়ে দু জনকে সাহায্য করা প্রয়োজন। তিনি তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী ব্যাপার ? তোমরা তোমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছ না কেন?

তারা বলল, যে পর্যন্ত না ঐ রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে চলে না যায়, আমরা আমাদের পশুগুলোকে তা পান করাতে পারি না। আর আমরা মেয়েরাই এ কাজের জন্য বাইরে এসেছি, কেননা আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। " (সূরা আল-কাসাস : ২৩)

www.pathagar.com

রাখালেরা নিজেদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে সেই পাথরের বিরাট ঢাকনাটা দিয়ে কূপের মুখ বন্ধ করে চলে গেল। মেয়ে দু জন এবার তাদের মেষপাল ছেড়ে দিল। সামান্য পানি যা বালতিতে ছিল তাই তাদের মেষগুলো পান করল।

এ দেখে মূসা (আ) এগিয়ে গেলেন। অনায়াসেই কূপের ঢাকনাটি উঠিয়ে, বালতি ভরে পানি তুলে মেষগুলোকে পানি পান করালেন। মেয়ে দু জন চলে গেল।

মূসা (আ) একটি ছায়াচ্ছন্ন স্থানে গিয়ে বসলেন । তিনি এখন গৃহহীন, আশ্রয়হীন ও কপর্দকশূন্য! তিনি দু হাত তুলে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ প্রার্থী হলেন। হে আমার প্রভু! আপনার পাঠানো যে কোনো রকম অনুগ্রহ আমার এখন খুবই প্রয়োজন। (সূরা আল-কাসাস : ২৪)

মেয়ে দু জন মূসা (আ) এর শারীরিক শক্তি, নিজে থেকে তাদের সাহায্য করা ও তার ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হলো ।

আজ নির্দিষ্ট সময়ের কিছুটা আগে তারা বাড়ি ফিরলে তাদের পিতা যিনি আল্লাহর দ্বীনে দৃঢ় বিশ্বাসী, অতি সৎ ও সজ্জন— শুয়ায়ব তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা সব ঘটনা তাঁর কাছে খুলে বলল। শুনে তিনি তাঁর এক মেয়েকে মূসা (আ) কে ডেকে আনতে পাঠালেন। "মেয়েটি লজ্জাজড়িত পায়ে তাঁর কাছে এল। বলল, আপনি আমাদের মেষগুলোকে পানি পান করিয়েছেন সেজন্য আমাদের পিতা আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু উপহার দেয়ার জন্য আপনাকে দাওয়াত করেছেন।

মূসা (আ) মেয়েটির সাথে তাদের বাড়িতে এসে মেয়েদের পিতার কাছে নিজের যাবতীয় ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। শুনে তিনি বললেন, ভয় পেয়ো না। তুমি অত্যাচারী লোকদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। এ এলাকা ফিরাউনের অধীনে নয়।
মূসা (আ) এর সমস্ত কাহিনী শুনে ও তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে তাঁদের বাসায় থাকতে প্রস্তাব দিলেন। আল্লাহ তাআলার প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে মূসা (আ) সেখানে থেকে গেলেন। এখানে তিনি সন্তুষ্ট, কেননা বাসার সবাই তাঁর প্রতি আন্তরিক ও তাঁরা সবাই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মেয়েদের মধ্যে একজন তাদের পিতাকে বলল, আব্বা, আমি একটা কথা বলতে চাই! আপনি এঁকে আপনার কর্মচারী নিযুক্ত করুন! আর কর্মচারী হিসেবে তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট হতে পারেন যিনি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। এসব বিষয়ে আমরা তো তার প্রমাণ আগেই পেয়েছি।

কন্যার পরামর্শ শুনবার পর পিতা গভীরভাবে চিন্তা করলেন। বাস্তবিকই লোকটি অত্যন্ত ভদ্র ও শালীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুজন তরুণী মেয়ের ঘরে বহুদিন ধরে একজন যুবককে শুধু কর্মচারী হিসেবে স্থান দেয়া সমীচীন হবে না । যুবকটির বংশ পরিচয় তিনি পেয়েছেন। সে ক্ষেত্রে এঁকে জামাতা বানিয়ে ঘরে রাখলে সবচেয়ে ভাল হয়।

তাই তিনি মূসা (আ) এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। "বললেন, আমার দু টি মেয়ের মধ্যে একটির সাথে তোমার বিয়ে দিতে চাই। তবে শর্ত হলো, বিয়ের দেনমোহর পূরণের জন্য তুমি আমার এখানে আট বছর কাজ করবে। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর দশ বছরও কাজ করতে পারো। আমি তোমাকে কোনো রকম কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাই না। আর জেনে রেখো, আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি আমাকে সৎ লোক হিসেবে পাবে।

www.pathagar.com

মূসা (আ) তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলেন। বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এ কথাই সাব্যস্ত হলো যে, আমি এই দুটি নির্দিষ্ট মেয়াদের যেটিই পুরা করি, তাহলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব কথার সাক্ষী রইলেন।" (সূরা আল-কাসাস ঃ ২৫-২৮)

যথা সময়ে মূসা (আ) এর বৃদ্ধ লোকটির কনিষ্ঠা কন্যা সফুরার বিয়ে সম্পন্ন হলো।

স্ত্রীসহ মূসা (আ) এর মাদইয়ান থেকে মিসর অভিমুখে যাত্রা

মূসা (আ) সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছিলেন, "মূসা (আ) দু টি মেয়াদের মধ্যে যেটি অধিক পরিপূর্ণ এবং তাঁর শ্বশুরের জন্য অধিক সন্তুষ্টির কারণ ছিল অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন।"

সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে মূসা (আ) নিজের জন্মভূমি মিসর থেকে দূরে সরে আছেন। তাঁর মন দেশে যাবার জন্য উতলা হলো। তিনি ভেবেছিলেন এই সময়ের মধ্যে হয়ত অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ফিরাউনের মৃত্যু হয়ে গেছে । এখন সেখানে গিয়ে নিজ পরিবারের সাথে বসবাস করতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু মহন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তাঁকে দেশে ফিরে গিয়ে যালিম ফিরাউনের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করতে হয়েছিল।

মূসা (আ) স্ত্রী সফুরা ও তাঁর কয়েকজন সহচর নিয়ে মিসরের দিকে রওয়ানা হলেন। শ্বশুরের দেয়া উপহারস্বরূপ অনেকগুলো মেষপালও সাথে নিলেন।

মাদইয়ান থেকে মিসরে যাবার পথে পড়ে তূর পাহাড় । তখন ছিল শীতকাল। রাত্রির অন্ধকারে পথ হারিয়ে তাঁরা একটি জঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। লোকজন ও মেষপাল শীতে কাহিল হয়ে পড়েছে । স্ত্রী ছিলেন তখন আসন্নপ্রসবা । পথে প্রসব বেদনা শুরু হলো । মূসা (আ) সেখানেই তাঁবু গাড়লেন। বিবি সফুরা স্বামীকে আগুন জ্বালাতে অনুরোধ করেন। তিনি চকমকি পাথরে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা জ্বলল না। "দূর থেকে তূর পাহাড়ের দিকে আগুন দেখা গেল। তিনি স্ত্রী ও পরিজনবর্গদের বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি ঐ পাহাড়ে আগুন দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয় আমি সেখানে গিয়ে পথের কোনো সন্ধান পাবো কিংবা শরীর উত্তপ্ত করার জন্য আগুনের কোনো অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব।

সেখানে পৌঁছে শুনলেন উপত্যকার ডান দিকে অবস্থিত পবিত্র এক ভূখণ্ডের ওপর দাঁড়ানো একটি গাছের দিক থেকে একটি স্বর ভেসে আসছে । "হে মূসা! আমিই আল্লাহ, সমগ্র জগতের প্রতিপালক।" (সূরা আল কাসাসঃ ২৯-৩০) তুমি যে আগুন দেখছ, সেটা আসলে আগুন নয়, তোমার প্রতিপালকের নূরের জ্যোতি।

"তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা, তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছ। আমি তোমাকে নবী ও রসূল মনোনীত করেছি। কাজেই তোমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনে নাও। আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তোমরা আমারই ইবাদত কর এবং আমাকে সব সময় মনে রাখার জন্য নিয়মিত নামায কায়েম কর!" (সূরা ত্বাহাঃ ১২-১৪)

"এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কী? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি। আমি এর উপর ভর করে চলি, এ দিয়ে আমি আমার ছাগলগুলোকে পাতা পেড়ে দেই, আর

www.pathagar.com

এটি আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে বললেন, মূসা, ওটা তুমি মাটিতে ছুড়ে ফেল! মূসা (আ) লাঠিটা ছুড়ে মারতেই সেটা একটা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল।

মূসা (আ) ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় পেয়ো না। তুমি ওটাকে ধরে ফেলো ! আমি ওটাকে আবার আগের অবস্থাতে ফিরিয়ে আনব।

মূসা (আ) সাপটিকে স্পর্শ করতেই সেটি আবার লাঠিতে পরিণত হলো! এরপর আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে আদেশ করলেন, তুমি এবার একটা হাত তোমার বগলে রাখ। হাতটি বের করলে দেখা যাবে সেটি কোনো রকম ব্যাধি ছাড়াই উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছে। এটি আল্লাহ তাআলার অন্য একটি নিদর্শন।

আল্লাহ তাআলা এবার মূসা (আ) কে আদেশ করলেন, এ দুটি নিদর্শন নিয়ে তুমি ফিরাউনের কাছে যাও! সে অবিশ্বাস, অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে সীমা ছাড়িয়ে গেছে!

আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে কোনো রকম হাতিয়ার বা লোকবল ছাড়াই শুধু এই দু টি নিদর্শনসহ ফিরাউইনের সাথে মোকাবেলা করতে পাঠিয়েছিলেন এবং এ দু টি নিদর্শন দেখিয়েই মূসা (আ) জয়ী হয়েছিলেন।

মূসা (আ) এবার আল্লাহর কাছে আরজ করেন, হে আল্লাহ! এই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য যাতে আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারি সেজন্য আমাকে জ্ঞান দান করুন! আমার আত্মবিশ্বাস, মনোবল ও সাহস বাড়িয়ে আমার সব রকম কাজকে সহজ করে দিন! লোকেরা যেন আমার কথা স্পষ্ট বুঝতে পারে, আমার ভাই হারুনকে আমার সাহয্যকারী করে আমার শক্তি বাড়িয়ে দিন। তাঁকে আমার সকল কাজের অংশীদার করে দিন, যেন আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা লোকদের কাছে অধিক প্রচার করতে পারি। মূসা (আ) আল্লাহ তায়ালার কাছে যা কিছু চেয়েছিলেন, সবই তিনি মঞ্জুর করলেন।
(সূরা ত্বাহা : ১৭-৩৬)

আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে ফিরাউনের নিকট নবী মূসা (আ) ও নবী হারুন (আ) এর আগমন

"আল্লাহ তাআলা নবী মূসা (আ) ও নবী হারুন (আ) কে ফিরাউনের সাথে মোকাবিলা করতে নির্দেশ দিলেন । বললেন, ফিরাউন সব দিক দিয়েই সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তার কাছে গিয়ে তোমরা নম্রভাবে কথা বলো। তোমাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সে তোমাদের উপদেশ হয়ত বা মেনে নিতে পারে, কিংবা ভয়ও পেতে পারে।

মূসা (আ) ও হারুন (আ) উভয়েই নিবেদন করলেন, হে আমাদের প্রভু! আমাদের ভয় হচ্ছে ফিরাউন তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করবে অথবা সীমাহীন অন্যায়ের মাধ্যমে আমাদের উপর আরও অধিক নির্যাতন চালাবে।

www.pathagar.com

ঘটনা পরম্পরায় বুঝা যায় যে, মূসা (আ) মাদইয়ান থেকে মিসরে পৌঁছেই হারুন (আ) কে তাঁর শরিক করে নিয়েছিলেন। সেই সময় ফিরাউনের কাছে যাওয়া আগে দু জনেই আল্লাহর কাছে এই নিবেদন পেশ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের ভরসা দিলেন, ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের সাথে আছি।" (সূরা আশ শুআরা : ১৪-১৭)

নবী মূসা (আ) ফিরাউনের দরবারে এসে তাকে সব কথা বললে সে তাঁর কাথার কোনো রকম গুরুত্বই দেয় না। বলে, বনী ইসরাইলরা আমার ক্রীতদাস। আমি আমার ক্রীতদাসদের কেন তোমাদের হাতে ছেড়ে দেব?

মূসা (আ) জবাব দিলেন, না, ওরা আপনার নয়, আল্লাহর ক্রীতদাস ওরা। ফিরাউনের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। সে মূসা (আ) এর দুটি বিষয় নিয়ে বিরূপ ও বিরোধী আলোচনার সূত্রপাত করে । সে ব্যঙ্গ করে প্রশ্ন করে ,

আচ্ছা, তুমি কি সেই মূসা যাকে আমরা নীল নদীতে ভেসে আসা একটা বাক্স থেকে উদ্ধার করেছিলাম? "আর তোমাকেই কি আমরা তোমার শৈশবকালে লালন-পালন করেছিলাম? মনে হচ্ছে তুমি সবই ভুলে গেছ! ভুলে গেছ যে, তুমি তোমার জীবনের বেশ কযেকটি বছর আমাদের সাথেই কাটিয়ছ। তোমার উপর আমাদের অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। তা না হলে, তুমি আজ আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে স্পর্ধার সাথে এসব কথা বলতে পারতে না। তাছাড়া, একটা গুরুতর বিষয়ের কথা তো তুমি ভুলেই গেছ। তুমি আমার বংশের একজন কিবতীকে হত্যা করে পালিয়ে গিয়েছিলে না? সেটা কি তোমার চরম অকৃতজ্ঞতা ছিল না?

জবাবে মূসা (আ) বললেন, সে কাজ আমি না জেনে ভুলে করেছিলাম। আর আপনাদের ভয়েই আমি পালিয়ে দূরে চলে গিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে আমাকে ধর্মীয় জ্ঞান ও সুবিচার করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে রসূলদের মধ্যে অন্ত র্ভুক্ত করেছেন। আর আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহের দোহাই দিচ্ছেন, সে অনুগ্রহের কোনো প্রশ্নই উঠত না, যদি আপনি বনী ইসরাইলদের গোলাম বানিয়ে অমানুষিক যুলুম না করতেন।" (সূরা আশ শুআরা : ১৮-২২)

আপনার অত্যাচারের কারণেই তো আল্লাহ তাআলার নির্দেশে আমার মা আমাকে বাক্সে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তা না হলে আমার লালন-পালনের জন্য আমার ঘরই যথেষ্ট ছিল। এই কারণে আপনি যে আমাকে লালন-পালন করে অনুগ্রহ করেছেন বলছেন, তা আপনার মুখে শোভা পায় না। ফিরাউন এবার পূর্ব প্রসঙ্গের জের ধরে বলল, " আচ্ছা, এবার বলো, তোমাদের জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কী? মূসা (আ) স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, তিনি আসমানসমূহ ও যমিনের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব কিছুরই প্রতিপালক।

ফিরাউন বিদ্রূপের হাসি হেসে তার সভাসদদের বলল, তোমরা শুনছ তো মূসা কী বলছে ? মূসা (আ) আবারও বললেন, হ্যাঁ, তিনি আপনাদের ও আপনাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

ফিরাউন ব্যঙ্গ করে উপস্থিত লোকদের বলল, দেখ, তোমাদের জন্য পাঠানো হয়েছে যে রসূল, তাকে তো আমার একটা বদ্ধ পাগল বলে মনে হচ্ছে। মূসা (আ) সে বিদ্রূপে ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন, হ্যাঁ,

www.pathagar.com

আপনাদের যদি কিছুমাত্র বুদ্ধিজ্ঞান থাকে, বুঝতে পারবেন পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুরই প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ।

এসব কথা শুনে ফিরাউন মূসা (আ) কে ধমক দিয়ে বলল, দেখ মূসা, এই মিসর সাম্রাজ্যে তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত কর, তবে তোমাকে আমি অবশ্যই কারাগারে বন্দি করব ।

মূসা (আ) দেখলেন সামনে সমূহ বিপদ! তবু তিনি অবিচলিত থেকে শান্ত কণ্ঠে বললেন, আমি যদি বিশ্বজাহানের একমাত্র মালিকের প্রেরিত প্রতিনিধি হওয়ার অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখাই, তাহলেও কি আপনি আমার কথা মানবেন না?

ফিরাউন অবজ্ঞাস্বরে বলল, ঠিক আছে। এতই যদি সত্যি কথা বলছ, তবে দেখাও তোমার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

মূসা (আ) তাঁর লাঠিটা মাটিতে ছুড়ে ফেললেন, আর অমনি সেটা একটা সত্যিকারের অজগর সাপ হয়ে গেল। এরপর তিনি তাঁর একটা হাত বুকের ভেতর ঢুকিয়ে একটু পরেই বের করে আনলেন। উপস্থিত দর্শকদের দৃষ্টিতে তা শুভ্র-সমুজ্জ্বল বলে প্রতিভাত হলো।

আল্লাহ তাআলার এইসব নিদর্শন দেখে ফিরাউনের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। রাজত্ব ও প্রতিপত্তি হারাবার আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল। সে তার পারিষদবর্গকে বলল, আসলে কিন্তু এই লোকটা হলো একজন দক্ষ জাদুকর। সে তার জাদুর প্রভাবে তোমাদের উন্নত ঐতিহ্যকে দূরে সরিয়ে দিয়ে দেশ থেকে তোমাদের বের করে দিতে চাচ্ছে।

এরপর যে কথাটি ফিরাউন বলল, তাতে মনে হলো, সে খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সে উপাস্য বলে দাবি করছে, আর প্রজা ও অন্যান্যরা হলো তার বান্দাহ। এখন সেই উপাস্যই ভয় ও ভাবনায় বিচলিত হয়ে বান্দাদের মতামত ও সাহায্যপ্রার্থী হচ্ছে। বলছে, তোমরা এখন কী পরামর্শ দেবে বলো?

তারা বলল, মূসা (আ) ও তাঁর ভাইকে এখন কিছুকালের জন্য আটকে রাখুন! আর শহরের সব জায়গায় সংগ্রহকারী লোক পাঠিয়ে যেখানে যত দক্ষ জাদুকর আছে তাদের আপনার কাছে নিয়ে আসুন!

এরপর ফিরাউনের আদেশে তাদের জাতীয় উৎসবের দিনটি নির্দিষ্ট করা হলো যেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও লোকেরা মেলা ও উৎসব উপলক্ষে এই অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতা দেখবার জন্য একত্রিত হতে পারে।

সংগ্রহকারীরা দেশের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞ জাদুকরকে নির্ধারিত একটি স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত করল। আর রাজ্যের সমস্ত লোকদের সেখানে সমবেত হতে বলা হলো।

জাদুকররা উপস্থিত হয়ে ফিরাউনকে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমাদের উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে তো ? ফিরাউন বলল, নিশ্চয়ই ! তোমরা তখন আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন হয়ে থাকবে। তোমরা আমার রাজদরবারে চাকরি পাবে।"

(সূরা আশ্ শুআরা : ২৩-২৪)

উৎসবের দিন সমাগত হলো। মিসরের পথঘাট ও মন্দিরগুলোকে অপরূপ সাজে সাজানো হলো। রৌদ্র কিরণে উজ্জ্বল সুন্দর দিন। নির্দিষ্ট ময়দান লোকে লোকারণ্য!

উদ্বিগ্ন চিত্তে সবাই অপেক্ষা করছে, কে হারে ! কে জিতে!

www.pathagar.com

মূসা (আ) আল্লাহ তাআলার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে স্থিরচিত্তে জাদুকরদের বললেন, তোমরাই প্রথমে যা নিক্ষেপ করবার কর। অমনি তারা তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুড়ে মারল ও সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, ফিরাউনের সম্মানের শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করব।

'দর্শকদের মনে হলো জাদুকরদের দড়ি ও লাঠিগুলো সাপ হয়ে ছুটোছুটি করছে। তারা মনে মনে খুবই শঙ্কিত হয়ে ওঠে।' (সূরা আল-আরাফ : ১১৬)

এরপর মূসা (আ) আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে নিজের লাঠিটা ধাবমান সাপগুলোর দিকে নিক্ষেপ করলেন । আর তখনই সেটা বিরাট এক সাপ হয়ে জাদুকরদের কৃত্রিম সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল।

মূসা (আ) নত হয়ে সাপটির গায়ে হাত দিতেই সেটা আগের মতো লাঠি হয়ে গেল। দেখে দর্শকরা হতবাক হয়ে যায়! আর জাদুকররা বুঝতে পারল যে, এটা মূসা (আ) এর শুধু একটা জাদুর কৌশল নয়। এটা শক্তিমান আল্লাহ তাআলারই এক অলৌকিক নিদর্শন। জাদুকররা তখনই আল্লাহ উদ্দেশ্যে সেজদায় নত হয়ে গেল। বলল, আমরা জগৎসমূহের প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, যিনি মূসা (আ) ও হারুণ (আ) এর প্রতিপালক।

ফিরাউন এতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলো । সে ক্রোধে চিৎকার করে বলল, কী ! আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা মূসার আল্লাহর উপর ঈমান এনে ফেললে? নিশ্চয়ই সেই তোমাদের নেতা যে তোমাদের জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে। ঠিক আছে। শীঘ্রই সেই পরিণাম তোমরা জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিকে রেখে কেটে টুকরো টুকরো করব। আর তোমাদের সবাইকে আমি শূলে চড়িয়ে মারব।

আল্লাহর উপর আন্তরিক বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা জাদুকরদের সাহসী ও প্রত্যয়ী করে তুলেছে। তারা তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, কোনো ক্ষতি নেই। তুমি আমাদের মারতে চাও, মার! মৃত্যুর পর আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যাব। আর আশা করি, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী বলে আল্লাহ আমাদের আগের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন ।" (সূরা আশ-শুআরা : ৪৩-৫১)

ফিরাউনের ঔদ্ধত্য

"ফিরাউন তার জাদুকরদের আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনার কারণে শূলবিদ্ধ করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। শুধু তাই হয়, দেশের লোকদের আতঙ্কিত করবার জন্য তাদের শবদেহ নগরের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রেখেছিল। আর ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল যে, যদি কেউ ফিরাউনের বিরুদ্ধে যায়, তবে তাকে এমনিভাবে শাস্তি দেওয়া হবে।" (ক্বোরানের কাহিনী)

"এরপর ফিরাউন তার সভাসদদের ডেকে বলল, শোনো তোমরা, ঐ জাদুকররা যা-ই বলুক না কেন, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য আছে বলে আমি জানি না।

সে তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে আদেশ করে, হামান! ইট দিয়ে আমার জন্য খুব উচুঁ একটি প্রাসাদ তৈরি কর, যেন আমি তার ওপরে উঠে মূসার আল্লাহকে দেখতে পারি। তবে আমি অবশ্যই মনে করি, সে একটা ভায়ানক মিথ্যেবাদী"(সূরা আল কাসাস : ৩৮)

হামান নিশ্চিতভাবে জানত যে, ওই রকম আকাশ ছোঁয়া অত্যধিক উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করা সম্ভবপর নয়, তবুও সে কপটতার আশ্রয় নিয়ে তোষামোদ করে বলল, আপানারা আদেশ শিরোধার্য । আসমান

www.pathagar.com

ছোঁয়া উচুঁ ইমারত অবশ্যই তৈরি হবে। কিন্তু জনাব, যদি অভয় দেন, তবে একটা কথা বলি। আপনি ওই আকাশের উপরে কাউকেই দেখতে পাবেন না। তা দেখবেন কী করে? আসলে আপনি ছাড়া তো আর কোনো দেবতাই নেই । এভাবে শুধু হামান নয়, ফিরাউনের লোকেরা তাকে তোষামোদ করে দুর্বিনীত ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার ইন্ধন যোগায়।

ফিরাউনের দলীয় তোষামোদকারী ও সুবিধাভোগী লোকেরা ছাড়া কিছু সংখ্যক লোকের মনের গতি পরিবর্তিত হতে থাকে ।

এ বিষয়ে কিছুটা আন্দাজ করতে পেরে "ফিরাউন সম্প্রদায়ের লোকেরা ফিরাউনকে বলে, আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্য বিপর্যয় সৃষ্টি করতে ও আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দেবেন? ফিরাউন বলল, ঠিকই বলেছ তোমরা।

সে সেদিনই নতুন করে এক কঠোর আইন জারি করল। বনী ইসরাইলদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করে ভবিষ্যতের জন্য দেশকে শত্রুমুক্ত রাখা হবে, আর কন্যাদের ব্যবহার করা হবে সেবাদাসীরূপে।

মূসা (আ) নিজের লোকদের আল্লাহ তাআলার সাহয্যপ্রার্থী হয়ে ধৈর্যধারণ করতে উপদেশ দেন।" (সূরা আল-আরাফ : ১২৭-১২৮)

পুণ্যবতী আছিয়া (রা)

নবী ও রসূল মূসা (আ) কে শৈশব বাল্য ও কৈশোরকালে যিনি অতি যত্ন ও মমতায় প্রতিপালন করেছিলেন, তিনি মিসরের দুর্দান্ত, নিষ্ঠুর ও কাফির বাদশা ফিরাউনের স্ত্রী, এক আল্লাহর উপর বিশ্বাসী, অত্যন্ত পুণ্যবতী মহিলা আছিয়া (রা)। তিনি ছিলেন নবী ইয়াকুব (আ) এর বংশধর মোজাহামের কন্যা। মোজাহাম ছিলেন একজন শিক্ষিত, জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি তাঁর বালিকা কন্যা আছিয়ার মধ্যে বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি পরিলক্ষিত করে, তাকে শিক্ষক রেখে বিদ্যা ও ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন।

বিবাহপোযোগী বয়স হলে মোজাহাম কন্যাকে মিসরের কিবতী সম্প্রদায়ের এক সৎ ও ধনী কৃষক পরিবারের কাবুস নামক (যার অন্য নাম ছিল মুসয়ার) এক তরুণের সাথে বিবাহ দেন। এই কাবুসই পরবর্তী সময়ে ফিরাউন দ্বিতীয় রামসিস নামে মিসরের সম্রাট পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছিল।

আছিয়া (রা) এর চিন্তা চেতনা ও চরিত্রের ধারা ছিল স্বামী ফিরাউনের সম্পূর্ণ বিপরীত। ফিরাউন ছিল অবিশ্বাসী, আর আছিয়া (রা) ছিলেন আল্লাহ তাআলার প্রতি গভীর ও আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী। ফিরাউন ছিল খুবই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী, সেখানে আছিয়া (রা) ছিলেন অত্যন্ত মমতাময়ী , নরম ও সুন্দর মনের অধিকারী।

আছিয়া (রা) স্বামীর অনাচার ও বনী ইসরাইলদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে মনে মনে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। নৃশংস কাফির স্বামীকে সুপথে ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় নেই। সেই এককালের কৃষক সন্তান এখন মিসরের রাজ্যাধিপতি, প্রবল পরাক্রান্ত ফিরাউন। তার পাপপঙ্কিল কার্যকলাপকে তিনি মানসিকভাবে খুবই ঘৃণা করেন। কিন্তু পাপাচারী ফিরাউনের কাছে অন্যায় বলে কিছু নেই। ক্ষমতার দাপটে সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করছে। আছিয়া (রা) এতে মনে মনে নিদারুণ যাতনায় ছটফট করেন ও কাতরভাবে আল্লাহ তাআলাকে ডাকেন। অত্যন্ত সংগোপনে তিনি আল্লাহর ইবাদত করেন। অবিশ্বাসী পাষণ্ড স্বামী যদি ঘুণাক্ষরে এ বিষয়টি জানতে পারে, তবে আর রক্ষা নেই।

www.pathagar.com

নদীতে ভেসে আসা শিশু মূসাকে পেয়ে আছিয়া (রা) এর জীবন সুখে ভরে উঠেছিল। শৈশবকাল থেকেই মূসা (আ) এর মধ্যে একটা পবিত্র জ্যোতির আভাস পেয়ে ও পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ও একাগ্রতা লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত ছিলেন। তাকে লালন-পালন করার সৌভাগ্য হয়েছিল বলে তিনি মনে মনে গর্ব অনুভব করতেন । অন্যদিকে এই পুণ্যবতী মহিলার কোলে লালিত-পালিত হয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে বাল্য, কৈশোর ও তারুণ্য বেলার প্রাথমিক দিনগুলো সুখে পাড়ি দিতে পেরেছিলেন বলে মূসা (আ) তাঁর পালক মাতার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন ।

এক সময় আছিয়া (রা) এর জীবনে এক ভয়াবহ বিভীষিকার ছায়া নেমে আসে। একদিন তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরাউনের সামনে কোনো একটা প্রসঙ্গে "ইয়া আল্লাহ!" বলে ফেলেছিলেন। শুনে ফিরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, একী! তোমার মুখ থেকে এসব কী কথা বের হলো? তাহলে তুমি আমাকে আল্লাহ বলে স্বীকার কর না?

আছিয়া (রা) ভয়ে নির্বাক ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর নির্ভীক কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো, না । আপনাকে আল্লাহ বলে আমি মানি না। আমার, আপনার ও আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক হলেন একমাত্র আল্লাহ। আর একমাত্র তিনিই হলেন আমাদের ইলাহ, মাবুদ।

স্ত্রীর এহেন সাহসিক মন্তব্যে ফিরাউন ক্রোধে জ্ঞানহারা হলো এবং সে অবস্থাতেই আছিয়া (রা) এর প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়ে দিল । আছিয়া (রা) কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে থাকেন । তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবধারা তখন শুধু আল্লাহ তাআলার প্রতি দৃঢ় সন্নিবদ্ধ। তিনি দু হাত তুলে বলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আপনার কাছে বেহেশতে একখানা ঘর তৈরি করে রাখুন! আপনি আমাকে ফিরাউন ও তার দুষ্কৃতি থেকে এবং যালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করুন !" (সূরা আত-তাহরীম : ১১)

নিষ্ঠুর ফিরাউনের আদেশে আছিয়া (রা) কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। পাষণ্ড কাফির, দুর্দান্ত ফিরাউনের স্ত্রী হয়ে, তার গৃহে অবস্থান করে, অসহ্য অত্যাচার ও অপমান সহ্য করে আছিয়া (রা) যেভাবে ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে বিজয়ী হয়েছিলেন।

অহংকারী কারূনের পরিণতি

ফিরাউনের ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতার কারণে নবী মূসা (আ) যখন জটিল অবস্থার সম্মুখীন, তখন তাঁর স্বজাতি বনী ইসরাইল বংশোদ্ভুত কারূনের সাথেও তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

"কারূন মূসা (আ) এর সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে ফিরাউনের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মূসা (আ) এর সাথে ঘোর বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল।

কারূন প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে এত বেশি ধনসম্পদ দিয়েছিলেন যে, একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও তার ধনাগারের চাবিগুলো বহন করতে কষ্টসাধ্য ছিল। কারূন নিজের অত্যধিক ধনরত্ন নিয়ে আনন্দে ও অহংকারে আত্মহারা হয়ে দেশের সম্পদহীন লোকদের অত্যন্ত তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করত।

বনী ইসরাইলদের কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, অর্থশালী হয়েছ বলে তোমার গর্ব করার কিছু নেই । আল্লাহ তোমাকে ধন দিয়েছেন, তুমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় কর । গরীব দুঃখীদের সাহায্য করে পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় কর। জেনে রেখো, আল্লাহ তাআলা দাম্ভিকদের মোটেও পছন্দ করেন না। "জবাবে কারূন বলেছিল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলেই প্রাপ্ত হয়েছি।" তার জন্য কারো কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। (সূরা আল-কাসাস : ৭৬-৭৮)

www.pathagar.com

তাওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আ) এর কথায় বনী ইসরাইলরা যাকাত দিতে আরম্ভ করেছিল । কিন্তু সবচেয়ে সম্পদশালী কারূন কোনো দিন যাকাত দিত না।

মূসা (আ) কারূনকে অনেক ধর্মোপদেশ দিয়ে যাকাত দিতে রাজি করালেন। কারূনের সঞ্চিত অর্থের আড়াই টাকা হিসাবে যাকাতের অর্থ তার গরিব আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য অর্থহীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে।

কারূন তার সিন্ধুকের ধনরত্নের হিসাবের পর যাকাতের অংশ ভাগ করে যখন দেখল, তার ধনরাশির বেশ কিছুটা অংশ দিয়ে দিতে হবে, তখন তার মত বদলে গেল। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বলে, না, আমি যাকাত দিয়ে আমার সিন্ধুকের অর্থ কিছুতেই কমাতে পারব না। আমি আমার নিজের চেষ্টায় অর্থ ও সম্পত্তির মালিক হয়েছি । কেউ আমাকে দয়া করে অর্থ দেয় নি। আমার ধনরত্ন আমার সিন্ধুকে যেভাবে রাখা আছে, সেভাবেই থাকবে।

কারূন যখন যাকাত দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল মূসা (আ) কে প্রত্যাদেশ করলেন, কারূনকে জিজ্ঞেস কর, "সে কি জানত না আল্লাহ তাআলা তার আগে বহু মানবগোষ্ঠী যারা তার চেয়ে শক্তিতে প্রবল ও জনসংখ্যায়ও অধিক ছিল, তাদের তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন?" (সূরা আল-কাসাস : ৭৮)
কারূন এসব কথায় মোটেও কর্ণপাত করে না। "কারূন একদিন নিজের ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য খুব জাঁকজমকের সাথে তার লোকজনদের সামনে বের হলো।

যারা পার্থিব জীবনের জন্য লালায়িত ছিল, তারা তাকে দেখে বলতে লাগল, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে আমাদেরও যদি সে রকম দেওয়া হতো! বাস্তবিকই লোকটি বড়ই ভাগ্যবান ।

কিন্তু যাঁদেরকে সত্যিকারের জ্ঞানদান করা হয়েছিল তাঁরা বললেন, ধিক তোমাদের! আল্লাহ তাআলার পুরস্কার তো তাঁদের জন্যই রয়েছে, যাঁরা ঈমানদার ও সৎকর্ম পরায়ণ। আর তা ধৈর্যশীল লোক ছাড়া আর কেউ পেতে পারে না। "

কিন্তু কারূন জ্ঞানী লোকদের কথায় কোনো রকম মূল্যই দেয় না। সে আল্লাহ তাআলার আদেশ বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের বিপলু ধনরাশি রক্ষা করবার জন্য ব্যবস্থা করল।

সে মূসা (আ)কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সবার কাছে বলে বেড়াতে লাগল যে, মূসা (আ) নিজের লাভের জন্যই যাকাত দেয়ার প্রচলন করেছে। শুধু তাই নয়, সে কয়েকজন অসৎ লোককে প্রচুর উৎকোচ দিয়ে তাদের মাধ্যমে মূসা (আ) এর নামে মিথ্যে দুর্নাম, অভব্য ও অশ্লীল কথা ছড়াতে থাকে আর জোর গলায় আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ব্যক্ত করতে থাকে ।

কারূনের ব্যবহার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। "তাই আল্লাহর আদেশে একদিন হঠাৎ মাটি ধসে গেল এবং কারূন তার সমস্ত ধনরাশি ও অট্টালিকাসহ মাটির নিচে বিলীন হয়ে গেল। তার পক্ষে তখন আল্লাহ ছাড়া আর এমন কেউ ছিল না যে তাকে সাহয্য করতে পারে। আর সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।" (সূরা আল-কাসাস : ৮১)

"পূর্ব দিন যারা তার মতো হবার কামনা করছিল , তারা এখন বলতে লাগল, 'দেখলে তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা করেন, তার রিযিক বাড়িয়ে দেন। এবং যার জন্য ইচ্ছা কমিয়ে দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো! কাফিররা কখনও সফলকাম হয় না। (সূরা আল-কাসাস : ৮২)

www.pathagar.com

ফিরাউনের ঔদ্ধত্যের কারণে আল্লাহর তরফ থেকে আরও সাতটি নিদর্শন প্রেরণ

কারূনের অহমিকা, ঔদ্ধত্য ও আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের শোচনীয় পরিণতি দেখেও ফিরাউনের কোনো রকম শিক্ষা হলো না। সে ও তার লোকেরা আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা তো দূরের কথা, তারা তাঁর প্রেরিত রসূলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে ও বনী ইসরাইলদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। নিরুপায় হয়ে মূসা (আ) আল্লাহ তাআলার দরবারে ফরিয়াদ জানান। আল্লাহ তাঁকে এবার একের পর এক সাতটি নিদর্শন প্রেরণ করেন।

"প্রথম নিদর্শন বা মুজিযা এল অনাবৃষ্টি, খরা ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে। মিসরে কয়েক বৎসর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। অনাবৃষ্টির কারণে ফসলের মাঠ শুকিয়ে অনুর্বর হয়ে পড়ে। দেশ নিদারুণভাবে দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়। এ অবস্থায় ফিরাউন ও তার লোকেরা মূসা (আ) এর শরণাপন্ন হয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে ও বনী ইসরাইলদের মূসা (আ) এর সাথে চলে যেতে আর বাধা দেবে না।

মূসা (আ) এর দোয়ায় আল্লাহ মিসর থেকে দুর্ভিক্ষ দূর করে দিলেন। দুর্ভিক্ষ সরে গিয়ে সুদিন এলে ফিরাউন ও তার লোকেরা প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেল। অকৃতজ্ঞ লোকেরা বলাবলি করে, এ তো আমরা ভাল কাজ করেছি বলেই হয়েছে। আর দুরবস্থা যা হয়েছে, সেসব মূসা (আ) ও তার সঙ্গীদের কারণেই হয়েছে।

তারা প্রতিজ্ঞার কথা তো ভুলেই গেল, উপরন্তু মূসা (আ) কে কোনো রকম পরোয়া না করে বলতে শুরু করে, তুমি আমাদের উপর জাদু করবার জন্য যত রকম নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন, আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না।

ফিরাউনের এহেন ঔদ্ধত্যের কারণে আল্লাহ তাআলার আদেশে এবার সমগ্র মিসরে মুষলধারায় বৃষ্টি পাত, শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুৎ গর্জন ও বজ্রপাতসহ প্রবল বেগে ঝড় প্রবাহিত হতে থাকে। ঝড় ও প্লাবনে লোকালয়, কৃষিক্ষেত সব কিছুই বিধ্বস্ত হলো। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলার রহমতে বনী ইসরাইলদের বস্তি ও জমিজমা সব শুষ্ক ছিল। অথচ একই সময়ে ফিরাউন সম্প্রদায়ের বিরাট অট্টালিকা ও জমিজমা অথৈ পানির নিচে ডুবে গিয়েছিল।

মিসরবাসীদের আকুল আবেদনে ফিরাউন মূসা (আ) এর কাছে অনুনয় বিনয় করে বলে, তিনি যেন আল্লাহর কাছে দোয়া করে এই তুফান ও বন্যা অপসারিত করে দেন। সে আল্লাহর উপর ঈমান আনবে বলে আবারও প্রতিজ্ঞা করে।

মূসা (আ) এর আবেদনে ও দোয়ায় শেষ পর্যন্ত ঝড়, বন্যা ও বৃষ্টি সবই থেমে যায়। দেশ আবার শস্যশ্যামল হয়ে ওঠে। ফিরাউন এবারও তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে বলতে থাকে, আসলে এই ঝড়, বৃষ্টি কোনো আযাবই ছিল না। বরঞ্চ আমাদের ফসলের মাঠের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রাকৃতিক কারণেই ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। এতে মূসার কোনো কৃতিত্ব নেই। আর বনী ইসরাইলদের মুক্ত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

পরবর্তী অলৌকিক নিদর্শন হলো, আল্লাহ তাআলার হুকুমে সারা দেশ পঙ্গপালে ছেয়ে যায়। সেই পঙ্গপালও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী মিথ্যেবাদী ফিরাউনের কাকুতি মিনতিতে, মূসা (আ) এর দোয়ায় বিদূরিত হলো। কিন্তু ফিরাউন সেই আগের মতোই তার প্রতিজ্ঞার কথা অস্বীকার করে উদ্ধত ও অনমনীয়ই রয়ে গেল।

www.pathagar.com

এরপরেই আল্লাহ তাআলা নিদর্শন পাঠালেন উকুন। শুধু চুলে নয়, মানুষের সর্বশরীরে ও সর্বস্থানে উকুনের দংশনে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে। নানান রকম অসুখ দেখা দেয়।

ফিরাউনও তা থেকে বাদ গেল না। উপায় না দেখে ফিরাউন আবারও আগের মতোই প্রতিজ্ঞা করে ও বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর প্রতিজ্ঞার কথা আর মনে রাখে না।

এরপর আল্লাহ তআলা নিদর্শন পাঠালেন সারাদেশে অসংখ্য ব্যাঙের দৌরাত্ম্য দিয়ে। বাড়িঘর, আসবাবপত্র, রাস্তাঘাট সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে ব্যাঙ আর ব্যাঙ । ব্যাঙের উপদ্রবে দেশে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। এবারেও মূসা (আ) এর দোয়ায় দেশ থেকে অসংখ্য কুৎসিত ব্যাঙগুলো অপসারিত হলো । কিন্তু দুরাচারী ফিরাউনের মত বদলালো না।

পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা যে মুজিযাটি পাঠালেন, তা আরও ভয়ঙ্কর। সারা মিসরে রক্তের বন্যা বইতে থাকে। খাল-বিল, পুকুর নদীও কূপের পানি সবই রক্তে পরিণত হলো । বর্ণিত আছে, মূসা (আ) ও তাঁর লোকেরা যখন পানি পান করতেন, তখন তা স্বাভাবিক পানিই থাকত, কিন্তু ফিরাউন ও তার অনুসারীরা যখন পানি পান করতে যেত , তা তখনি রক্তে বদলে যেত।

অসহনীয় এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেই আগের মতোই ফিরাউন মূসা (আ) এর কাছে করুণভাবে আবেদন জানায় ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় । কিন্তু রক্তের আযাব দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথেই অকৃতজ্ঞ ফিরাউন তার নিজ মূর্তি ধারণ করে।" (সূরা আল-আরাফ : ১৩০-১৩৩)

সবশেষে শুরু হলো মিসরের ঘরে ঘরে নানান রকম সংক্রামক রোগ, মহামারী ও মৃত্যুর ভয়াবহতা। লোকের আর্ত কান্নায় মিসরের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। অগত্যা ফিরাউন মূসা (আ) এর কাছে শেষবারের মতো প্রতিজ্ঞা করে, মহামারীর বিভীষিকা থেকে মুক্ত হলে সে আর ওয়াদার বরখেলাপ করবে না।

মূসা (আ) এর অনুনয়ে আল্লাহ তাআলার কৃপায় দেশ থেকে মহামারী বিদূরিত হলো। কিন্তু ফিরাউন আগের মতোই অপরিবর্তিত রয়ে গেল।

"প্রতিটি আযাবের সময়ই ফিরাউন ও তার লোকেরা মূসা (আ) কে বলত, ওহে জাদুকর! তোমার প্রতিপালকের কাছে তুমি আমাদের জন্য তাই প্রার্থনা কর, যা তিনি তোমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন, তাহলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।" কিন্তু যখনই তাদের উপর থেকে আযাব দূর করে দেয়া হতো , তখনই তারা প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলত। (সূরা আয-যুখরুফ : ৪৯-৫০)

ফিরাউনের পতন ও মৃত্যু

ফিরাউন বারবার প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহর কাছে মূসা (আ) এর মাধ্যমে তাঁর দোয়ায় সব রকম আযাব থেকে পরিত্রাণ পেয়েও শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নি কিংবা বনী ইসরাইলদের ওপর অত্যাচার করা বন্ধ করে নি।

অবশ্য "তারা অন্যায় ও অহংকার করে ঐ নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলেও তাদের মন ঐগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।"(সূরা আন নমল : ১)

www.pathagar.com

মূসা (আ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত নিদর্শন পাঠিয়েছিলেন, তা দেখে মিসরের জনগণ তাদের দেবতা ও ফিরাউনের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়বে এই ভয়ে ফিরাউনের মনে সন্দেহ দেখা দিল । তাই সে তার লোকদের মন মূসা (আ) এর প্রতি বিরূপভাবাপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাদের ডেকে পাঠালো। "বলল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? আর এই যে দেশের মধ্য দিয়ে নদীগুলো বয়ে চলেছে যার ফলে দেশ শস্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, সেগুলো কি আমার অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমারা কি সেসব দেখছ না? এখন তোমরাই বলো, আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? আমি, না ঐ ব্যক্তি, যে নিতান্তই হীন যে স্পষ্ট করে কথা বলতেও পারে না ।"
(সূরা আয-যুখরুফ : ৫১-৫২)

এখানে মূসা (আ) এর ভাষার প্রসঙ্গে ফিরাউন যা বলেছে, তা নিতান্তই অযৌক্তিক। অতি শৈশবে তারই নিষ্ঠুর এক পরীক্ষার কারণে মূসা (আ) এর জিহ্বা পুড়ে গিয়ে ভাষার জড়তা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মূসা (আ) কে যখন আল্লাহ তাআলা নবুয়তের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর কাছে নিজের অন্যান্য বিষয়ের আবেদনের সাথে বলেছিলেন, "হে আমার প্রভু! আপনি আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, লোকের আমার কথা যেন বুঝতে পারে। " (সূরা ত্বাহা : ২৭-২৮) আল্লাহর দরবারে তা মঞ্জুর হয়েছিল।

"ফিরাউন তার লোকদের আরও বলল, মূসা হদি সত্যিই নবী হয়ে থাকে, তবে তাকে কেন সোনার বালা পরানো হয় নি? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী তার সাথে আসে নি কেন? এইভাবে ফিরাউন তার লোকদের নির্বোধ বানিয়ে হেয় জ্ঞান করেছে , এবং তারাও তার কথা মেনে নিয়ে অনুগত হয়ে পড়েছে।" (সূরা আয যুখরুফ: ৫৪)

"ফিরাউন ও তার লোকেরা পার্থিব জীবনের সম্পদ, ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের কারণে অত্যধিক দাম্ভিক হয়ে আল্লাহ তাআলার পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করে অন্যায়ের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। অতিষ্ঠ হয়ে মূসা (আ) আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানান, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের সম্পদ বিনষ্ট করে দিন । তাদের হৃদয় কঠিন করে দিন। তারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।"

আল্লাহ তাআলা বললেন, তোমাদের দোয়া কবুল, হলো। তোমরা সত্য পথে দৃঢ় থাক, আর কখনও অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করো না।"(সূরা ইউনুস : ৮৮-৮৯)
আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে বনী ইসরাইলদের সাথে নিয়ে মিসর পরিত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। আদেশ পেয়েই মূসা (আ) ও হারুন (আ) অত্যন্ত গোপনে বনী ইসরাইলদের এ খবরটা পৌঁছে দেন।

বনী ইসরাইলরা মিসরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। জানা যায় মেমফিস থেকে রামসিস পর্যন্ত এলাকার জুশান নামক অঞ্চলে তাদের অধিকাংশ লোকই বাস করত। তাদের সবাইকে গোপনে বলা হলো তারা যেন তাদের বহনযোগ্য যা কিছু আছে, সেসব নিয়ে যেন প্রস্তুত থাকে। নির্দিষ্ট এক রাতের অন্ধকারে তারা নবী মূসা (আ) এর সাথে পালিয়ে যাবে। বহু বছর ধরে তাদের পায়ে গোলামির শিকল বাঁধা রয়েছে। এ থেকে তারা মুক্তি পাবে, এ আনন্দে তারা আত্মহারা!

অতি সংগোপনে তারা মিসর ছেড়ে যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকে। "একদিন আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে ওহী পাঠালেন, রাতের মধ্যেই আমার বান্দাদের নিয়ে তুমি মিসর থেকে বের হয়ে যাও! তোমাদের পেছনে কিন্তু শত্রুরা ধাওয়া করবে।" (সূরা আশ-শুআরা : ৫২)

www.pathagar.com

আল্লাহর আদেশ পেয়েই মূসা (আ) বনী ইসরাইলদের কাছে সে সংবাদ পৌঁছে দেন। তারা চুপি চুপি নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে, যার যা অবস্থা অনুযায়ী উটের পিঠে সওয়ারি হয়ে বা পায়ে হেঁটে মূসা (আ) ও হারুন (আ) এর কাফেলার সাথে মিলিত হলো।

মূসা (আ) যখন তাঁর অনুসারী ও বনী ইসরাইলদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে মিসর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, ফিরাউন ও তার লোকেরা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

দীর্ঘ কাফেলা দ্রুত গতিতে লোহিত সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভয় ও ভাবনায় তারা অস্থির ! ফিরাউন ও তার দলবল পরদিন তাদের খবর জেনে না জানি কী করবে!

যদিও মূসা (আ) তাদের স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে আল্লাহই তাদের উদ্ধার করবেন, কিন্তু কীভাবে তা হবে তা তারা জানত না ।

পরদিন সকালে ফিরাউনের লোকেরা অবাক হয়ে দেখল ইসরাইলীদের ঘরবাড়ি সব শূন্য । খবরটা ফিরাউনের কানে যেতেই সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে । প্রধান সেনাপতি কে সৈন্য সামন্ত নিয়ে অতি সত্বর মূসা (আ) ও বনী ইসরাইলদের ধাওয়া করতে হুকুম দিল।

সৈন্য সামন্তের বিরাট বহর তৈরি হওয়ার সুযোগে মূসা (আ) ও তাঁর লোকেরা অনেকটা পথ এগিয়ে গেলেন । তাঁরা পূর্বদিকে লোহিত সাগরের কাছে চলে এসেছেন।

ফিরাউন তার বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁদের দিকে অত্যন্ত দ্রুত বেগে ধেয়ে আসছে ! শীঘ্রই দুই দল কাছাকাছি হলো । একদিকে বিরাট সাগর অন্যদিকে ফিরাউনের দুর্দান্ত সৈন্যদল!

মূসা (আ) এর সঙ্গীরা আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। আমরা যে ওদের হাতে ধরা পড়ে যাচ্ছি! মৃত্যু ছাড়া আমরা এখন আর কোনো পথ দেখছি না! সে সময়ে কী করতে হবে মূসা (আ) এর তাও জানা ছিল না। কিন্তু ধৈর্যের পাহাড় হয়ে তিনি আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, কক্ষনও না। আমার সাথে আল্লাহ আছেন। তিনি আমাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন।"(সূরা আশ-শুআরা : ৬১-৬২)

তিনি তাদের আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস রেখে সামনে এগিয়ে যেতে বললেন ।

"আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে মূসা (আ) কে আদেশ করলেন, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত কর। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আ) তাঁর লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করলেন। আর সাথে সাথেই সমুদ্র দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ এক একটি বিশাল পাহাড়ের মতো হয়ে গেল ।" (সূরা আশ-শুআরা : ৩৬)

দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি পথ তৈরি হলো। মূসা (আ) ও তাঁর সহযাত্রীরা আল্লাহ তাআলার এই অলৌকিক ঘটনা দেখে তাঁকে শুকরিয়া জানিয়ে, সেই পথের মধ্য দিয়ে চলতে থাকেন।

ফিরাউন ও তার দলের লোকেরা এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে যায়! অগ্রপশ্চাৎ কিছু না ভেবে তারাও সেই পথ ধরে ইসরাইলীদের ধরার জন্য দ্রুতগতিতে তাদের অশ্ব চালনা করে।

"ততক্ষণে ইসরাইলীরা আল্লাহর রহমতে লোহিত সাগর পার হয়ে অপর তীরে পৌঁছে গেছে। তবুও ফিরাউন ও তার সৈন্যদল ঔদ্ধত্য সহকারে ইসরাইলীদের ধরে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের পেছনে পেছনে ছুটে আসে।

www.pathagar.com

ঠিক তখনই পাহাড় সমান পানির দেওয়াল ভেঙে গেল। দুই দিক হতে বিপুল জলরাশি মিলিত হয়ে পূর্বের মতোই সীমাহীন সাগরের সৃষ্টি হলো। সাগরের উত্তাল জলতরঙ্গে ফিরাউনের সৈন্যসামান্ত সব ডুবে মরে গেল।

ফিরাউন গভীর জলে তলিয়ে যেতে যেতে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাইল (রা) যাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জবাব এল, এই শেষ মুহূর্তে তুমি ঈমান এনেছ! অথচ একটু আগেও তুমি ছিলে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের মধ্যে একজন। তোমার এই অন্তিম মুহূর্তের আনুগত্য গ্রহণযোগ্য নয়। আজ আমরা তোমার দেহটাকেই শুধু রক্ষা করব, যেন সেটা তোমার পরবর্তী বংশধরদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে।" (সূরা ইউনুস : ৯০-৯২)

"মিসর সম্রাট দ্বিতীয় রামসিস দুর্দান্ত ফিরাউন যাকে 'মূসার ফিরাউন' বলা হয়েছে, তার মৃতদেহ সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমানে ঐ স্থানটিকে বলা হয় 'ফিরাউন পর্বত'। কাছে একটি উষ্ণ কূপ রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা একে 'ফিরাউনের হাম্মাম' বলে। তারা নির্দিষ্টভাবে বলে যে, এখানেই ফিরাউনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। তার মমি করা লাশ বর্তমানে কায়রোর জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটিন ইলিয়ট স্মিথ ঐ মমির উপর থেকে যখন আচ্ছাদন খুলে ফেলেছিলেন, তখন সে লাশের উপর লবণের একটা পুরু স্তর জমাট থাকতে দেখা গিয়েছিল। এটা লবণাক্ত পানিতে ডুবে মরার নিদর্শন।" (সূত্রঃ তাফহীমুল কুরআন)

মুক্ত বনী ইসরাইলদের যাত্রা শুরু

ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সবাই লোহিত সাগরে ডুবে মরে যাবার পর আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ) কে মুক্ত বনী ইসরাইলদের নিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি দেয়া ভূখণ্ডে শস্য শ্যামল, বৃক্ষরাজি পরিবৃত উদ্যান ও ঝরনা শোভিত পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন।

মুক্ত বনী ইসারাইলদের যাত্রা শুরু হলো। কিন্তু ফিরাউনের আরোপিত নিগৃহীত জীবন থেকে বের হয়ে এসেও তাদের মন মানসিকতা ফিরাউনের প্রভাব মুক্ত হতে পারে নি।

বছরের পর বছর ধরে ফিরাউনরা তাদের আত্মাকে অবদমিত করে রাখার ফলে তাদের স্বভাবের ওপর একটা কালো ছায়া পড়েছে। এতদিন ধরে তারা ফিরাউন ও অন্যান্য মনিবদের সিজদা করতে ও বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা করতে অভ্যস্ত হয়েছে । নিজেদের তারা নীচ, হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করতেই শিখেছে।

যাত্রাপথে তাদের অজ্ঞ স্বভাবের কারণে তারা মূসা (আ) কে অনেক বিষয় নিয়ে উত্যক্ত করতে থাকে। "বনী ইসরাইলরা যে স্থান থেকে সাগর অতিক্রম করেছিল, সম্ভবত তা বর্তমান সুয়েজ ও ইসমাইলিয়ার মধ্যবর্তী কোনো স্থান হবে। সেখান থেকে তারা সিনাই প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পথে 'মাফকা' নামক স্থানে মিসরীয়দের একটি প্রকাণ্ড মূর্তিঘর ছিল। এর কাছাকাছি আর একটি স্থানে সামীয় জাতিদের চন্দ্রদেবীর মূর্তিঘর ছিল।" সূত্র (তাফহীমুল কুরআন) বনী ইসরাইলরা এগিয়ে যাবার সময় কোনো এক জাতির লোকদের কাছে এসে পৌঁছল। দেখল, তারা কতকগুলো মূর্তির সামনে পূজা অর্চনায় রত। (সূরা আল-আরাফ : ১৩৮)

www.pathagar.com

এই দৃশ্য দেখে বনী ইসরাইলদের অতীতে জাঁকজমক করে মূর্তি পূজা করার কথা মনে পড়ে গেল। ফিরাউনের রাজত্বে তারা যেভাবে পূজা করত, সেইভাবে পূজা করতে তাদের মন ব্যাকুল হলো।

বহুদিনের কুঅভ্যাস ও কুসংস্কার তাদের সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। "তারা মূসা (আ) কে বলল, আপনি এদের দেবতাদের মতো আমাদের একটি দেবতা গড়িয়ে দিন। এদের এহেন অন্যায় আবদারে মূসা (আ) মনে খুবই আঘাত পেলেন। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, তোমরা দেখছি আগের মতো মূর্খ সম্প্রদায়ই রয়ে গেছ! জেনে রেখো, এই মূর্তি পূজারীরা যাতে লিপ্ত রয়েছে তা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক। আর প্রকৃত আল্লাহ তাআলাকে ছাড়া আমি কী করে তোমাদেরকে অন্য উপাস্যের সন্ধান দিতে পারি? অথচ তিনিই তোমাদেরকে সমস্ত বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

মূসা (আ) তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অপার করুণার কথা মনে করিয়ে বলেন, তোমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি যে, ফিরাউনের লোকদের হাত থেকে আল্লাহ তাআলাই তোমাদের রক্ষা করেছেন, যখন ফিরাউন তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তোমাদের পুত্র সন্তানদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত, আর মেয়েদের হীন উদ্দেশ্যে জীবিত রাখত।" (সূরা আল-আরাফ : ১৩৮-১৪১)

আশ্চর্য! কী করে তোমরা সেসব এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে।

অনেক দিন, অনেক রাত, দিনে প্রখর সূর্যকিরণে ও রাতে হিমশীতল মরুভূমির মধ্য দিয়ে তারা পথ চলছে। কয়েক মাস পাড়ি দিয়ে মূসা (আ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সিনাই উপদ্বীপের তীহ্ পান্তরে এসে থামলেন। বহুদিন ধরে পথ চলতে চলতে মূসা (আ) এর সঙ্গীরা ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

এখানকার মরুময় ময়দানে, রোদ্রের উত্তপ্ত তাপে, বৃক্ষলতা বর্জিত স্থানে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখে তারা নবীর কাছে নানান রকম অভিযোগ করতে থাকে । মূসা (আ) তাদের জন্য দু হাত তুলে আল্লহ্ তাআলার কাছে খাদ্য ও ছায়া প্রার্থনা করেন।

"আল্লাহ তাআলার আদেশে আকাশ মেঘে ছেয়ে যায়। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে তারা রক্ষা পায়। আর তিনি তাদের জন্য হালকা বরফের মতো সুমিষ্ট খাদ্য মান্না ও সালওয়া নামক এক প্রকার পাখির গোশত আহার্যরূপে দান করলেন।" (সূরা আল-বাক্বারা : ৫৭)

"মূসা (আ) এর সঙ্গীরা পিপাসার্ত হলে, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে পানি প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করলেন, তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো। মূসা (আ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাই করলেন। ফলে তা থেকে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত হলো। বনী ইসরাইলদের বারোটি গোত্র নিজ নিজ ঝরনা চিনে নিল।" (সূরা আল-বাক্বারা :৬০)

আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলদের অনেক রকম অনুগ্রহ করেছিলেন। তবু তারা সেসব নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। তারা মাঝে মাঝেই মূসা (আ) এর কাছে তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছিল।

"একদিন তারা মূসা (আ) কে জানালো যে, একই রকম খাবারের স্বাদ আর তাদের ভাল লাগছে না। তারা মিসরে যে ধরনের খাদ্যে অভ্যস্ত ছিল, সেইসব খাদ্য খেতে ইচ্ছুক হলো। বলল, আপনি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন, তিনি যেন জমিতে শাক-সবজি, শসা, গম, রসুন, পিঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দেন । মূসা (আ) তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমরা দেখছি ভাল জিনিসের বদলে খারাপ জিনিস নিতে চাচ্ছ! যদি তাই চাও, তবে এখান থেকে কোনো নগরে তোমরা নেমে যাও! সেখানে তোমরা যা চাও, তাই পাবে।" (সূরা আল-বাক্বারা : ৬১)

মূসা (আ) আরও বললেন, বুঝতে পারছি, তোমরা খুবই লোভী আর অকৃতজ্ঞ। তোমরা যে কত বড় দুর্যোগের হাত থেকে রেহাই পেয়েছ, ফিরাউনের কবল থেকে মুক্ত হয়েছ, তার জন্য কৃতজ্ঞ না হয়ে

www.pathagar.com

সেই আগের মর্যাদাহীন ও নির্যাতিত জীবনেই যেন ফিরে যেতে চাচ্ছ! এর চেয়ে আক্ষেপের কথা আর কী হতে পারে? কিন্তু এতে তারা লজ্জিত বা অনুতপ্ত কেনোটাই হলো না। তারা সারাক্ষণই তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশই করতে থাকে। তাদের নিত্য নতুন অভিযোগেরও সীমা থাকে না।

মূসা (আ) খুবই ব্যথিত হলেন যখন বুঝতে পারলেন যে, এই বনী ইসরাইলদের ঈমানের কোনো জোর নেই।

মূসা (আ) এর তাওরাত প্রাপ্তি

বনী ইসরাইলরা যখন মূসা (আ) কে নানান রকম অন্যায় আবদার করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল, এ সময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বনী ইসরাইলদের জীবন-যাপন প্রণালী ও আইন সম্বলিত ধর্মগ্রন্থ দেওয়ার জন্য সিনাই পর্বতে যেতে আহ্বান করেন। "এই জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে ত্রিশ রাত্রি ওপরে আরও দশ রাত্রি বাড়িয়ে, মোট চল্লিশ রাত্রির সময় নির্ধারিত করে দেন ।" (সূরা আল-আরাফ : ১৪২)

চল্লিশ দিন ও রাত্রির মেয়াদ ঠিক করা হয় এই জন্য যে, এই ক দিন তিনি রোযা রেখে, রাত দিন ইবাদত বন্দেগি করে, তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও মনকে একনিষ্ঠভাবে নিবদ্ধ রেখে(তাঁর প্রতি যে গুরুত্ব) দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, তার জন্য যেন পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

যাবার আগে "তিনি তাঁর ভাই হারুন (আ) কে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে আপনি আমার সম্প্রাদায়ের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব ও তাদের সংশোধন করবেন, আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মত অনুসারে যেন চলবেন না!" (সূরা আল আরাফ : ১৪২)

মূসা (আ) চল্লিশ দিন রোযা রেখে ও আল্লাহ তাআলার ধ্যানে নিমগ্ন থাকার পর "তাঁর নির্দেশিত স্থানে এসে হাজির হলেন। আল্লাহ তাঁর সাথে বাক্যালাপ করলেন। এতে তাঁর মনের তৃষ্ণা মিটল না। তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভু! দয়া করে আপনি আমাকে দেখা দিন! আপনাকে আমি এক নজর দেখতে চাই।

আল্লাহ তাআলার জবাব শোনা গেল, তুমি কোনো রকমেই আমাকে সরাসরি দেখতে পাবে না। নিতান্তই যদি দেখতে চাও, তবে সামনের পাহাড়টির দিকে তাকাও! যদি সেটি নিজ স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তবেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।

যখন আল্লাহ তাআলা পাহাড়টির উপর তাঁর নূরের সামান্য একটু জ্যোতি বিকিরণ করলেন, তখনই পাহাড়টি চূর্ণ- বিচূর্ণ হয়ে গেল। মূসা (আ) অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হবার পর মূসা (আ) বুঝতে পারলেন যে, তিনি অন্যায় আবদার করেছেন। তিনি তক্ষুনি আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, হে আল্লাহ! আপনার সত্তা সত্যিই পবিত্র। আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আর আমিই সর্বপ্রথম আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো, হে মূসা! আমি সকল লোকের মধ্যে তোমাকেই রিসালাত প্রদান করার জন্য মনোনীত করেছি। আর আমার সাথে বাক্যলাপ করার বৈশিষ্ট্যও আমি তোমাকেই দিয়েছি। কাজেই যা কিছু তোমাকে দান করলাম তুমি কৃতজ্ঞতার সাথে তা গ্রহণ কর।

আর আমি কয়েকটি পাথরের ফলকের ওপর বনী ইসরাইলদের জন্য সব রকম আদেশ-উপদেশ ও সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা লিখে দিলাম। তুমি দৃঢ়ভাবে এগুলো ধারণ কর, আর তোমার লোকদের আদেশ কর তারা যেন এর মধ্যে যা উত্তম তাই যেন গ্রহণ করে। (সূরা আল আরাফ : ১৪৩-১৪৫)

আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে দেওয়া তাওরাতে অন্যান্য বিষয়য়ের মধ্যে দশটি আদেশ তাঁর উম্মতদের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

তাওরাত বিশেষজ্ঞ আলেম কাবে আহবার যিনি প্রথমে ইহুদী ছিলেন ও পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা তাওরাতে যে দশটি বিষয় নিষেধ করেছেন, সেই দশটি বিষয় কুরআন মজীদের 'সূরা আনআম এর ১৫১ ও ১৫২ আয়াতে ঠিক তেমনিভাবে নিষেধ করেছেন।" আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সেই দশটি বিধি নিষেধ যেভাবে উল্লেখ করেছেন, তা হলো:

১। আল্লাহ তাআলার সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করো না।

২। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

৩। নিজেদের সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিয়ে থাকি।

৪। অশ্লীল কাজের কাছেও যেও না, তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনেই হোক ।

৫। ন্যায্য কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে হত্যা করো না।

৬। যে পর্যন্ত না এতিমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তাদের ধন-সম্পত্তির সুব্যবস্থাকরণ ছাড়া সে সম্পত্তির কাছে যাবে না।

৭। পরিমাপ ও ওযন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে।

৮। আমি কোনো মানুষকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট প্রদান করি না।

৯। আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য কথা কলবে, এমনকি তা তোমার আত্মীয়ের সম্পর্কে হলেও।

১০। এবং আল্লাহ তাআলার সাথে কোনো অঙ্গীকার করলে তা অবশ্যই পূরণ করবে।

সামেরীর ঘটনা

মূসা (আ) পাহাড়ে 'তাওরাত' আনতে চলে যাবার পর সামেরী নামক এক অবিশ্বাসী স্বর্ণকার বনী ইসরাইলদের বিভ্রান্ত করার সুযোগ নেয়।

• হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে,"যে সময় ফিরাউন দ্বিতীয় রামসিস শিশু পুত্রদের হত্যার আদেশ দিয়েছিল, তখন মূসা (আ) এর জন্ম হয়েছিল। সামেরীর জন্মও তখনই হয়েছিল। সামেরীর মা ফিরাউনের সৈন্যদের ভয়ে শিশু সামেরীকে গভীর জঙ্গলের একটা গর্তে রেখে আসেন।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জিবরাঈল (আ) শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। মা-বাবা জানতেন না ছেলেটি বেঁচে আছে, না মরে গেছে। কিছুটা বড় হলে জিবরাঈল (আ) ছেলেটিকে তার মা-বাবার বাসার কাছে রেখে দিয়ে চলে যান। মা-বাবা তাদের ছেলেকে চিনতে পেরে পরম আগ্রহে কোলে তুলে নেন। এই ছেলেটিই বড় হয়ে প্রসিদ্ধ স্বর্ণকাররূপে পরিচিত হয়।

কেউ বলেন, সামেরী ফিরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে মূসা (আ) এর প্রতিবেশী ছিল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সে কুফর অবলম্বন করে বনী ইসরাইলদের কুপথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

সামেরী জিবরাঈল (আ) কে ভালভাবেই চিনত। মূসা (আ) এর সাথে বনী ইসরাইলরা যখন আল্লাহ তাআলার অলৌকিক নিদর্শনে লোহিত সাগরের মধ্যে শুষ্ক পথ ধরে অপর পারে চলে যাচ্ছিল, তখন তাদের সাথে সামেরীও ছিল। ফিরাউন তার দুর্ধর্ষ সৈন্যদের নিয়ে যখন সেই শুকনো পথ দিয়ে বনী ইসরাইলদের ধরবার জন্য তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছিল, তখন আল্লাহর নির্দেশে জিবরাঈল

www.pathagar.com

(আ) তাঁর ঘোড়াসহ ফিরাউন ও বনী ইসলাইলদের মধ্যে একটা অবস্থান নিয়েছিলেন, যেন ফিরাউনের দল বনী ইসরাইলদের ধরে ফেলতে না পারে। সে সময় সামেরী জিবরাঈল (আ) কে দেখেছিল, কিন্তু অন্য কেউ দেখে নি। সামেরী এক সুযোগে জিবরাঈল (আ) এর ঘোড়ার খুরের নিচের কিছুটা মাটি যোগাড় করে রেখেছিল। সে জানতে পেরেছিল যে, জিবরাঈল (আ) এর ঘোড়ার পায়ের নিচের মাটির অলৌকিক গুণ রয়েছে। যেখানেই এই মাটি পড়ে, সেখানেই প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি হয়।" (সূত্র : কোরআনের কাহিনী)

"মূসা (আ) এর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সামেরী বনী ইসরাইলদের কাছ থেকে তাদের জন্য একটি দেবতা তৈরি করে দেবে বলে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ করে। সংগৃহীত সেই স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে বনী ইসরাইলদের সহয়তায় একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি করল। মূর্তিটার ভেতর ঐ মাটি ছিটিয়ে দেবার পর, তাদের মনে হলো, তার ভেতর থেকে গরুর ডাকের মতো হাম্বা রব বের হচ্ছে। তারা খুব খুশি হয়ে সোনার বাছুরটাকে তাদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করল।" (সূরা আল-আরাফ : ১৪৮)

হারুন (আ) এতে অত্যন্ত মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হলেন। "মূসা (আ) ফিরে আসার আগেই তিনি বনী ইসরাইলদের ভালভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, তারা সামেরীর দ্বারা প্রতারিত হয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছে। সোনার বাছুর নয়, আল্লাহ তাআলাই সবার উপাস্য । কাজেই তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, আর আমি যে আদেশ করি তা মান্য করে চলো। জবাবে তারা বলল, মূসা (আ) আমাদের মধ্যে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা বাছুর পূজা কিছুতেই ছেড়ে দেবো না।" (সূরা ত্বাহা : ৯০-৯১)

"মূসা (আ) আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ 'তওরাত' নিয়ে বনী ইসরাইলদের কাছে ফিরে এলেন।" (সূরা আল-বাক্বারা : ৫৩)

এসে দেখেন এই চল্লিশ দিনের মধ্যেই বনী ইসরাইলরা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গিয়ে বাছুর পূজায় নিমগ্ন হয়ে গেছে। তারা বাছুরের মূর্তিটার চারপাশ ঘিরে আনন্দে নৃত্য-গীত করছ। "তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার হয়ে এই রকম নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করছে? তোমরা কি আল্লাহর আদেশ পাওয়া পর্যন্ত একটুও ধৈর্যধারণ করতে পারলে না?

তিনি তাদের জন্য বিধি-নিষেধ সম্বলিত যে প্রস্তর ফলকগুলো এনেছিলেন, মনের দুঃখে সেগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। এরপর হারুন (আ) কে স্পর্শ করে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাঁর কাছে জবাবদিহি চাইলেন। হারুন (আ) বললেন, শোনো ভাই! তোমার অবর্তমানে আমি ওই লোকদের অনেক হিতোপদেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা আমাকে দুর্বল মনে করে আমার কথার কোনো মূল্যই দেয় নি। উপরন্তু তারা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কাজেই তুমি আমাকে শত্রুদের সামনে হাস্যাস্পদ করো না আর আমাকে পাপীদের মধ্যে গণ্য করো না।

মূসা (আ) এর ক্রোধ অবদমিত হলে তিনি তাঁর ভাইয়ের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তিনি নিজের ক্রোধ দমন করতে পারেন নি বলে এবং ভাই লোকদের মূর্তি-পূজা থেকে বিরত রাখতে অক্ষম হয়েছে বলে আল্লাহ তাআলার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন । আর পাথরের ফলকগুলো যত্ন করে তুলে নিলেন।" (সূরা আল্-আরাফ : ১৫০-১৫১)

এবার তিনি সামেরীর দিকে ফিরলেন। "সামেরী! তোমার ব্যাপার কী ? কেন তুমি এ কাজ করলে? জবাবে সামেরী এমন ভাব দেখালো যে, অন্যান্য লোকদের চেয়ে সে অনেক বেশি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। বলল, আমি লোহিত সাগর পার হওয়ার সময় এমন একটা কিছু দেখেছিলাম, যা অন্য কেউ দেখে নি। আমি জিবরাঈল (আ) কে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখেছিলাম। আমি তাঁর ঘোড়ার খুরের নিচের এক

www.pathagar.com

মুঠো মাটি সরিয়ে রেখেছিলাম। তারপর বাছুরের সোনার মূর্তি তৈরি করার পর সেটার মুখের ভেতর আমি তা ছুড়ে মেরেছিলাম।

সে কেন পূজা করার জন্য বাছুরের মূর্তি তৈরি করেছিল, সে কথার জবাব না দিয়ে বাহাদুরের মতো বলল, আমার মন আমাকে এই অনুপ্রেরণাই দিয়েছিল, তাই আমি এসব করেছিলাম।

মূসা (আ) তার এহেন জবাবে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। বললেন, তুমি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও! এখন থেকে সারা জীবনের জন্য গোটা সমাজের সাথে তোমার সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হলো। তুমি আজ থেকে শরীরে সারাক্ষণ আগুনের জ্বালা অনুভব করবে। আর সবাইকে তুমি বলে বেড়াবে, আমি অস্পৃশ্য। আমাকে কেউ ছুঁয়ো না! আর ভবিষ্যতেও নির্দিষ্ট কালে তোমার ওপর যে শাস্তি র ব্যবস্থা রয়েছে, তাও কখনো সরে যাবে না। এখন তোমার ঐ উপাস্য যার পূজায় তুমি এতদিন রত ছিলে, তাকে আমি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে বিক্ষিপ্ত করে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছি।

এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত সবাইকে উপলক্ষ করে বললেন, বাছুরের মূর্তি নয়, তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।

আর জেনে রেখো, সব কিছুই তার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রয়েছে।" (ত্বাহা : ৯৫-৯৮)

বনী ইসরাইলদের সত্তরজন প্রতিনিধির আল্লাহর দর্শন অভিলাষের পরিণতি

"মূসা (আ) বনী ইসরাইলদের মধ্য থেকে সত্তরজনকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করলেন, এই উদ্দেশ্যে যে, তারা বাছুরের মূর্তিকে উপাস্য করার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইবে ও নতুন করে সবাই আনুগত্যের শপথ নেবে। মূসা (আ) তাদের নিয়ে নিদিষ্ট স্থান-সিনাই পর্বতে যাবেন বলে স্থির করেন।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৫)

সত্তরজন প্রতিনিধিকে নিয়ে মূসা (আ) তূর সিনাই পাহাড়ে এলেন। এসে মূসা (আ) আল্লাহ তাআলার সাথে সরাসরি কথা বলতে থাকেন। প্রতিনিধিরা লক্ষ্য করলেন যে, কথাগুলো একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে ভেসে আসছে। তাঁরা নিজ কানে আল্লাহ তাআলার সাথে মূসা (আ) এর বাক্যালাপ শুনলেন। শুনে তাঁরা মূসা (আ) কে বললেন, দেখুন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে নিজের চোখে না দেখব, আমরা আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করব না।" (সূরা আল-বাক্বারা : ৫৫)

মূসা (আ) তাঁদের এই অন্যায় থেকে বিরত থাকতে বললেন। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই তা মানতে রাজি হলো না। অগত্যা তিনি আল্লাহর কাছে তাদের আবদারই পেশ করলেন। আল্লাহর দরবারে তা গৃহীত হলো । কিন্তু "এসময় মহান আল্লাহ তাআলার মহাশক্তির ক্ষীণ জ্যোতি বিদ্যুৎঝলকসহ প্রচণ্ড এক বজ্র এসে তাদের গ্রাস করল। ফলে তাদের মৃত্যু হলো।" (সূরা আল-বাক্বারা : ৫৫)

আচমকা এ ঘটনা দেখে মূসা (আ) মর্মাহত হয়ে পড়লেন। "আল্লাহ তাআলার দরবারে কাতর হয়ে মিনতি করেন, হে আল্লাহ! এই নির্বোধ লোকগুলি যা করেছে তার জন্য আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন না। আপনি ইচ্ছে করলে আগেই এদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করে দিতে পারতেন। এখন এই সত্তরজন প্রতিনিধিদের রেখে আমি যদি একা আমার লোকদের কাছে ফিরে যাই তারা বলবে, আমিই এদের হত্যা করেছি। তারা তাওরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা বুঝবে না যে, এটা

www.pathagar.com

আপনার একটা পরীক্ষা । আপনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন ও যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন। আপনিই আমাদের রক্ষাকারী। আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থী! আপনি অনুগ্রহ করে ঐ সত্তরজন লোকের জীবন ফিরিয়ে দিন।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৫)

"এরপর আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) এর আন্তরিক অনুরোধে সেই সত্তরজনকে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ হবার সুযোগ দিয়ে আবার তাদের জীবন দান করেছিলেন।" (সূরা আল-বাক্বারা : ৫৬)

খিযির (আ) এর কাছে মূসা (আ) এর আগমন

তফসীরকারদের মতে "আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে খুব সম্ভব নবুয়্যতের প্রথম পর্যায়ে কিছু অদৃশ্য জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানী সাধক খিযির (আ) এর কাছে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।"

"একদিন মূসা (আ) বনী ইসরাইলদের সমাবেশে এক চিত্তাকর্ষক ভাষণ দিচ্ছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর নবী, এ পৃথিবীতে আপনার চেয়েও জ্ঞানী ও শিক্ষিত কেউ আছেন কি?

নবী (আ) এর জানা মতে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিলেন না। তিনি ভাবলেন, আল্লাহ তাআলা তাকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন, আর তাকেই সম্মান করে ধর্মগ্রন্থ তাওরাত দিয়েছেন। তিনিই তাহলে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী হবেন। তাই বললেন, না, আমার চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ নেই।

আল্লাহ তাআলা তাঁর অতি কাছের বান্দাদের বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তিনি মূসা (আ) কে ওহী দ্বারা জানালেন যে, তাঁর ঐ ধরনের জবাব দেওয়া উচিত হয় নি। কেননা কোনো মানুষই সর্ব বিষয়ে জ্ঞান সমৃদ্ধ হতে পারে না। এক জনের চেয়ে অন্যজন অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে।

তারপরেই বললেন, আমার অগাধ ও অনন্ত সৃষ্টি কৌশল সম্বন্ধে যদি জানতে চাও, তবে দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার এক বিশিষ্ট সেবককে দেখতে পাবে। সে কোনো কোনো বিষয়ে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।

মূসা (আ) লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি কীভাবে, কোথায় তাঁর সাক্ষাৎ পাবো? গায়েবি আওয়াজ হলো, তুমি সাথে একটা পাত্রে জীবন্ত মাছ নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হও। এরপর চলতে চলতে যেখানে মাছটা অদৃশ্য হয়ে যাবে, সেখানেই সেই মহাজ্ঞানীর সাক্ষাৎ পাবে।

মূসা (আ) খিযির (আ) এর সথে দেখা করবার জন্য তার প্রিয় খাদেম ইউশা ইবনে নূনকে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে রওয়ানা দিলেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

"মূসা (আ) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ইউশাকে বললেন, দেখ ইউশা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দু টি সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌঁছব, আমি কিন্তু অনবরত চলতেই থাকব।" (সূরা আল-কাহফ : ৬০-৬১)

"দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল বলতে কোন স্থানের কথা বলা হয়েছে, তা কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদি দৃষ্টে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তবে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে সে স্থানটির কথা নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন।" (তফসীরে কুরতুবী)

www.pathagar.com

মূসা (আ) এর এই সফর মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই শুরু হয়েছিল। "মূসা (আ) ও তাঁর সঙ্গী চলতে চলতে এমন একটি স্থানে পৌঁছলেন, যেখানে দুটি সাগর মিলিত হয়েছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন বলে তাঁরা এখানে থামলেন । ক্লান্ত মূসা (আ) একটি পাথরের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময়ে তাঁর সঙ্গী দেখলেন যে, মাছটি পাত্র থেকে লাফিয়ে উঠে সুড়ঙ্গের মতো একটা পথ সৃষ্টি করে সাগরের দিকে চলে গেল।

এই ঘটনাটা তিনি মূসা (আ) কে বলতে একেবারেই ভুলে গেলেন! এরপর তাঁরা সামনের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেলেন । দূরবর্তী সফরের কারণে মূসা (আ) তখন অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। তিনি ইউশাকে কিছু নাশতা আনতে বললেন।

নাশতার প্রসঙ্গে ইউশার মাছটির কথা মনে পড়ে গেল। তিনি লজ্জিত ও কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, আমি আপনাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমরা যখন ঐ পাথরের উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, আর আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন আমার চোখের সামনেই মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ ধরে সাগরের দিকে চলে গিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দেবার কারণে আমি মাছটির কথা আপনাকে বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।

মূসা (আ) বলে উঠলেন, ওটাই তো সে স্থান, যা আমি অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা যে পথে এসেছিলেন, সেই পথেই নিজেদের পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে ফিরে চললেন।

এবার তাঁরা যাঁকে খুঁজছিলেন, তাঁকে পেয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে একজন। খিযির (আ) ছিলেন নবী নূহ (আ) এর বংশধর। তাঁর জন্ম মিসরেই। পিতার চেষ্টায় খিযির (আ) উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব সময়ই আল্লাহ তাআলার আদেশ পেয়েছিলেন।

মূসা (আ) তাঁকে সালাম জানিয়ে বিনীতভাবে বললেন, জনাব, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন-এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করতে পারি কি?

খিযির (আ) তাঁর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, দেখুন, আপনি আমার সাথি হবার মত ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আর যে বিষয়টি আপনার জ্ঞানের সীমার বাইরে, সে বিষয়ে আপনি কী করেই বা ধৈর্যধারণ করবেন?

মূসা (আ) নম্র স্বরে বললেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন! আর দেখবেন, আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করব না।

খিযির (আ) তখন সম্মত হলেন। বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যদি আমার সাথে যেতেই চান, তবে কোনো বিষয় আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে আপনাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলি।

এবার তাঁরা চলতে শুরু করেন। পথিমধ্যে তাঁর একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। খিযির (আ) নৌকাতে উঠেই সেটাতে একটা ছিদ্র করে দিলেন।

মূসা (আ) অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, আপনি কি নৌকার আরোহীদের ডুবিয়ে মারার জন্য এই ছিদ্র করে দিলেন? আপনি তো ভয়ঙ্কর একটা খারাপ কাজ করে ফেললেন! খিযির (আ) বললেন, আমি কি বলিনি যে আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না !

মূসা (আ) লজ্জিত হয়ে বললেন, আমি ভুল করে ফেলেছি। সে জন্য দয়া করে আমাকে ভর্ৎসনা করবে না। আর আমার ব্যাপারে দয়া করেই বেশি কঠোর হবেন না!

www.pathagar.com

এরপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে আবার চলতে শুরু করেন। পথে একটি বালককে দেখতে পেলেন। খিযির (আ) করলেন কি, নিজের হাতে বালকটির মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

বালকটিকে এভাবে হত্যা করতে দেখে মূসা (আ) ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। এ কী করলেন! একটি নিষ্পাপ বালককে এভাবে মেরে ফেললেন! অথচ সে তো কাউকে হত্যা করে নি! আপনি তো দেখছি খুব বড় রকমের একটা অন্যায় করে ফেললেন!

খিযির (আ) আবারও বললেন, আমি কি আপনাকে বলি নি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। মূসা (আ) হাতজোড় করে মাফ চাইলেন। বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো কিষয় প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। সত্যি,আমাকে নিয়ে আপনি আপত্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছেন।

তাঁরা আবার চলতে থাকেন । এবার তাঁরা একটি জনবসতিতে এসে পৌঁছলেন।

তাঁরা তখন খুবই ক্ষুধার্ত। তাই সেখানকার লোকদের কাছে তাঁরা খাবার চাইলেন। কিন্তু ঐ লোকেরা আতিথেয়তা করতে রাজি হলো না। সেখানে তাঁরা একটি জীর্ণ দেয়াল দেখতে পেলেন। দেয়ালটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। খিযির (আ) কষ্ট স্বীকার করে নিজ হাতে সেটি খাড়া করে দিলেন। এ দেখে মূসা (আ) বলে ফেললেন, আমরা এখানকার লোকদের কাছে খাবার চাইলাম, তারা তা দিল না। অথচ আপনি তাদের এত বড় একটা কাজ করে দিলেন! আপনি ইচ্ছে করলেই এ কাজের জন্য মজুরি নিতে পারতেন!

খিযির (আ) বললেন, বাস, এখানেই আপনার ও আমার সহযাত্রা শেষ হয়ে গেল। যা হোক এখন যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরে থাকতে পারেন নি, সেই সব বিষয়ের তাৎপর্য আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। শুনুন! প্রথমে সেই যে নৌকাটি, সেটি ছিল কয়েকজন গরিব লোকের। তারা নদীতে ঐ নৌকাটি চালিয়ে তাদের জীবিকা অর্জন করত। ওদিকে এক অত্যাচারী রাজা মাঝিদের নিখুঁত নৌকাগুলো সব জোর করে কেড়ে নিত। কাজেই আমি গরিব লোকদের নৌকাটি খুঁত করে দিলাম এইজন্য যে, খুঁত দেখে রাজা আর ওই নৌকাটি নেবে না।

আর ঐ যে বালক, তার পিতামাতা ছিলেন আল্লাহ তাআলার উপর গভীর বিশ্বাসী। আমার আশঙ্কা হলো এই ছেলেটি ভবিষ্যতে তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করবে ও আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে তাঁদের মনে কষ্ট দেবে। কাজেই আমার মনে হলো যে, আল্লাহ তাআলা এই ছেলেটির পরিবর্তে তাঁদের এমন এক সন্তান দেবেন যে, তার চরিত্র এর তুলনায় অনেক বেশি ভাল থাকবে; শুধু তাই নয়, তাঁদের প্রতি এর ভালবাসা ঐ পুত্রের চেয়ে অনেক বেশি গভীর হবে।

আর ঐ দেয়ালটার ব্যাপার এই যে, সেটা ছিল ঐ শহরে বসবাসকারী দু জন এতিম বালকের। ঐ দেয়ালের নিচে ছেলে দু টির জন্য ধন-সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে। তাদের পিতা খুব সৎলোক ছিলেন। কাজেই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছে এরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে মাটির নিচে তাদের প্রোথিত ধন যেন বের করে নেয়!

সবশেষে খিযির (আ) বললেন, দেখুন, আমি এসব কোনো কাজ নিজের ইচ্ছে মতো করি নি। আমি যা করেছি সব আল্লাহ তাআলার হুকমেই করেছি। আর এ হলো সেইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা যেজন্য আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি।"(সূরা আল-কাহফ : ৬০-৮২)

খিযির (আ) এর কাছ থেকে মূসা (আ) যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করলেন। তিনি শিখলেন যে, মহাশক্তির আধার আল্লাহ তাআলার কতগুলো কর্মপদ্ধতি অনেক সময়ই রহস্যাবৃত থাকে যা সাধারণের কাছে

www.pathagar.com

সহজে বোধগম্য হয় না। আল্লার তাআলার আরোপিত সঠিক তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত কল্যাণের স্বরূপ উদঘাটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বস্তু জগতের অনেক কিছুই আবছা ও অস্বচ্ছ বলে মনে হতে পারে ।

"খিযির (আ) মূসা (আ) কে বিদায় দেবার আগে তিনটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়েছিলেন। যখন হাসবেন যেন আওয়াজ না হয়। কঠিন প্রয়োজন ছাড়া কখনো অন্যের মুখাপেক্ষী হবেন না। অন্যের দোষ না খুঁজে নিজের দোষ-মুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করবেন ।" (ক্বোরানের কাহিনী)

মূসা (আ) ও তাঁর লোকদের আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিশ্রুত স্থানের দিকে গমন

সিনাই উপদ্বীপের মরুময় অঞ্চলে বেশ বিছুকাল অবস্থান করার পর মূসা (আ) তাঁর লোকদের নিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিশ্রুত স্থান পবিত্র ভূমির (বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্দানের কিছু অংশ) দিকে রওয়ানা দিলেন।

মহান আল্লাহ তাআলার ওয়াদা যে বনী ইসরাইলরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। মূসা (আ) বনী ইসরাইলদের বারোটি গোত্রের বারোজন নেতাকে নতুন স্থানের অবস্থান ও অধিবাসীদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর আনার জন্য পাঠালেন। তারা সেই নতুন স্থানে গিয়ে বিস্মিত হয়ে পড়ে। ফিরে এসে বলে যে, দেশটি শানে-শওকতে, নদী, পাহাড়, উপত্যকা, শস্যক্ষেত, সবুজ গাছপালা ও উদ্যান শোভিত অত্যন্ত মনোরম এক জায়গা। তারা সেখানকার ফল-বাগান থেকে ডালিম, আঙুর ও অন্যান্য নানান ধরনের প্রচুর ফল সাথে নিয়ে ফিরেছে।

এখানেই তাদের আত্মীয় পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চিরদিনের জন্য স্থায়ীভাবে বসবাস করবার কথা। আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুত এদেশে হবে সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব।

সুন্দর দেশ দেখে বারোজন নেতা অত্যন্ত প্রীত হয়ে ফিরল বটে, কিন্তু সেখানকার শক্তিশালী এক জাতির লোকদের দীর্ঘ আকৃতি, শক্তিসাহস এবং তাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ও লোকবল দেখে তারা খুবই ভয় পেয়ে গেল। তারা আরও সংবাদ দিল যে, ঐ শক্তিশালী লোকেরা তাদের সাথে যুদ্ধ না করে নিজেদের দেশে ঢুকতে দেবে না।

"মূসা (আ) আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত স্থান ঐ পবিত্র ভূমিতে তাঁর লোকদের প্রবেশ করতে বললেন। তাদের তিনি সাবধান করে দিলেন তারা যেন পেছন ফিরে চলে না আসে। যদি ফিরে আসে, তাহলে তারা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে । জবাবে বারোজন নেতার মধ্যে দশজন বলল, ঐ দেশে আমালিকা নামক দুর্দান্ত এক সম্প্রদায় রয়েছে, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না গেলে আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। তারা যদি সেখান থেকে চলে যায়, তবেই আমরা সেখানে যাব।

তাদের মুখ থেকে ঐ স্থানের লোকদের আকৃতি-প্রকৃতি, শক্তি ও ক্ষমতার কথা শুনে বনী ইসরাইলদের অধিকংশ লোকই আতঙ্কগ্রস্ত হলো। তারাও তাদের পক্ষ অবলম্বন করে ঐ স্থানে প্রবেশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

বারোজন নেতার মধ্যে শুধু দুই জন আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন ও আল্লাহকে ভয় করতেন। তাঁরা ছিলেন ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন।

তাঁরা দু জন যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। বনী ইসরাইলদের বললেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে, ঐ রাজ্য ঢুকে গিয়ে আক্রমণ কর। একবার সেখানে ঢুকে গেলে জয় তোমাদের অনিবার্য।

কিন্তু বনী ইসরাইলরা কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারে নি। যেখানে তারা নবী মূসা (আ) এর কথাতেই কর্ণপাত করেনি, সেখানে ইউশা ও কালেবের কথার কী মূল্য আছে তাদের কাছে? তারা আগের মতোই উদ্ধত ভঙ্গিতে মূসা (আ) কে বলল, আমরা তো আগেই বলেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শক্তিশালী লোকেরা সেখানে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কখনই সেখানে প্রবেশ করব না।

শুধু তাই নয়, অত্যন্ত অনমনীয় ও ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় তারা বলে, আপনি ও আপনার প্রভু সেখানে চলে যান এবং আপনারা তাদের সাথে যুদ্ধ করুন গিয়ে! আমরা যাব না । এখানেই বসে থাকব। (সূরা আল-মায়িদাহ : ২১-২৪)

বনী ইসরাইলদের ঐ ধরনের বক্তব্যে মূসা (আ) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এটা অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় যে, তারা এখন তাদের প্রতিশ্রুত দেশের কাছে চলে এসেও শেষ পর্যন্ত ভয়ে সেখানে প্রবেশ করতে চাচ্ছে না । আর আল্লাহর প্রতি ঈমানও তাদের দুর্বল হয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এদের দিয়ে তিনি আর কিছুই করাতে পারবেন না।

"তাই আল্লাহ তাআলার কাছে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভু ! আমার নিজের ও আমার ভাইয়ের ওপর ছাড়া আর কারো ওপর আমার কোনো রকম আধিপত্য নেই। কাজেই আপনি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মীমাংস করে দিন।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ২৫)

আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলদের প্রতি রুষ্ট হলেন। তারা তাঁর রহমতের জন্য কৃতজ্ঞ নয় তাঁর ওপর তাদের ঈমান নেই। তারা ন্যায্য কাজে এগিয়ে যাবার মতো সৎসাহসী নয়। তারা অস্থিরমতি, ভীরু ও স্বার্থপর।

আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে জানালেন যে, তিনি এদের কঠোর শাস্তি দেবেন। "সে শাস্তি হলো বনী ইসরাইলদের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডটি তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর তারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেবে না। তারা এই মরুভূমিতেই উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে । আল্লাহ তাআলা সাথে সাথেই মূসা (আ) কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি এই অবাধ্য ও বিদ্রোহী লোকদের জন্য দুঃখ করবেন না।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ২৬)

বনী ইসরাইলরা আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত হলো। সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর ধরে তারা উত্তপ্ত মরুভূমিতে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে ফিরে কষ্টকর দিন অতিবাহিত করতে থাকে। এবার তাদের ওপর আর আল্লাহর কোনো রহমত এসে পৌঁছল না। কোনো সুমিষ্ট খাদ্য 'মান্না' ও সুস্বাদু পাখির গোশত 'সালওয়া', তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঝরনার স্বচ্ছ পানি বা প্রখর সূর্যকিরণে সুশীতল ছায়া প্রদানকারী কোনো মেঘমালার বিস্তার আর দেখা গেল না।

www.pathagar.com

এই দীর্ঘ দিনগুলোতে তারা খাদ্য ও পানীয়ের নিদারুণ কষ্টে, ছায়াবিহীন মরুভূমিতে সূর্যের অগ্নিবর্ষী তাপে কঠোর শাস্তির মধ্যে দিন পাড়ি দিতে থাকে।

মূসা (আ) এর মৃত্যু

মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলদের তরফ থেকে বহুবার অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তারা তাঁর সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করেছে এবং বারবার প্রতিজ্ঞা করে তা ভঙ্গ করেছে। তাদের অনমনীয় ও দুর্বিনীত আচরণে মূসা (আ) মানসিকভাবে আহত হয়েছেন। তবু তিনি তাদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য তাদের সব রকম অত্যাচার, অজ্ঞতা, বিদ্রোহ এবং তাঁর সম্বন্ধে রটানো মিথ্যা কুৎসা ও দুর্নাম সবই তিনি আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করে সহ্য করেছেন।

মূসা (আ) এর মৃত্যুর কিছুকাল আগে তাঁর বড় ভাই হারুন (আ) এর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর দিনও ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে তিনি তাঁর প্রিয় সহচর ইউশা ইবনে নূনকে বনী ইসরাইলদের পরবর্তী নেতা নির্বাচিত করেন।

"মূসা (আ) তখন জীবনের শেষ প্রান্তে। একদিন আজরাঈল (আ) এলেন তাঁর মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে। তিনি হঠাৎ চটে গিয়ে তাঁকে বললেন, আমার পক্ষে এখন হঠাৎ করে মরে যাওয়া সম্ভাবপর নয়! কেননা, আমি এখন পর্যন্ত বনী ইসরালইদের ঝগড়া বিবাদের কোনো মীমাংসা করতে পারি নি।

আজরাঈল (আ) আল্লাহ তাআলার কাছে সে সংবাদ দিলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি এখন তার কাছে গিয়ে বলো সে যদি আরও অনেক দিন বাঁচতে চায়, তবে সে যেন একটি দুম্বার গায়ে হাত রাখে । তার হাত দুম্বাটির যতগুলো লোম স্পর্শ করবে, তাঁর আয়ু তত বছর বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

আজরাঈল (আ) এর কাছে এ কথা শুনে মূসা (আ) আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কী হবে? আল্লাহ তাআলা বললেন, তারপর তোমাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। মূসা (আ) তখন আল্লাহর দরবারে সিজদা দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! মরতেই যখন হবে, তখন আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। তবে আমার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা, মৃত্যুর আগে আমি তূর পাহাড়ে গিয়ে আপনার সাথে শেষ কথা বলে আপনাকে শুকরিয়া জানাতে চাই।

আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) এর প্রার্থনা কবুল করলেন। তিনি বনী ইসরাইলদের বিদায়ী উপদেশ প্রদান করে তূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দিলেন।" হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, এই ঘটনাটি হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর সাহাবীদের শুনিয়েছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

"পাহাড়ে আল্লাহ তাআলার সাথে শেষ কথাবার্তা বলে মূসা (আ) যখন নিচে নেমে গন্তব্য স্থানের দিকে যাচ্ছিলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে, পাহাড়ের ঢালুতে কয়েকজন লোক একটি নতুন কবর খুঁড়ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কার জন্য কবর খুঁড়ছ?"

www.pathagar.com

তারা মূসা (আ) কে চাক্ষুস দেখে নি। বলল, আল্লাহর এক ঘনিষ্ঠ বান্দার জন্য কবর খুঁড়ছি। ইচ্ছে করলে আপনিও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন। যখন কবর তৈরি হলো তারা মূসা (আ) এর দিকে তাকিয়ে বলল, যাঁর জন্য আমরা কবর খুঁড়ছি তিনি ঠিক আপনার মাপের মতো। একবার কবরে ঢুকে দেখুন তো কবরটি ঠিক মাপের হয়েছে কিনা!

মূসা (আ) কবরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সেখানে আল্লাহর কুদরতে বেহেশতি আলো ও সুগন্ধ ছড়ানো ছিল। তিনি সেখানে শুয়ে বললেন, আহ্! অপূর্ব জায়গাটি! এ কবরটি যদি আমার জন্য হতো, তবে কী চমৎকারই না হতো! তখনই আজরাঈল (আ) এসে তাঁর জান কবজ করলেন।"(ক্বাসাসুল আম্বিয়া ও কোরানের কাহিনী গ্রন্থ)

মূসা (আ) এর মৃত্যুর সময় বয়স কত ছিল, তা নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো মতে তিনি ১৫০ বছর বেঁচেছিলেন, আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ১২০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

সহীহ বুখারী শরীফ থেকে জানা যায়, নবী মূসা (আ.) আজরাঈল (আ)কে বলেছিলেন, "যদি আমার মৃত্যুই হয় তাহলে আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটে পাথর নিক্ষেপের দূরত্বে পৌঁছে দেবেন!"

ঘটনা তা-ই হলো। মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, "যদি আমি সেখান দিয়ে যেতাম, তবে তোমাদেরকে মূসা (আ) এর কবর শরীফ দেখিয়ে দিতাম, কাসীবে আহমারের রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত।"

বনী ইসরাইলদের পরবর্তী প্রজন্ম

কালের অবাধ গতির সাথে চল্লিশটি বছর পার হয়ে গেল। মূসা (আ) ও হরুন (আ) উভয়ের মৃত্যু হয়েছে। ঐ সময়ে যারা আল্লাহ তাআলা ও নবী-রসূলদের অমান্য করেছিল তারাও বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এখন সেখানে নতুন প্রজন্ম। তারা বড় হয়ে জানতে পেরেছে কীভাবে তাদের পূর্ববর্তী বংশধরেরা মিসরে কাফির সম্রাট ফিরাউনদের অধীনে প্রায় চার শ বছর ধরে ক্রীতদাসরূপে নির্যাতিত হয়ে অপমানজনক ও মর্মান্তিক দিন অতিবাহিত করেছে।

তারা আরও জেনেছে, কীভাবে মহান আল্লহর তাআলা মূসা (আ) কে নবী ও রসূল এবং হারুন (আ) কে নবী নির্বাচিত করে তাদের মধ্যস্থতায় বনী ইসরাইলদের মুক্ত করেছেন। অত্যন্ত উদ্ধত, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও আল্লাহর বিরোধী মিসর সম্রাট ফিরাউন দ্বিতীয় রামসিসকে তার সৈন্যসামন্ত ও লোকজনসহ লোহিত সাগরে ডুবিয়ে শাস্তি দিয়েছেন। এও তাদের অজানা নয় যে, মূসা (আ) বনী ইসরাইলদের আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুত 'পবিত্র দেশটির জন্য যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছিলেন, কিন্তু তারা অহংকার, ঔদ্ধত্য ও তাচ্ছিল্যের সাথে তা করতে অস্বীকার করেছিল যার ফলে সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর ধরে এই উত্তপ্ত মরুময় তীহ্ প্রান্তরে তারা নির্বাসিত, বন্দি জীবন কাটাচ্ছে।

বনী ইসরাইলদের নতুন প্রজন্ম মরুভূমির চরম আবহাওয়ায় কষ্টকর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কষ্টসহিষ্ণু ও শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে। তারা তাদের পূর্ববর্তীদের মতো দুঃসহ জীবন নিয়ে মরুভূমিতে আর দিন কাটাতে রাজি নয়। তারা আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুত রহমতপ্রাপ্ত 'পবিত্র দেশে'

www.pathagar.com

গিয়ে বসবাস করতে আন্তরিকভাবে অভিলাষী। তার জন্য তারা তাদের পিতা-পিতামহদের মতো পিছিয়ে না গিয়ে, দেশ জয় করবার জন্য এগিয়ে যাবে যুদ্ধ করবে।

বনী ইসরাইলদের তৎকালীন নেতা ইউশা ইবনে নূন এই নতুন প্রজন্মের সাহসী ও মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ বনী ইসরাইলদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করেন।
তারা শুধু দৈহিক দিক দিয়ে শক্তসমর্থ ছিল তা নয়, মানসিক দিক দিয়েও তারা অত্যন্ত সাহসী ছিল। তারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে পবিত্র জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছিল। তারা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়।

আল্লাহর উপর গভীর আস্থা রেখে নির্ভিক পদক্ষেপে তারা 'পবিত্র ভূমি' ফিলিস্তিনের দিকে এগিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার সাহায্যে প্রার্থনা করে যুদ্ধে তারা সেখানকার শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ অবিশ্বাসী লোকদের পরজিত করে।

তারা এখন এই পবিত্র ভূমির বিজয়ী বীর। মরুভূমির অসহনীয় দিনগুলো বিসর্জন দিয়ে বনী ইসরাইলের নতুন প্রজন্ম 'বরকতময় স্থান' ফিলিস্তিনে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এদেশ এখন তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

নতুন বনী ইসরাইলরা আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত ও মূসা (আ) এর প্রচারিত ধর্মে সুদৃঢ় থেকে ন্যায়, নীতি ও পবিত্রতার সাথে এদেশে বসবাস করতে থাকে।

www.pathagar.com

যে সমস্ত গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছিঃ

১. The Holy Quran : Translated by Abdullah Yousuf Ali
২. Stories of the Prophets: Imam Ibr Kathir, Translated by Sheikh Muhammad Mustafa Gemciah
৩. The Prophet of Allah: M: ldred El Amin Suhaib Hamid Ghazi.
৪. আল কুরআনুল করীম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৫. নুরানী ক্বোরআন শরীফ- মূলঃ মওলানা আশরাফ আলী থানভীর (র) তরজমাঃ মওলানা নূরুর রহমান।
৬. পত্রি ক্বোরআনুল করীম- বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর
৭. ক্বোরআনের কাহিনী - মিয়া মহম্মদ আবদুল আজিজ।
৮. তাফহীমুল কুরআন- মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওনুদী (রাঃ)।

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

ক্রমিক বইয়ের নাম বইয়ের বিষয় প্রকাশকাল/সংস্করণ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নাম

১. ফসলের মাঠ ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৬৭ বুক ভিলা, ঢাকা। ২য় সংস্করণ, ১৯৮৯ রেশমা খান, ময়মনসিংহ।

২. উত্তুরে বাতাস উপন্যাস ১ম সংস্করণ, ১৯৭০ বুক ভিলা, ঢাকা। (সাহিত্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) ২য় সংস্করণ, ১৯৮৯ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।

৩. বৃষ্টি যখন নামলো ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮ মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা। ২য় সংস্করণ, ১৯৮৯ রুনা প্রকাশনী, ঢাকা।

৪. কালের পুতুল ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮ মুক্তধারা, ঢাকা।

৫. একাত্তরের কাহিনী ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৯০ রুনা প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ, ২০০২ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

৬. হেলেনা খান রচনাবলি রচনাবলি ১ম সংস্করণ, ১৯৮৯ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।

৭. পাপড়ির রং বদলায় ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৯১ রুনা প্রকাশনী, ঢাকা।
২য় সংস্করণ, ২০০৫ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

৮. নির্বাচিত গল্প ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ অহিদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।
২য় সংস্করণ, ২০০৩ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।
৩য় সংস্করণ,২০০৭ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

৯. আত্মজ ও মুক্তিযুদ্ধ উপন্যাস ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ মুক্তধারা, ঢাকা। ২য় সংস্করণ, ২০০১ মুক্তধারা, ঢাকা।

১০. দুই ধাপ পৃথিবী উপন্যাস ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮ মুক্তধারা, ঢাকা।

www.pathagar.com

২য় সংস্করণ, ১৯৯৯ মুক্তধারা, ঢাকা।

১১. সবার ওপরে উপন্যাস ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ মুধুকুঞ্জ প্রকাশনী, ঢাকা।

১২. কারাগারের ভেতরে ও বাইরে ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ২০০০ মুধুকুঞ্জ প্রকাশনী, ঢাকা।

১৩. আমার পরিচিত বৃহত্তর ময়মনসিংহের কয়েকজন বিশিষ্ট নারী জীবনী ১ম সংস্করণ, ২০০০ নিজস্ব প্রকাশনী।

১৪. শ্বাপদ সংকুল অরণ্যে উপন্যাস ১ম সংস্করণ, ২০০১ ঐতিহ্য, ঢাকা।

১৫. রম্যগল্প গল্প ১ম সংস্করণ, ২০০৫ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

১৬. বৃত্তের বাইরে ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ২০০৫ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।

১৭. নবী ইউসুফ (আ) জীবনী ১ম সংস্করণ, ২০০৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

১৮. উষা থেকে গোধূলির স্মৃতি স্মৃতিকথা ১ম সংস্করণ, ২০০৭ মীরা প্রকাশন, ঢাকা। ২য় সংস্করণ, ২০০৯ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

১৯. আমার স্মৃতিতে ভাস্বর জীবনী ১ম সংস্করণ, ২০০৭ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

২০. প্রবাসে সায়ংকালে ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ২০০৭ জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা।

২১. নবী মূসা (আ:) জীবনী ১ম সংস্করণ, ২০০৮ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

২২. লেখনী উপন্যাস ১ম সংস্করণ, ২০০৭ জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা।

২৩. পান্নার জন্য ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ২০১০ নিজস্ব প্রকাশনা, ঢাকা।

২৪. কারামুক্তি ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ২০১০ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

২৫. সঞ্চয় মূল এ.কে.এম. (মূল্যবানবাণীসমূহ) ১ম সংস্করণ, ২০১০ মীরা প্রকাশন, ঢাকা। মোজাফফর আলী ফকির, সম্পদনা। হেলেনা খান।

২৬. রোদ ঝকঝক ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৭৫ কালি-কলম প্রকাশনী, ঢাকা।

২৭. সব ভালো যার রম্যগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৭৯ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
শেষ ভালো ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫ নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

২৮. চারটি বেলুন ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৮০ নিজস্ব প্রকাশনা।
২য় সংস্করণ,১৯৮৫ নিজস্ব প্রকাশনা।

২৯. গল্পই শুধু নয় গল্পে ছড়া ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ নিজস্ব প্রকাশনা। ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯ দিগন্ত প্রকাশনী, ঢাকা।

৩০. সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ ভ্রমণ কাহিনী ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪ মুক্তধারা, ঢাকা।
২য় সংস্করণ, ১৯৯৪ মুক্তধারা, ঢাকা।
৩য় সংস্করণ, ১৯৯৯ মুক্তধারা, ঢাকা।

৩১. ডালমুট ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫ শিশু একাডেমী, ঢাকা।
২য় সংস্করণ,১৯৯৪ শিশু একাডেমী, ঢাকা।

৩২. ফুল পাখি সৌরভ ভ্রমণ কাহিনী ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা। পরিবর্তিত নাম: ২য় সংস্করণ,১৯৯৯ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ বুক সোসাইটি লি:, ঢাকা।

www.pathagar.com

৩য় সংস্করণ, ২০০৩ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা। ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৬ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা।

৩৩. নীল পাহাড়ের উপন্যাস ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা । ২য় সংস্করণ, ২০০১ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।

৩৪. নতুন দেশ নতুন মানুষ ভ্রমণ কাহিনী ১ম সংস্করণ, ১৯৯০ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।
২য় সংস্করণ, ২০০১ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।

৩৫. গৌতমবুদ্ধের দেশে ভ্রমণ কাহিনী ১ম সংস্করণ, ১৯৯১ মুক্তধারা, ঢাকা । ২য় সংস্করণ, ২০০৪ মুক্তধারা, ঢাকা ।

৩৬. রূপকথার রাজ্যে রূপকথা ১ম সংস্করণ, ১৯৯২ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা । ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা । ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৬ পালক পাবলিশার্স, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৮ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা । ৫ম সংস্করণ, ২০০১ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা । ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০১০ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।

৩৭. ব্যাংককের সেই মেয়েটি ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৯২ রুনা প্রকাশনী, ঢাকা।
২য় সংস্করণ, ২০১০ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

৩৮. মুক্তিযুদ্ধের গল্প ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা । ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।
৩য় সংস্করণ, ১৯৯৯ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।
৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।

৩৯. ভূতের খপ্পরে উপন্যাস ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা । ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।
৩য় সংস্করণ, ২০০০ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।
৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।
৫ম সংস্করণ, ২০০৭ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।

৪০. মাঞ্চ-এর মজার গল্প অনুবাদ ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ রুনা প্রকাশনী, ঢাকা।
২য় সংস্করণ, ২০০২ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

৪১. শাবাশ বাহাদুর ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ পানকৌড়ি প্রকাশনী, ঢাকা।
২য় সংস্করণ, ২০০২ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।

৪২. তুলতুলের দান ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ শিশু একাডেমী, ঢাকা।

৪৩. নবী দাউদ (আ) ও নবী সুলায়মান (আ) জীবনী ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
২য় সংস্করণ, ২০০১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,ঢাকা। ৩য় সংস্করণ,
২০০৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,ঢাকা।

৪৪. ছোটদের সেরা গল্প ছোটগল্প ১ম সংস্করণ ১৯৯৯ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।
২য় সংস্করণ, ২০০২ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।
৩য় সংস্করণ, ২০০৭ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা ।

www.pathagar.com

৪৫. এক বাক্স খেলনা ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা।

৪৬. ইসলামের প্রথম মূয়াযযিন হযরত বিলাল (রা) জীবনী ১ম সংস্করণ, ২০০১ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক (২য় সংস্করণ, ২০০২) সোসাইটি লিঃ ঢাকা।
৩য় সংস্করণ, ২০০৬ সোসাইটি লিঃ ঢাকা।

৪৭. তুষারকুমারী ও সাত বামন অনুবাদ ১ম সংস্করণ, ২০০১ ঐতিহ্য, ঢাকা।

৪৮. হ্যানসেল ও গ্রেটেল অনুবাদ ১ম সংস্করণ, ২০০২ মীরা প্রকাশন, ঢাকা। ২য় সংস্করণ, ২০১০ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

৪৯. দুই বোকার কাণ্ড ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ২০০২ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা।

৫০. নবী ইবরাহীম (আ) জীবনী ১ম সংস্করণ, ২০০৩ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।

৫১. নবী আদম (আ) জীবনী ১ম সংস্করণ, ২০০৫ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

৫২. নবী নূহ (আ) জীবনী ১ম সংস্করণ, ২০০৫ মীরা প্রকাশন, ঢাকা।

৫৩. সাতটি রঙের রংধনু ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ২০০৬ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা।

৫৪. নবী ইউনুস (আ) জীবনী ১ম সংস্করণ, ২০০৭ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা।

৫৫. Storics of the Liberation War of Bangladesh Short Stories ১ম সংস্করণ, ২০০৭ পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।

৫৬. ছোট্ট রেড রাইডিং হুড অনুবাদ ১ম সংস্করণ, ২০০৭ জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা।

৫৭. লোভী রাজা লোভী রানি নাটক ১ম সংস্করণ, ২০০৯ জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা।

৫৮. ঝিলিমিলি ছড়া ও কবিতা ১ম সংস্করণ, ২০১০ জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা।

৫৯. শিশু-সাহিত্য সমগ্র ১ম খণ্ড সংকলন ১ম সংস্করণ, এ্যাকাডেমিক প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশানস লিঃ ঢাকা।

৬০. শিশু-সাহিত্য সমগ্র (২য় খণ্ড সংকলন) ১ম সংস্করণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা।

৬১. রাজার আজব পোশাক ছোটগল্প ১ম সংস্করণ, ২০০৭ জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা।

৬২. বুদ্ধির বাহাদুরি নাটিকা ১ম সংস্করণ, ২০১১ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা।

৬৩. নবী আইয়ূব (আ) জীবনী ১ম সংস্করণ, ২০০৯ জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা।

৬৪. আমাদের মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাস) জীবনী ১ম সংস্করণ, ২০১০ এপ্রিল নিজস্ব প্রকাশনা, ঢাকা। কিশোর ও তরুণদের জন্য ২য় সংস্কণ ২০১০ নভেম্বর নিজস্ব প্রকাশনা, ঢাকা।

৬৫. মজার মজার গল্পগুলো (রম্যগল্প) ১ম সংস্করণ, ২০১১ নিজস্ব প্রকাশনা, ঢাকা।

৬৬. গল্প পড়া ভারি মজাঃ ১ম সংস্করণ প্রাপ্ত প্রকাশন, ঢাকা।

www.pathagar.com

বিরল মেধাদীপ্ত হেলেনা খানের বাল্যকাল থেকেই পড়া শোনার পাশাপাশি অনুরূপ সাহিত্য চর্চার সূচনা। ১৯২৯ সনে ময়মনসিংহ শহরে তাঁর জন্ম।

সেই ত্রিশের দশকে যখন সমগ্র মুসলিম সমাজ মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার প্রশ্নে ঘোর বিরোধী ছিল, হেলেনা খানের পিতা মরহুম মোঃ মোযাফফর আলী ফকির সেই সব বিরোধের উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে কন্যাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। ১৯৪৪ সনে হেলেনা খান 'এ গ্রেড' স্কলারশিপসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, ১৯৪৮ সনে কলকাতার প্রথম শ্রেণীর লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে বি.এ. পরের বছরই ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে প্র্যাকটিস টিচিংএ ফার্স্ট ক্লাসসহ বি-টি এবং বিয়ের পর স্বামীর সাথে লন্ডনে গিয়ে সেখানকার ইউনিভারসিটি অফ লন্ডন থেকে ১৯৫২ সনে এ্যাকাডেমিক ডিপ্লোমা ইন এজুকেশন পাস করেন।

কর্মজীবনে ৫টি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি ১৯৪৮ সন থেকে যথাক্রমে সিনিয়র শিক্ষিকা, সহকারি প্রধান শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে দীর্ঘ ১৪ বছর কর্মরত ছিলেন। তাঁর শিক্ষা জীবন, সংসার ও কর্মজীবন সর্ব অবস্থাতেই সাহিত্য জীবনটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।

১৯৪০ সনে তৎকালীন 'কৃষক' পত্রিকায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'প্রাণের টান' প্রকাশিত হয়। শুধু 'কৃষকেই' নয়, তৎকালীন নবযুগ, আজাদ, আসামের প্রভাতী ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর প্রচুর ছোটগল্প প্রকাশিত হয় এবং শিশু-কিশোর লেখিকা হিসেবে তিনি সবিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন। বিদেশে অধ্যয়ন, সরকারি স্কুলের বদলি ও ৪টি শিশু সন্তানের লালন পালনের কারণে হেলেনা খানের লেখায়-বিশেষ করে প্রকাশনায় স্বল্পকালের জন্য ছেদ পড়েছিল।

১৯৫৭ সন থেকে তাঁর লেখনী আবার সচল হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সনে প্রধান শিক্ষয়িত্রী থাকাকালীন সরকারি চাকরিতে ইস্তেফা দেবার পর তাঁর সাহিত্য রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশনা খুবই বেগবান হয়ে ওঠে। এ সময়ে স্বামীর সাথে তিনি ভারত, পাকিস্থান, ইউরোপের নানান দেশ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সৌদী আরব, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশসমূহ ভ্রমণ করেছেন যার ফলশ্রুতিতে পাঠকমহল অনেকগুলো নিখুঁত ভ্রমণ-চিত্র পেয়েছেন। ১৯৬৭ সন হেলেনা খানের জীবনের একটি প্রদীপ্ত অধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল মরহুম মুনীর চৌধুরী বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হেলেনা খানের লেখা কয়েকটি ছোটগল্প নিয়ে 'ফসলের মাঠ, নামক একটি গল্পগ্রন্থ' ও পরের বছরই 'ললনা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাস 'উত্তুরে বাতাস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখন থেকেই তাঁর গ্রন্থ প্রকাশনায় গতি অব্যাহত ধারায় বয়ে চলেছে- অদ্যাবধি। ১৯৭০ সনে তিনি আওয়ামী লীগের এম.এন.এ. নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬৬টি। ২৬টি বড়দের ও ৪০টি ছোটদের। সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ বিচরণ। তাঁর সব সাহিত্যেরই একাধিক (সপ্তম পর্যন্ত) সংস্করণ বের হয়েছে। বড়দের জন্য তাঁর লিখিত উপন্যাস 'উত্তুরে বাতাস' স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। তাছাড়া আগুন ও মুক্তিযুদ্ধ, দুই ধাপ পৃথিবী, লেখনী, শ্বাপদ সংকুল অরণ্যে, ছোটদের নীল পাহাড়ের হাতছানি ও ভূতের খপ্পরে সব কটিই পাঠকনন্দিত উপন্যাস।

সংখ্যায় ৮টি ছোটগল্প রচনাকারী অনন্যসাধারণ হেলেনা খানের ছোটগল্প (রম্যগল্পসহ) গ্রন্থের সংখ্যা (বড়দের ও ছোটদের মিলিয়ে) ৩০টি, উপন্যাস ৮টি, জীবনীগ্রন্থ ১২টি, ভ্রমণকাহিনী ৪টি, অনুবাদ ৪টি, রচনাবলি ৩টি, নাটিকা ২টি, ছড়া ও কবিতা ১টি, ১টি দীর্ঘ আত্ম জীবন-স্মৃতি এবং ১টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশ রেডিও থেকে ২টি নাটক ও ১৯৬৮ সনে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্থান টিভি স্টেশন থেকে তাঁর বাংলা গল্প 'দুই ধাপ পৃথিবীর' উর্দু নাট্যরূপ নিয়ে প্রচারিত হয়ে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল।

সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৫ বার পুরস্কার পেয়েছেন। তার মধ্যে ১৯৭৬ সনে নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্য স্বর্ণপদক, সাজিদুন্নেসা চৌধুরানি সাহিত্য পদক, ২০০১ সনে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পুরস্কার, ২০০৮ সনে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (অনুবাদ ও শিশু সাহিত্যে) এবং ২০১০ সনে সাহিত্যে একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন।

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com